KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No.: KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীর মোহম্মদ
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number 46/7 46/8 46/9 46/10	Year of Publication : Nov 1985 Dec 1985 Jan 1986 Feb 1986
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আবদুর রউফ	Remarks :

C.D. Roll No : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

১৯৮৬
জানুয়ারি

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ আজ সভ্যতার প্রতিস্পর্ধী কুটিল এক শক্তি—সারা পৃথিবীই এখন তার রণভূমি, মানব-অস্তিত্বের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন মূল্যবোধগুলিকে সে ধ্বংস করতে উদ্যত। ইতিহাসের ধারায় তার উদ্ভব, তার বিকাশ, এবং চলমান বিশ্ব-জীবনপ্রবাহে তার বীভৎস সংহারমূর্তিকে ফুটিয়ে তুলেছেন ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় **স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন : আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ** প্রবন্ধে।

স্বাধীনতার আগে এবং পরে আসামের রাজনীতিতে বিরোধের কী বারুদ জমিয়ে তোলা হয়েছিল, পরবর্তীকালে যার বিস্ফোরণ ঘটল ভ্রাতৃঘাতী হানাহানিতে? সাম্প্রতিক নির্বাচনের পরে আসাম শান্তি, সম্প্রীতি আর সুস্থিতির পথে এগোবে কি? এইসব প্রশ্নের বিচার করেছেন প্রখ্যাত আসাম-বিশেষজ্ঞ ড. অমলেন্দু গুহ।

'শ্রীমতী কাফে' সমরেশ বসুর আদিপর্বের রাজনৈতিক উপন্যাস। তারপর তিনি একের পর এক রাজনৈতিক উপন্যাস লিখে চলেছেন। এইসব রচনা কতখানি শিল্পোত্তীর্ণ? এদের মধ্যে সমসাময়িক ইতিহাসের আদর্শের দ্বন্দ্ব, বিপ্লবসাধনার নিষ্ঠা আর ফাঁকি কি যথাযথভাবে প্রতিফলিত? এইসব প্রশ্নের উত্তরসন্ধানে ড. বিজিতকুমার দত্তর প্রবন্ধ **সমরেশ বসুর রাজনৈতিক উপন্যাস।**

এ মাসের রাজনৈতিক পর্যালোচনার বিষয় : **কংগ্রেসের একশ বছর।**

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

— শ্রীমা

বর্ষ ৪৬। সংখ্যা ৯
জানুয়ারি ১৯৮৬
পৌষ ১৩৯২

স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন : আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৭০৭
সমরেশ বসুর রাজনৈতিক উপন্যাস বিজিতকুমার দত্ত ৭৩১
'তমোহন্ত্রী পূর্ণচন্দ্র' : ওকাকুরা তেনশিন তাপস মুখোপাধ্যায় ৭৬২

আবেদন রবীন সুর ৭১৮
হে হৃদয় বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত ৭১৯
বশ্যতাস্বীকার সমরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৭২০
ফেরার হয়েছি শীর্ষেন্দু চক্রবর্তী ৭২১
জল সজল দে ৭২২

যথাস্থানে পৃথিবী কামাল হোসেন ৭২৩
পোকামাকড়ের ঘরবসতি সেলিনা হোসেন ৭৫৭
অলীক মানুষ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৭৭২

গ্রন্থসমালোচনা ৭৮০
অলোক রায়, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

আলোচনা ৭৮৭
অমলেন্দু গুহ, ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অমিয় দেব, বর্ণালী দাস

পাঠকের দৃষ্টিতে ৭৯৬
সুজিতকুমার দাশ, মৃগেন গাঁতাইত

মুখপাতের ছবি ঃ শিপ্রা ভট্টাচার্য
শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক নবজীবন প্রেস, ৬৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন ঃ ২৭-৬৩২৭

Glimpses of India

NAVEEN PATNAIK

A SECOND PARADISE
INDIAN COURTLY LIFE : 1590-1947
"……Rich, beautiful and unbelievable".
—*India Today*
Full colour photographs throughout.
Rs. 250.00

THEROUX and McCURRY

THE IMPERIAL WAY
MAKING TRACKS FROM
PESHAWAR TO CHITTAGONG.
128 Pages in full colour photographs.
Rs. 175.00

GUY MOUNTFORT

WILD INDIA

THE WILDLIFE AND SCENERY OF INDIA and NEPAL
405 colour photographs all through.
Rs. 395.00

MADHUR JAFFREY

Colour Illustrations by
MICHAL FOREMAN
SEASONS OF SPLENDOUR
TALES, MYTHS and LEGENDS
OF INDIA.
Rs. 139.50

QUENTIN CREWE

THE LAST MAHARAJA
A BIOGRAPHY OF SAWAI
MAN SINGH II
MAHARAJA OF JAIPUR
"A majestic love story".—*The Telegraph*
32 pages photographs and maps.
Rs. 150.00

Rupa & Co

15 Bankim Chatterjee St, Cal.-73
Allahabad : Bombay : New Delhi

চতুরঙ্গ

প্রতি সংখ্যা তিন টাকা
সডাক গ্রাহকমূল্য বার্ষিক ৩৬ টাকা,
ষান্মাসিক ১৮ টাকা

এজেন্সির নিয়মাবলী

১। পাঁচ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না।
২। কমিশন শতকরা ২৫। পঁচিশ কপির ঊর্ধ্বে শতকরা ৩০।
৩। ডাক-খরচ আমরা বহন করি।
৪। কপি-পিছু দেড় টাকা আমাদের দপ্তরে জমা রাখতে হবে।

•

লেখকদের প্রতি নিবেদন

যাঁরা প্রকাশের জন্য কবিতা পাঠাবেন তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে নকল রেখে পাঠান—অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

অন্যান্য অমনোনীত রচনা যাঁরা ফেরত নিতে চান তাঁরা অনুগ্রহ করে উপযুক্ত পরিমাণে ডাক-টিকিট পাঠালে আমাদের সহায়তা করা হবে।

প্রেরিত রচনায় অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত বিদেশী ব্যক্তিনাম আর স্থাননাম থাকলে, সঙ্গে আলাদা একটি কাগজে ইংরেজি বড়ো হরফে সেগুলি লিখে দিলে উপকার হবে।

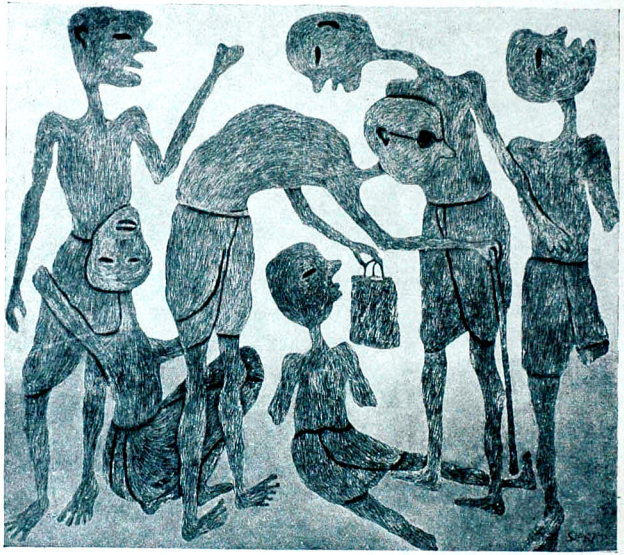

শিল্পী : শিপ্রা ভট্টাচার্য

স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন :
আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

হিমশীতল উত্তরসাগরে হল্যানডের উপকূলের অদূরে এক অতিকায় তৈলবাহী জাহাজ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার গর্ভে দশ লক্ষ টন অশোধিত পেট্রোলিয়ম। তারিখ ১লা এপ্রিল ১৯৮৩।

জাহাজের ২৯ জন অফিসার, ইনজিনিয়ার এবং কর্মী জাহাজের নিম্নতম অংশে একটি কক্ষে বন্দী, ক্যাপটেন নিজে বন্দী তাঁর নিজের ক্যাবিনে। আটজন সন্ত্রাসবাদী সমস্ত জাহাজটাকে দখল করে রেখেছে। ক্যাপটেনের মুখোমুখি বসে আছে তাদের নেতা, হাতে সাবমেশিনগান, ক্যাপটেনের দিকে তাক করা। ৯০-হাজার-অশ্বশক্তিচালিত দৈত্যের মতো সেই জাহাজ আটজন লোকের হাতে অসহায় বন্দী।

দুটি কিং-সাইজ সিগারেটের প্যাকেট একসঙ্গে বাঁধলে যে আকার হয় সেই আকারের একটি কালো প্ল্যাসটিকের যন্ত্র সেই নেতার হাতে ধরা, তাতে একটি ছোট্ট লাল বোতাম। বোতামটি টিপলে অতি উচ্চ কম্পনের শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি হবে, সেই ধ্বনি উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে পৌঁছে মানুষের শ্রবণসীমার ওপরে চলে যাবে, তখন তার আঘাতে জাহাজের বিভিন্ন নির্বাচিত স্থানে একসঙ্গে দশটি বিস্ফোরণ জাহাজটিকে নিমেষের মধ্যে টুকরো-টুকরো করে ছড়িয়ে দেবে উত্তরসাগরের জলে। শুধু তাই নয়, দশ লক্ষ টন অশোধিত পেট্রোলিয়ম উত্তরসাগরে এবং তার উপকূলের দেশে-দেশে সৃষ্টি করবে অকল্পনীয় পরিবেশ-বিপর্যয়। যেমন, ব্রিটেনের উপকূলে হাল থেকে সাউথহ্যামপটন পর্যন্ত সমুদ্রের জল এক ফুট তেলের নীচে চাপা পড়ে যাবে। সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীটির দাবি, পশ্চিম বারলিনের জেলে বন্দী তাদের দলের দুজন ইউক্রেনীয় ইহুদি বিমান-ছিনতাইকারীকে মুক্তি দিতে হবে, এবং পশ্চিম জারমানির অসামরিক জেট বিমানে তাদের ইসরায়েলে পৌঁছে দিতে হবে, এবং ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীকে প্রকাশ্যে অঙ্গীকার করতে হবে—তাদের সোভিয়েত রাশিয়ায় কিংবা পশ্চিম জারমানিতে ফেরত পাঠানো হবে না, কিংবা ইসরায়েলের জেলখানায় বন্দী করা হবে না।

এদিকে, সেই বন্দী দুজন সোভিয়েত গুপ্তচরসংস্থা মহাশক্তিধর কে.জি.বি.-র কর্তাকে হত্যা করেছে। তাদের মুক্তি দিয়ে ইসরায়েলে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিলে তার অনিবার্য ফল হবে—রাশিয়ায় বর্তমান শাসকের পতন ; নতুন, উগ্র, যুদ্ধলিপ্সু শাসকগোষ্ঠীর অভ্যুদয় এবং তার পরিণাম হবে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পারমাণবিক প্রলয়। অর্থাৎ, আটজন সন্ত্রাসবাদীর একটি দল সমগ্র বিশ্বকে এক ঘোর সংকটের মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

আসলে, ওরকম ঘটনা কিছুই ঘটে নি, ১৯৮৩-র ১লা এপ্রিলে নয়, তার আগে কিংবা পরেও নয়। আজ পর্যন্ত নয়। সমস্ত ব্যাপারটাই এখনকার এক অতিশয় জনপ্রিয় ইংরেজ রোমাঞ্চকাহিনীর লেখকের কল্পনা। ফ্রেডারিক ফরসাইথ-এর 'দি ডেভিলস অলটারনেটিভ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে। কাহিনীটি তিনি স্থাপন করেছিলেন ১৯৮২-৮৩-তে। অর্থাৎ, "যা এখনও হয় নি, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে হতে পারে", সেইরকম একটি কাহিনী তিনি রচনা করেছেন। এবং, তাঁর এই দুঃস্বপ্ন যে একান্তই অহিফেন-সেবিত তা বলা যায় না। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ যে-যে মূর্তি এখন পরিগ্রহ করতে পারে, অনেকেই মনে করেন, বড়ো তৈলবাহী জাহাজ হস্তগত করা তার মধ্যে একটি। কী কৌশলে অতি ক্ষুদ্র একটি দল অমন প্রকাণ্ড একটি জাহাজ, আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির সব রকমের সুবিধা যাতে বিদ্যমান, অতি অল্প সময়ের মধ্যে একেবারে কবজা করে নিতে পারে, লেখক তার এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন যে, অবিশ্বাসের প্রায় কোনো অবকাশই তিনি রাখেন নি, বলা যায়। আর, আধুনিকতম প্রযুক্তি যে ছোটো-ছোটো সন্ত্রাসবাদী দলের হাতে অপরিমেয় ক্ষমতা তুলে দিতে পারে, এটাই এখন অনেক ওয়াকিবহাল মহলের কাছে মস্ত বড়ো একটা দুশ্চিন্তার কারণ। এমন-কি, পারমাণবিক শক্তির কথাও এ প্রসঙ্গে এখন উঠছে। পারমাণবিক অস্ত্র, ছোটো আকারের হলেও, সন্ত্রাসবাদীদের হাতে পড়ে অতিশয় বড়ো আকারের সংকট সৃষ্টি করতে পারে, এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। এবং, এমন ভরসাও কেউ দিতে পারছেন না—পারমাণবিক বিস্ফোরণের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং কৃৎকৌশল অপাত্রের অলভ্য হয়ে থাকবে দীর্ঘকাল। অর্থাৎ, ভবিষ্যতে সন্ত্রাসবাদ কী কী চেহারা নিতে পারে, কতখানি বিপদ ডেকে আনতে পারে, সে বিষয়ে উদ্বেগের প্রচুর কারণ আছে বলে অনেকেই মনে করেন, অর্থাৎ, আধুনিক কালে আধুনিক অস্ত্র হাতে নিয়ে সন্ত্রাসবাদ নতুন-নতুন বিভীষিকার সৃষ্টি করবে—এই হল ভয়। ভয় আরও বেশি এইজন্যে যে আধুনিক মানুষ তার জীবনযাত্রার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে, এমন-কি অস্তিত্বের জন্যে, যেসব ব্যবস্থার মুখাপেক্ষী, আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে তার বেশির ভাগই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন। কোথাও একটা সুইচ টিপে, একটা লিভার সরিয়ে, একটা ফিউজ খুলে নিয়ে গোটা একটা শহরের লক্ষ-লক্ষ লোকের জীবনযাত্রা অচল করে দেওয়া যায়। কাজেই, মুষ্টিমেয় লোকের পক্ষে এখন লক্ষ মানুষের মাথার ওপর ডেমোক্লিসের খড়্গ ঝুলিয়ে দিয়ে বলা সম্ভব—"আমাদের দাবি মানো, নইলে সুতোটি কুচ করে কেটে দেব।" ভবিষ্যতে, আমাদের জীবন যত কমপিউটার-নির্ভর হয়ে উঠবে, এই বিপদের আশঙ্কা তত বাড়বে। আলাদিনের প্রদীপের জিন তখন যে কী আকার নেবে, আমাদের পক্ষে এই মুহূর্তে কল্পনা করাও কঠিন।

আজকের কথা নয়

সন্ত্রাসবাদের বিপদের এই মাত্রাটা নতুন, কিন্তু সন্ত্রাসবাদ অতি প্রাচীন। ইতিহাসের আদি থেকে মানুষ যেমন প্রচুর রক্তপাত ঘটিয়ে আসছে ব্যক্তিগত রাগ-দ্বেষ-হিংসা-লোভের তাড়নায়, তেমনি আবার সমষ্টিগতভাবে নিজের ধর্ম, নিজের গোষ্ঠী, নিজের জাতির গৌরব এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অভিলাষে সে নেমেছে সম্মুখসমরে। এ ছাড়াও, যুগে-যুগে দেশে-দেশে অল্পসংখ্যক লোক নির্বিচার আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়ে বৃহত্তর সমাজকে কাবু করতে চেয়েছে। কী উদ্দেশ্য নিয়ে? কেউ পাপীদের বিনাশ করে ধর্মসংস্থাপন করবে বলে বদ্ধপরিকর, কেউ-বা প্রকৃত অথবা কল্পিত কোনো অন্যায় কিংবা অবিচারের প্রতিকার করবার পণ নিয়েছে, কেউ উদ্‌যাপন করছে সমাজ থেকে কিংবা পৃথিবী থেকে শোষণ-পীড়ন, দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করবার ব্রত। উদ্দেশ্য নানাবিধ, মনোভাব একই : ন্যায়ের খড়্গ আমাদের হাতে, অন্যায়কারীর মুণ্ডচ্ছেদ আমাদেরই করতে হবে, প্রয়োজনে, যে কোনো অন্যায় করে নি, পুরুষ হোক, স্ত্রী হোক, বৃদ্ধ হোক, শিশু হোক—তাকেও বলি দিতে হবে আমাদের মহৎ উদ্দেশ্যের যূপকাষ্ঠে। ডিম না ভেঙে কি অমলেট বানানো যায়?

সে অমলেট আধ্যাত্মিক হতে পারে, রাজনৈতিক হতে পারে, নানাবিধ-মতাদর্শগত হতে পারে, নানা স্বপ্নের, নানা কল্পনার হতে পারে।

মধ্যযুগে ইউরোপে বহুসংখ্যক এমন খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল, যারা বিশ্বাস করত দ্বিতীয়বার আগমনের পর যীশু খ্রীষ্ট পৃথিবীতে ধর্মরাজ্যের

প্রতিষ্ঠা করবেন, এবং এক হাজার বছর ধরে সে রাজ্য তিনি নিজে শাসন করবেন। তারপরে আসবে শেষ বিচারের দিন। তাদের মধ্যে অনেকে গভীরভাবে বিশ্বাস করত সেই পুনরাগমন ঘটবে তাদেরই জীবনকালে। সেইরকম কোনো-কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিশ্বাস এমন উগ্র আকার ধারণ করেছিল যে অধর্মের, অর্থাৎ অধার্মিকের বিনাশ করে সেই ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করবার দায়িত্ব তারা নিজেদের ওপর নিয়েছিল, বলা চলে।

পুনরাগমন যে প্রত্যাসন্ন, তার লক্ষণ তারা অনবরত দেখছিল তাদের চারপাশে। অনাচার চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত, প্রতিষ্ঠিত চার্চ পাপে পরিপূর্ণ, পৃথিবীর অন্তিম দিনের ঠিক আগে খ্রীষ্ট-বিরোধী যে অধর্মনায়ক অ্যান্টি-ক্রাইস্ট-এর আবির্ভূত হওয়ার কথা, তার আধিপত্য দ্রুত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কাজেই, আর দেরি নেই—পরিত্রাতা এলেন বলে।

ধরা যাক মধ্যইউরোপের একটি ছোটো রাজ্য অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বোহেমিয়ার কথা। মধ্যযুগের শেষের দিকে বোহেমিয়া এই ধর্মরাজ্যবাদী আন্দোলনের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। চার্চের অভ্যন্তরে অনাচারে সেখানেই উঠেছিল তুঙ্গে। চারচের পার্থিব সম্পদ সঞ্চিত হয়েছিল বিপুলপরিমাণে, দেশের ভূ-সম্পত্তির অর্ধেকের বেশি ছিল চারচের অধিকারে। ধর্মযাজকদের মধ্যে অনেকেই, বিশেষ করে যাঁরা প্রধান তাঁদের অধিকাংশ বিলাস-ব্যসনে ডুবে থাকতেন। শুধু তাই নয়, রাজ্যশাসনেও তাঁদের হস্তক্ষেপ অহরহ ঘটত। তার ওপর জাতি-বৈরও ছিল। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে বোহেমিয়াতে জারমান-বংশোদ্ভূত জারমানভাষী একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী উচ্চতর ধর্মযাজকদের মধ্যে বেশ একটি বড়োসড়ো স্থান দখল করে বসেছিলেন। ফলে, বোহেমিয়ার স্থানীয় অধিবাসী চেকদের মধ্যে ধর্মযাজকদের অনাচারের সম্পর্কে বিক্ষোভ তো ছিলই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সংখ্যালঘু বহিরাগতদের সম্পর্কে বৈরীভাব।

কাজেই, বিক্ষুব্ধ ধর্মচেতনা এবং ধূমায়িত জাতীয়তাবোধ মিলে সন্ত্রাসবাদের উপযোগী একটি ক্লাসিক পরিস্থিতি তৈরি করে রেখেছিল, বলা চলে। সামনে ছিল আসন্ন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা। অবশ্য, খ্রীস্টের অন্তিম জয় অবধারিত, কিন্তু প্রকৃত খ্রীস্টানদের কর্তব্য অ্যানটি-ক্রাইসটের বিরুদ্ধে তখনই অস্ত্রধারণ করা। এদিকে, অন্যভাবেও প্রস্তুত ছিল ক্ষেত্র। দারিদ্র্য ছিল, বিপুল জনসংখ্যার ভার ছিল শহরে, গ্রামাঞ্চলে কৃষিজীবীদের অবস্থা ক্রমে হয়ে উঠছিল দুঃসহ।

ঈশ্বরের নামে হত্যা

টেবর-বাদী নামে পরিচিত একটি গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় প্রচারকেরা প্রচার করতে আরম্ভ করলেন, শেষের দিন আগতপ্রায়। এমন-কি তাঁদের অনেকে সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করলেন—১৪২০ খৃষ্টাব্দের ১০ থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রত্যেকটি গ্রাম এবং শহর আগুনে ধ্বংস হবে, যেমন হয়েছিল বাইবেলের বিবরণ অনুযায়ী, পাপ নগরী সডম। সারা খ্রীষ্টান দুনিয়া জুড়ে ঈশ্বরের রোষ দগ্ধ করবে তাদের প্রত্যেককে যারা শহর-গ্রাম ছেড়ে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় না নেবে। 'দি মাউনটেনস', অর্থাৎ পাহাড় বলতে তাঁরা বুঝিয়েছিলেন পাঁচটি নগরী, যেখানে টেবর-বাদীরা তাদের ঘাঁটি গেড়েছিল, আধুনিক পরিভাষায় যাকে বলা চলে "মুক্ত অঞ্চল"। দলে-দলে গরিব লোকেরা তাদের যাবতীয় জিনিসপত্র বিক্রি করে পরিবারপরিজন নিয়ে সে পাঁচটি শহরে গিয়ে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করল।

এরা তখন নিজেদের চোখে নিজেরা অ্যানটি-ক্রাইসট, এবং তার দলবলের বিরুদ্ধে অন্তিম সংগ্রামের সৈনিক, ধরাধামকে পাপ-মুক্ত করবার দায় তাদের ওপরে। তাদের একজন প্রচারক, জন চ্যাপেক নামে প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্নাতক, ওলড টেসটামেনট থেকে উদ্ধৃতিসহযোগে ঘোষণা করলেন, যারা ঈশ্বর-কর্তৃক নির্বাচিত, তাদের প্রত্যেকের অবশ্যকরণীয় কর্তব্য ঈশ্বরের নামে হত্যা করা। অন্য প্রচারকরাও কেউ বললেন, পাপীদের প্রতি কোনো করুণা নয়, কেননা পাপীরা খ্রীষ্টের শত্রু, কেউ বললেন, "খ্রীষ্টের শত্রুদের রক্তে নিজের তরবারি যে রাঙাবে না, তার ওপর বর্ষিত হোক অভিশাপ।" প্রচারকরা নিজেরাও সাগ্রহে সেই হত্যা-অভিযানে যোগ দিলেন কারণ, "প্রত্যেকটি ধর্মযাজক আইনত পাপীদের পশ্চাদ্ধাবন করতে পারেন, তাদের আহত করতে পারেন, হত্যা করতে পারেন।"

পাপী কারা, শত্রু কারা? উগ্রপন্থী টেবর-বাদীদের দৃষ্টিতে, তাদের বিপক্ষীয়রা সবাই পাপী, সবাই

খ্রীষ্ট-শত্রু, তাদের সকলকেই নির্বিচারে নিঃশেষ করা অবশ্যকর্তব্য। সেই সময়কার একজন ধর্মরাজ্যবাদীর লেখা একটি ল্যাটিন পুস্তিকা এখনও বর্তমান। তাতে আছে : "পুণ্যবানেরা এখন আনন্দ করবে, প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে দেখে, পাপীদের রক্তে নিজেদের হাত প্রক্ষালিত করে।"

টেবর-বাদীদের মধ্যে যারা একেবারে চরমপন্থী তারা, দেখা গেল, একমাত্র নিজেদের অনুগামী ছাড়া কাউকেই রেহাই দিতে রাজি নয়। তাদের মতো, এই পাপী-নিধন-যজ্ঞে যারা সক্রিয়ভাবে যোগ দিতে অক্ষম কিংবা অসম্মত, তারাও সবাই পাপী, তাদেরও পাপের বেতন মৃত্যু। এবং, বলা বাহুল্য, সে বেতন এখনই চুকিয়ে দিতে হবে।

ধর্মরাজ্য

তারপর পৃথিবীতে নেমে আসবে খ্রীষ্টের শাসন। তখন পৃথিবীতে অভাব থাকবে না, দৈন্য থাকবে না। দেহ-ধারণজনিত পাপ লোপ পাবে। স্ত্রীরা বিনা সংগমে সন্তান ধারণ করবে, বিনা যন্ত্রণায় সন্তান প্রসব করবে। ব্যাধি থাকবে না, মৃত্যু থাকবে না। পুণ্যবানেরা শান্তিতে এবং প্রেমে একত্রে বাস করবেন। কোনো আইন থাকবে না তাঁদের জন্যে, কোনো জোর-জবরদস্তি থাকবে না, ধরাধামে প্রতিষ্ঠিত হবে সহজাত সাম্যের স্বর্গ।

মধ্যযুগীয় ধর্মরাজ্যবাদীদের এই বিবরণ নরম্যান কোঁন-এর 'দ্য পারসিউইট অব দ্য মিলেনিয়াম' (অকস-ফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, নিউ ইয়রক, ১৯৭০) বই থেকে গৃহীত। বইটিতে সেই যুগের ধর্মরাজ্যবাদী সন্ত্রাসবাদী আরও কয়েকটি গোষ্ঠীর আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা আছে, যথা, ওয়ালডেনেসীয়, অ্যানাবাপটিসট, ইত্যাদি। কিন্তু নাম যাই হোক, প্রবর্তক এবং নেতা যাঁরাই হন, উদ্ভব যেখানেই হয়ে থাক, এই সমস্ত সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর যা লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, তাদের যা কর্মপন্থা, এমন কি তাদের প্রচারের যা বিষয়বস্তু, ভাষা এবং ভঙ্গী, তার মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে বের করা খুবে কঠিন। খ্রীষ্টের আসন্ন পুনরাগমনে অবিচল প্রত্যয়, পৃথিবীতে খ্রীষ্টের শাসনে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার দিন সন্নিকট এই দৃঢ় বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় সংগঠন যে ঘোরতর পাপে লিপ্ত এই সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত এবং পাপের অর্থাৎ পাপীর উচ্ছেদ প্রকৃত ধার্মিকের অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য, এই বোধ ওইসব গোষ্ঠীর মধ্যেই সমানভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। তার সঙ্গে ছিল, সেই ধর্ম-রাজ্য কী রকম হবে সে সম্পর্কে প্রায় একই ধরনের বিশ্বাস।

অবশ্য তারা সবাই খ্রীষ্টান ছিল ; কতকগুলি সাধা-রণ মৌলিক বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত তাদের ধ্যানধারণার মধ্যে মৌলিক সাদৃশ্য থাকবে, সেইটাই স্বাভাবিক। তার-পরে, বিপুলসংখ্যক মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, নানা রকমের দুর্ভোগ, রোগযন্ত্রণা, মহামারী, অহরহ মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের বোধ একদিকে যেমন ব্যাপক অস্থিরতার সৃষ্টি করেছিল, তেমনি আবার অসহায় আর্তি এবং অন্ধবিশ্বাস মানুষের চিত্তকে উন্মুখ করেছিল এক পার্থিব স্বর্গের দিকে। আজ আমাদের চোখে সেই স্বর্গ এক অলীক স্বপ্ন। কিন্তু তাই বলে সেই অলীক স্বপ্নের জন্যে মানুষের ইতিহাসে রক্ত কম ঝরে নি।

পর্বতবাসী বৃদ্ধ

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর ভেনিসীয় পর্যটক মারকো পোলো মধ্যপ্রদেশের এক কিংবদন্তী-পুরুষের কথা তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ধর্মের জন্যে নর-হত্যা করলে আততায়ী স্বর্গে গিয়ে কী ধরনের সুখ-ভোগ করে থাকে, তার পরিচয় ইহজীবনেই যাতে সে পায় তার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। অর্থাৎ, মৃত্যুর আগেই স্বরূপকালের জন্যে স্বর্গবাস।

পর্বতবাসী বৃদ্ধ, দি ওলড ম্যান অব দ্য মাউনটেন, নামে তিনি সন্ত্রাসবাদের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। দুটি পর্বতের মধ্যবর্তী এক রমণীয় উপত্যকা তিনি নাকি এমন দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত করে নিয়েছিলেন যে, তিনি যাদেরকে আমন্ত্রণ করে আনতেন, তারা ছাড়া অন্য কারও সাধ্য ছিল না সেখানে প্রবেশ করে। সেই ভাগ্যবান কারা ছিল? 'অ্যাসাসিন', অর্থাৎ গুপ্তঘাতক বলে যাদেরকে তিনি নির্বাচিত করতেন, একমাত্র তারাই। ইংরেজি 'অ্যাসাসিন' শব্দটি সেখান থেকেই এসেছে। ১২ থেকে বেছে-বেছে, যাদের যুদ্ধবিদ্যায় আগ্রহ আছে তাদের তিনি সংগ্রহ করতেন, তারপর তাদের কানে ঢালতেন ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী স্বর্গের বিবরণ। সে শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে তিনি তাদের ছোটো-ছোটো দলে নিজের সৃষ্ট স্বর্গোদ্যানে, অর্থাৎ সেই উপত্যকায় নিয়ে যেতেন। কিন্তু তার আগে তাদের কী এক ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হত। ফলে, ঘুম ভাঙলে তারা দেখত, সত্যিকারের স্বর্গে তারা প্রবেশ করেছে। ঠিক যেমন তারা শুনেছিল, তেমনি স্বর্গ। সুন্দর-সুন্দর বাগান, তার মধ্যে দিয়ে ছোটো-ছোটো স্রোত বয়ে চলেছে দুধের, মধুর, মদিরার। সুন্দরী রমণীরা অপেক্ষা করে আছে তাদের মনোরঞ্জন করবার জন্যে। তাদের কোনো সন্দেহ থাকত না—এই সেই স্বর্গ। তারপর যখন আবার তাদের মতর্ধামে ফিরিয়ে আনা হত, সেইরকমভাবে বেহুঁশ করে, স্বভাবতই তারা প্রাণ নিতে এবং প্রাণ দিতে কুণ্ঠা করত না, যখন শুনত অমুক-অমুক ব্যক্তিকে খুন করলে মৃত্যুর পর তারা অনন্তকাল সেই স্বর্গে বাস করতে পারবে। এইভাবে নাকি সেই পর্বতবাসী বৃদ্ধ এক দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসবাদী বাহিনীর সৃষ্টি করেছিলেন।

এ বিবরণ সত্য, না অতিরঞ্জিত, না কি এ নিছক কিংবদন্তী, মারকো পোলোর বৃত্তান্ত ছাড়া অন্য কোনো সূত্র থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায় কিনা, আমার জানা নেই। মারকো পোলো বলেছেন, এ তাঁর কানে শোনা, ওইসব অঞ্চলের অনেক লোকের মুখে শুনেছেন। কাজেই এ ঘোলো আনা খাঁটি সত্য নাও হতে পারে। তবে, একথা ঠিক, আক্ষরিক অর্থে না হলেও, গভীরতর অর্থে, সন্ত্রাস-বাদী সংগঠন এবং মনোভাবের ভেতরে-ভেতরে যে ধরনের চিন্তাভাবনা এবং অনুপ্রেরণা কাজ করে, তার একটা সত্য প্রতিফলন এই কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায়।

নিজের কিংবা নিজের পরিবারপরিজনের সাংসারিক হিসেবে কোনো লাভের আশা না করে, যাকে খুন করব তার বিরুদ্ধে নিজের কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশের বশেও নয়, আত্মরক্ষার তাগিদেও নয়, জেনেশুনে, হিসেব করে, ঠান্ডা মাথায়—এক বা একাধিক, হয়তো সম্পূর্ণ অপরি-চিত, ব্যক্তিকে মানুষ তখনই খুন করতে পারে যখন তার বদ্ধমূল ধারণা জন্মায়, হয় ইতিহাস, নয় ধর্ম, তার জন্যে তুলে রেখেছে বৃহত্তর কোনো পুরস্কার, নয়তো ইতিহাস, কিংবা ধর্ম তার হাতে তুলে দিয়েছে বৃহত্তর কোনো ন্যায়ের খড়্গ। পর্বতবাসী বৃদ্ধ আততায়ীর হাতে যে অস্ত্র সমর্পণ করতেন, সেই আততায়ীর দৃষ্টিতে সেটা হত ঈশ্বরের আশীর্বাদপূত, এবং তার সামনে যে প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি তুলে ধরতেন, তা ছিল মনুষ্যজীবনের চরম প্রাপ্তি। সন্ত্রাসবাদের পাকশালায় এর চেয়ে সেরা উপ-করণ আর কেউ যোগাতে পারে নি আজ পর্যন্ত।

অবশ্য, হিংসাবৃত্তির নিজস্ব একটা আকর্ষণও আছে, গুপ্ত চক্রান্তের একটা রোমাঞ্চ আছে, এবং তাও যুগে-যুগে মানুষকে টেনে নিয়েছে অন্ধকারাচ্ছন্ন রক্তপিচ্ছিল পথের দিকে। কিন্তু ভলটেয়ারের কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলতে পারি, সেই আরসেনিকের সঙ্গে একটু মন্ততন্ত্র যদি যুক্ত করা যায়, অর্থাৎ অন্ধকারের এবং রক্তের আদিম আকর্ষণের সঙ্গে যদি মিশিয়ে দেওয়া যায় প্রায় সেই-রকমই আদিম কোনো বিশ্বাস, কোনো সম্মোহনকে, তখন যে মিশ্রণটি প্রস্তুত হয়, তার ক্ষমতা কী রকম সাংঘাতিক, আজ পর্যন্ত তার প্রমাণ আমরা পেয়ে চলেছি।

তবে সে মিশ্রণের রকমফেরও হতে পারে। কখনও হয়তো দেখা গেল, তাতে বিচারবোধের মাত্রা বেশি, অন্ধ-বিশ্বাসের মাত্রা তুলনায় কম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট এবং বাস্তবসম্মত। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার একমাত্র পন্থা বলে যদি সন্ত্রাসবাদীরা মনে করে, এবং যদি বুদ্ধিগ্রাহ্য বিচার-বিশ্লেষণের পরেই যদি তারা সে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকে, তাহলে, তাদের সঙ্গে একমত হই বা না হই, অন্ধ, মোহাবিষ্ট বলে তাদের নিন্দিত করতে পারি না। তবে, এ ক্ষেত্রেও আততায়ীর চিত্তের কোনো গভীর তলদেশ থেকে যুক্তি-বুদ্ধির অতীত কোনো আদিম বৃত্তি যে উঠে আসে না, কাঠিন্য দেয় না তার সংকল্পকে, সে কথাও সুনিশ্চিতভাবে চলে কিনা সন্দেহ। মানুষমনের মনস্তত্ত্ব কখনোই খুবে সরল হতে পারে না।

সন্ত্রাসবাদের আরেক প্রান্তে

তবু, অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই, একদিকে যেমন পর্বতবাসী বৃদ্ধের সেই 'অ্যাসাসিন'-রা ছিল, তেমনি আরেক দিকে উনিশ শতাব্দীর রাশিয়ায় 'নারদনায়া ভলিয়া', অর্থাৎ 'জনগণের সংকল্প' নামে সমাজবাদী বিপ্লবীদের যে দলটি, সন্ত্রাসবাদের ইতি-হাসে তার কথাও বিবেচনা করতে হয়। 'দ্য মরালিটি অব টেররিজম' (পারগ্যামন প্রেস, নিউ ইয়রক, ১৯৮২)

নামক সংকলনগ্রন্থের জীভ ইভিয়ানসকি-র লেখা প্রদত্ত বিবরণ থেকে দেখা যায়, ওই দলটি প্রথমে সন্ত্যাসবাদের পথে প্রবেশ করেছিল নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল তখনকার রাশিয়ায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রে আঘাত হানা, অর্থাৎ সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে হত্যা করা। মাত্র পাঁচ বছর ছিল এর আয়ুষ্কাল, ১৮৮৪-তে এর পতন ঘটে। কারো কারো মতে, উনিশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের রাশিয়াতে যে বুদ্ধিজীবীদের উন্মেষ হচ্ছিল, তাঁদের মধ্যে সবচাইতে মূল্যবান কয়েকটি রক্তকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল 'নারদনায়া ভলিয়া'-র কার্যনির্বাহী সমিতি। তাঁদের যে গুণটি সবচেয়ে লক্ষ করবার মতো ছিল, তা হল ২৪ থেকে ৩০ বছর বয়স্ক সেই যুবকদের প্রখর নীতিবোধ। স্বভাবতই, একটি প্রশ্ন তাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল : "সন্ত্যাসবাদকে কতদূর নিয়ে যাওয়া উচিত, কোথায় তার নৈতিকতার সীমা, কোথায় অপরাধের আরম্ভ? পি. এল. লাভরভ ছিলেন ওই দলের একজন সদস্য। দলের একটি মুখপত্রে প্রকাশিত 'সমাজবিপ্লব ও নৈতিকতার কর্তব্য' নিবন্ধে এই প্রশ্নটি ছিল তাঁর প্রধান বিবেচ্য। দুটি ধারণাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন স্বতঃসিদ্ধ বলে। প্রথম : "চিরকাল, সর্বত্র, যে মানুষের চেতনা নেই, তার নীতিবোধ নেই, তার মধ্যে সেইটিরই অভাব, মানুষের যেটি বিশিষ্ট লক্ষণ।" দ্বিতীয়ত : "যে মানুষ নিজের মতের বিরুদ্ধে কাজ করে, কিংবা এমন কাজ করে যা তার নিজের মতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এবং যে নিজের বিবেকের জন্য প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকার করতে অক্ষম নৈতিকতার বিরুদ্ধে সে পাপাচরণ করে।" তিনি আরও বলেন, "নিজের চিন্তা-ভাবনার যে সমালোচনা করতে পারে না, মনে করে নিজের মতামত অভ্রান্ত, অপরিবর্তনীয়, তার নীতিবোধ বিকৃত এবং মানবিক মর্যাদার হানিকারক।" সর্বোপরি, লাভরভ বলেছেন, "বিনা প্রয়োজনে একবিন্দু রক্তও যেন না ঝরে"।

অর্থাৎ, সুতীব্র চেতনা, কঠোর আত্মসমালোচনা, সদাজাগ্রত নৈতিক বোধ, এবং একান্ত অনিচ্ছা সহকারে হিংসার পথ অবলম্বন—সেই রুশ সন্ত্যাসবাদী গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় পরিচালকদের এইগুলি ছিল মৌলিক বৈশিষ্ট্য। সন্ত্যাসবাদের পেছনে এই দুরূহ আদর্শ ইতিহাসে কত বিরল, ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, কার্যনির্বাহী সমিতির শ্রেষ্ঠ সদস্যদের গ্রেপ্তার অথবা প্রাণদণ্ডের পর 'নারদনায়া ভলিয়া'-র সেই আদর্শ থেকে স্খলন ঘটে. আত্মসমীক্ষণ বন্ধ হয়ে যায়, দূরে ঠেলে দেওয়া হয় যাবতীয় দ্বিধা এবং প্রশ্ন. নির্বিচার আত্মবিসর্জনের ঐকান্তিক আগ্রহ গ্রাস করে বাকি সদস্যদের।

কেন্দ্রীয় পরিচালন থেকে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন উগ্র সন্ত্যাসবাদী গোষ্ঠী তখন স্বাধীনভাবে লিপ্ত হয় রক্তক্ষয়ী কার্যকলাপে। সেইরকম একটি গোষ্ঠী ১৮৮৭-র ১লা মারচ তৃতীয় আলেকজানডারের প্রাণনাশের চেষ্টা করে। লেনিনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আলেকজানডার উলিয়ানভ সেই গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন, এবং তাঁদের সেই ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর তাঁর ফাঁসি হয়েছিল।

এই গোষ্ঠী ন্যূনতম এই তিনটি শর্তে তাদের সন্ত্যাসবাদী ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করবে বলে জানিয়েছিল : (১) বিবেকের, মতামত প্রকাশের, সংগঠনের এবং সম্মেলনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা; (২) প্রত্যক্ষ নির্বাচনের পর সাধারণ সভার আহ্বান, (৩) সাম্প্রতিক কালের সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি। সন্ত্যাসবাদের উপযোগিতা তারা এইভাবে ব্যাখ্যা করেছিল : "নিয়মিত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দ্বারা সরকারের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা আদায় করার উপায় হিসেবেই এর প্রধান গুরুত্ব, যদিও এর অন্যবিধ কার্যকরতাকেও আমরা অগ্রাহ্য করতে চাই না।" সন্ত্যাসবাদী ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তাঁরা বলেন. "সেটা সহজ নয়, তার কোনো প্রয়োজনও নেই। যখন যেমন দরকার সেই অনুযায়ী এর দিক নির্ণীত হবে, এর গতির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে আপনা থেকেই।"

ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন

বিশেষ-বিশেষ অবস্থা থেকে বিশেষ-বিশেষ সন্ত্যাসবাদী ক্রিয়ার উদ্ভব হয়, এবং তাঁর প্রয়োজন, অথবা কর্তব্যবোধ কখনও-কখনও জন্ম দেয় সন্ত্যাসবাদের, এ সবই ঠিক। তবু উদ্দেশ্য এবং পন্থার একটা প্রশ্ন থেকে যায় শেষ পর্যন্ত। একথা অস্বীকার করা কঠিন, নিপীড়ন এবং অন্যায় কোনো সমাজে অথবা রাষ্ট্রে এমন স্তরে উঠতে পারে, এবং তার হাত থেকে মুক্তির, কিংবা অন্তত তার প্রশমনের সমস্ত সম্ভাবনা এমনভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে, কিংবা মনে হতে পারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যে, তখন সন্ত্যাসবাদের ভালোমন্দের বিচার, মনে হয়, সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। যুদ্ধের সময়ে শত্রু-অধিকৃত দেশে মুক্তিকামীদের সন্ত্যাসবাদ নিন্দনীয় কিংবা অবাঞ্ছনীয় বলে কেউ মনে করে না, একমাত্র সেই দখলদার বিদেশী রাষ্ট্র কিংবা তার সহযোগীরা ছাড়া। কিন্তু, যুদ্ধকালীন বিশেষ অবস্থার কথা বাদ দিলেও, কোনো পরাধীন দেশ, কিংবা কোনো জাতি যারা নিজেদেরকে, এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হলেও, অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করে, এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তারা যখন স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করে, সেও কি একটা যুদ্ধ নয়? পরাধীন ভারতে সন্ত্যাসবাদী কার্যকলাপের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। হত্যা এবং ফাঁসি ছাড়া এদেশের সামনে স্বাধীনতার দিকে আর কোনো পথ খোলা ছিল না, কিংবা সন্ত্যাসবাদ স্বাধীনতার আগমন ত্বরান্বিত করেছে, এমন দাবি ইতিহাসের দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হবে কিনা, সে প্রশ্নে না গিয়ে এ কথা অবশ্যই বলা যায়, সেই সময়ে সেই মরণপণ মুক্তিপ্রয়াসীদের চোখে আর কোনো উপায় প্রতীয়মান হয় নি স্বাধীনতা-অর্জনের। শুধু তাই নয়, চরম মূল্য দেব মাতৃভূমির মুক্তির জন্যে, অর্থাৎ প্রাণ দেব—এই একটা স্বপ্নও ছিল। কী পাব, তার চেয়ে, কী দেব—এই কথাটাই বড়ো হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু, প্রাণের বেলায়, দেওয়ার সঙ্গে নেওয়ার প্রশ্ন জড়িয়ে থাকে। দেশের জন্যে, অথবা ঈশ্বরের জন্যে, অথবা কোনো স্বপ্ন বা আদর্শের জন্যে প্রাণ দিতে যে প্রস্তুত, সাধারণভাবে বলা যায়, সে প্রাণ নিতেও প্রস্তুত। সাধারণত, নিলে, কিংবা নেওয়ার চেষ্টা করলে, তবেই দেওয়ার সুযোগ ঘটে। অবশ্য, অহিংস সত্যাগ্রহীকেও কখনও-কখনও পুলিসের লাঠি অথবা গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছে, এবং ১৯৩১ সালে ভগত সিং-এর প্রাণদণ্ডের পর গান্ধী বলেছিলেন, "কিন্তু, আমার তরুণ বন্ধুরা যদি আহত না হন, আমি বলি, 'দি মীক, দি জেন্‌টল, দি ননভায়লেন্ট'-এর যে মহত্তর বীর্যবত্তা, তাই আমি চাই, যে বীর্যবত্তা ফাঁসির মঞ্চে চড়তে প্রস্তুত, একটিমাত্র প্রাণীকেও আঘাত না করে, আঘাত করার কোনো চিন্তা মনে না রেখে", তবু, নিঃসন্দেহে, যে বীর্যবত্তা চিরকাল মানুষের আবেগকে উন্মথিত, তার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে এসেছে, সে অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ়, তার হাতে রক্তরাঙা তরবারি, তার আরাধ্য নৃমুণ্ডমালিনী।

উচ্চতর আইন

কোনো সন্ত্যাসবাদী যখন দাবি করে, সভ্য সমাজের সাধারণ আইনকানুন তার জন্যে নয়—ধর্মীয়, বৈপ্লবিক, ঐতিহাসিক কোনো উচ্চতর আইনের প্রতি তার আনুগত্য, তখন সত্যিই মনে হয়, নগণ্য আমাদের পাঁনাল কোড, নগণ্য আমরা, যারা তার অনুশাসন মেনে নিয়ে তুচ্ছ, নিরুপদ্রব জীবন যাপন করতে চাই। মুক্ত কৃপাণ হাতে নিয়ে যারা ঈশ্বরের কিংবা ইতিহাসের অমোঘ বিধানকে জয়যুক্ত করবার জন্যে এগিয়ে চলেছে, আমাদের কর্তব্য, আর কিছু না পারি, তাদের পথ ছেড়ে দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়ানো।

বিশেষ কোনো অবস্থায়, বিশেষ কোনো প্রয়োজন সাধনের জন্যে নয়, হত্যা, সন্ত্যাস, নিয়মতান্ত্রিক শাসনাধীন সামাজিক জীবনকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে হবে, এই যে সংকল্প, এর একটা নিজস্ব তত্ত্ব এখন গড়ে উঠেছে। এই তত্ত্বের মূল সিদ্ধান্ত হল, যে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অধীনে আমরা বাস করি, যার ওপর আমরা নির্ভর করি, সন্ত্যাস দমন করে আমাদের নিরাপত্তাবিধানের জন্যে, সেই রাষ্ট্র নিজেই সন্ত্যাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত, এবং সেই রাষ্ট্রীয় সন্ত্যাস অল্পসংখ্যকের স্বার্থে, অধিক-সংখ্যকের দমন, পীড়ন এবং শোষণ কায়েম রাখবার কাজে নিয়োজিত। অতএব সেই রাষ্ট্রের উচ্ছেদকল্পে সন্ত্যাস-সৃষ্টি, নিপীড়ক রাষ্ট্রের সন্ত্যাসের বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানুষের সন্ত্যাস, নিন্দনীয় তো নয়ই, বরং অভিনন্দনের যোগ্য।

এই তত্ত্বের সর্বাগ্রগণ্য প্রবক্তাদের একজন, ফরাসি দার্শনিক সার্ত্‌র্ ১৯৬২-তে বলেছিলেন, "আমার মতে মৌলিক সমস্যা হল এইটাই, হিংসার বিরুদ্ধে বামপন্থা হিংসার আশ্রয় নিতে পারবে না, এই তত্ত্ব খারিজ করা দরকার।" এরই একটা নির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়ে তিনি এক জায়গায় বলেছেন, "কোনো কৃষকায় যখন কোনো শ্বেতকায়কে হত্যা করে, এক ঢিলে দুটি পাখি মারা হয়। একটি অত্যাচারী মরল, একজন অত্যাচারিতেরও মৃত্যু হল।" সার্তেরের এই উক্তিটি সন্ত্যাসবাদীদের মধ্যে বেদ-

বাক্যের মতো প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৃতীয় বিশ্ব যাকে বলা হয়—এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল—সেখানে এই বাক্য অনেকের কানে মন্ত্রের মতো শুনিয়েছিল।

সত্তরের দশকে

সত্তরের দশকে এই সন্ত্রাসবাদ এমন একটা ব্যাপ্তি লাভ করেছিল এবং এমন চমকপ্রদ সব কীর্তি স্থাপন করতে আরম্ভ করেছিল যে তারপর থেকে একে আর অপরাধ-ঘটিত সাধারণ সমস্যা বলে তুচ্ছ করবার কোনো উপায় থাকল না। তৃতীয় বিশ্বে নতুন-নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে, তার সব জায়গায় রাষ্ট্রশক্তি তেমন মজবুত হয়ে বসতে পারে নি, বিচ্ছিন্নতাকামী নানা শক্তি দেশে-দেশে ক্রিয়াশীল, ব্যাপক দারিদ্র্য এবং অবিচার অত্যাচার বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে তার জনসাধারণকে, অতএব তৃতীয় বিশ্বে সন্ত্রাস, হত্যা, বিশৃঙ্খলা নিত্যনিয়মিত ঘটতে থাকবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু সুসভ্য, সুসংগঠিত এবং বিত্তবান পাশ্চাত্যেও সন্ত্রাস কেন ঘনঘন মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে? যেসব দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দৃঢ়মূল, জনসাধারণের অভিরুচি অনুযায়ী যেসব রাষ্ট্র পরিচালিত, এবং পরিবর্তন কাম্য হলে, তার শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক পথ যেখানে খোলা, সেখানে রক্তাক্ত হিংসার পথ কেন ধরবে বিক্ষুব্ধ কোনো গোষ্ঠী? এইসব প্রশ্ন তখন আলোড়ন তুলতে আরম্ভ করল চিন্তাশীল ব্যক্তিদের এবং রাষ্ট্রপরিচালকদের মনে। তার কারণ, নানা পাশ্চাত্য দেশে সন্ত্রাসবাদ গুরুতর শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠছিল। ব্রিটেনে আইরিশ জাতীয়তাবাদের অমীমাংসিত প্রশ্ন এবং সে সংক্রান্ত অশান্তি-উপদ্রব অবশ্য আগে থেকেই ছিল। স্পেনেও বাস্‌ক জাতীয়তাবাদের আন্দোলন অনেক দিনের পুরনো, কিন্তু ইটালিতে, ফ্রান্সে, জারমানিতে? হল্যানডে? তবু ইটালি এবং জারমানিতে সন্ত্রাসবাদের অভ্যুত্থানের পশ্চাদ্‌পট একটা ছিল। ইটালিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা, বামপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি এবং কতকটা তারই প্রতিক্রিয়ায় চরমদক্ষিণ-পন্থী শক্তির অভ্যুদয়, এবং আবার তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ চরমবামপন্থার সংগঠিত হওয়া, এবং সন্ত্রাসবাদ অবলম্বন—এই ঘটনাপরম্পরার মধ্যে একটা স্বাভাবিকতা খুঁজে পাওয়া যায়, পশ্চিম জারমানিতেও, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধি অসন্তোষের একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল। তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছাত্রবিক্ষোভ যখন পশ্চিম জারমানিতেও ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তার কারণও আমরা বুঝতে পারি, কেননা পশ্চিম জারমানি আমেরিকার সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু হল্যানডের ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম। ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত দক্ষিণ মলাক্কার অধিবাসীদের মধ্যে একটা বিচ্ছিন্নতাকামী আন্দোলন চলছিল। ৩৫,০০০ দক্ষিণ মলাক্কা-বাসী, ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৯-৫০-এ হল্যানডে চলে আসে। সেখানে তারা স্থাপন করে 'স্বাধীন দক্ষিণ মলাক্কা প্রজাতন্ত্র' এবং দক্ষিণ মলাক্কায় ফিরে গিয়ে সেই রাষ্ট্র নিজেদের মাতৃভূমিতে স্থাপন করতে চায়। তাদের ইচ্ছা, বিশ্বজনমতের চাপে এবং তার সরকারের হস্তক্ষেপে ইন্দোনেশিয়া তাদেরকে স্বাধীন দক্ষিণ মলাক্কা স্থাপন করতে দিতে বাধ্য হোক। ১৯৭০ সালের গোড়ায় তারা ইন্দোনেশিয়া দূতাবাস আক্রমণ করে, এবং তাদের রাষ্ট্রদূতকে একদিন আটকে রাখে, মুক্তিপণ আদায়ের আশায়। ১৯৭৪-এ এবং ১৯৭৭-এ তারা যাত্রীসহ ট্রেন ছিনতাই করে। অর্থাৎ, একটি গোষ্ঠী একটি দেশে এমন একটি দাবি আদায়ের জন্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে থাকে যার সঙ্গে সে দেশের কোনো সম্পর্ক নেই।

দুশ্চিন্তার কারণ

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের এই নতুন চেহারাটাই তখন অনেকের কাছে সবিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠল। রুমে দেখা যেতে লাগল, এক দেশের সন্ত্রাসবাদ আরেক দেশে গিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ খুঁজছে, বিদেশী বিমান ছিনতাই করছে, বিদেশের মাটিতে নিজের দেশের মানুষকে হত্যা করছে। লনডন, প্যারিস, রোম আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে। সম্ভবত তার একটা প্রধান কারণ, ওইসব গণতান্ত্রিক পাশ্চাত্য দেশে এমন সব আইনগত অধিকার এবং স্বাধীনতা ভোগ করা যায়, সন্ত্রাসবাদীর নিজের দেশে যার একান্ত অভাব। ফলে, সেখানে অপেক্ষাকৃত সহজে সে নিজের দেশের কোনো কূটনীতিক কিংবা উচ্চ রাজপুরুষকে হত্যা করবার ব্যবস্থা করতে পারে।

এই যে, যাকে 'ওপন সোসাইটি' বলা হয়, সেখানেই যে সন্ত্রাসবাদ থেকে-থেকে গুরুতর আকার ধারণ করছে, অথচ যেসব দেশে নিপীড়ন এবং অন্যায়, দারিদ্র্য এবং অসাম্য, সরকারি জুলুম এবং সাধারণের দুর্ভোগ অতিশয় প্রকট, এবং তার নিরসনের উপায়ের একান্ত অভাব, সেখানে সন্ত্রাসবাদ মাথা চাড়া দিতে পারে না, এই ব্যাপারটা এখন অনেকেরই ভাবনার কারণ। তবে কি যে গণতন্ত্র মানুষকে আইনসিদ্ধ অধিকার দান করে, সন্ত্রাসবাদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানো তার পক্ষে অসম্ভব? তবে কি আইনের বাঁধনে জনসাধারণকে আরও কষে না বাঁধলে, তার নাগরিক অধিকার খর্ব না করলে, সরকারের হাতে অধিকতর ক্ষমতা তুলে না দিলে, সন্ত্রাসবাদ অপ্রতিহত গতিতে এগোতেই থাকবে?

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

চারদিকে একটা রব শোনা যাচ্ছে, সন্ত্রাসবাদ অদূর ভবিষ্যতে এমন আকার নেবে যে তখন আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কোনো উপায় থাকবে না তার হাত থেকে বাঁচবার। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ করবার জন্যে আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যবস্থা নেওয়া এখনই দরকার। গত নভেম্বরের ৭ তারিখে মার্কিন কংগ্রেসের ফরেন অ্যাফেয়ারস কমিটি এক প্রস্তাব গ্রহণ করে প্রেসিডেন্ট রেগনকে অনুরোধ করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্যে একটি আন্তর্জাতিক কো-অর্ডিনেটিঙ্ক কমিটি যেন তিনি গঠন করেন। তার কাজ হবে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের কৌশল নির্ধারণ করা, সে উদ্দেশ্যে কার্যকর পন্থা স্থির করা, এবং তথ্য বিনিময় করা এবং সন্ত্রাসবাদের বিষয়ে আলোচনার জন্যে নিয়মিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন করা, যাতে এ বিষয়ে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

এই প্রস্তাব গ্রহণের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল এমন একটি ঘটনা, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের যাকে বলা যায় একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। গত অকটোবরের প্রথম সপ্তাহে ঘটনাটির সূত্রপাত হয়, বিশ্বরাজনীতিতে এবং কোনো-কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তার জের এখনও মেটে নি। প্যালেসটেনীয় সন্ত্রাসবাদীদের চারজনের একটি দল মিশর থেকে একটি ইটালীয় বিলাসবহুল জাহাজ "অ্যাকিলি লরো"তে যাত্রী সেজে উঠে পড়েন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, জাহাজটি যখন ইসরায়েলের একটি বন্দরে ভিড়বে তখন তাঁরা সেখানে বড়ো আকারের একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করবেন। তাঁদের দুর্ভাগ্যক্রমে, তাঁদের একজন যখন একটি বন্দুক সাফ করছিলেন, জাহাজের এক কর্মী তাঁকে দেখে ফেলেন। তখন সন্ত্রাসবাদীরা আগেকার পরিকল্পনা ত্যাগ করে জাহাজটিকে দখল করে নেন। তাঁরা দাবি করেন, ইসরায়েলের জেলে বন্দী ৩০ জন সন্ত্রাসবাদী সহকর্মীকে মুক্তি দিতে হবে। তারপর তাঁরা খোঁজ শুরু করেন জাহাজের ৪০০ জন যাত্রী এবং কর্মীর মধ্যে আমেরিকান এবং ইহুদি কেউ আছেন কিনা। নিউইয়র্কের একজন বৃদ্ধ এবং পক্ষাঘাতে পঙ্গু ব্যবসায়ীকে তাঁরা হত্যা করেন, কিন্তু জাহাজের ক্যাপটেনকে বন্দুক দেখিয়ে বাধ্য করেন টেলিফোন-যোগে উপকূলে জানাতে যে, জাহাজের সবাই নিরাপদে আছেন। সে বৃদ্ধ এবং পঙ্গু মার্কিন ব্যবসায়ীর দেহ তাঁর চাকা-লাগানো চেয়ার-সমেত সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে ইটালি এবং মিশর পি· এল· ও-র নেতা ইয়াসের আরাফতের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করেছেন। আরাফত এখন টিউনিসে। আলোচনায় মীমাংসা হয়, সন্ত্রাসবাদীরা সঈদ বন্দরের অদূরে ধরা দেবেন, কিন্তু এই শর্তে যে টিউনিসে পি· এল· ও-র সদর ঘাঁটিতে তাঁদের নিরাপদে পৌঁছে দিতে হবে। যখন জাহাজের সেই হত্যাকাণ্ডের কথা জানা গেল, সন্ত্রাসবাদীরা তার আগেই বিমানযোগে মিশর থেকে রওনা হয়ে গেছেন। টিউনিসিয়া কিন্তু, আমেরিকার চাপে, তাঁদেরকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করল।

এর পর যে ঘটনাগুলো দ্রুত ঘটে গেল, যাবতীয় আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক জটিলতা এবং সংঘাতের সৃষ্টি তা থেকে। যে বিমানে সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, মার্কিন বিমানবাহিনী তাকে বাধ্য করল সিসিলি-স্থিত নেটো-র একটি ঘাঁটিতে অবতরণ করতে, ইটালির প্রেসিডেন্ট বেটিনো ক্রাকসির অনুমতিক্রমে। তখন দেখা গেল, সে বিমানে সন্ত্রাস-

বাদী চারজন ছাড়াও, পি. এল. ও.-র দুজন অফিসিয়ালও আছেন। তাঁদের একজন মোহাম্মদ আব্বাস, তিনি নাকি পি. এল. ও.-র সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের পিছনে 'মস্তিষ্ক', এবং 'অ্যাকিলি লরো' সংক্রান্ত মূল পরিকল্পনাটি নাকি তাঁরই। ইটালি দাবি করল, ধৃত প্যালিস্টেনীয়দের বিচার তাদের দেশেই হবে। কিন্তু সেই দুই পি. এল. ও. অফিশিয়ালকে যেখানে রেখেছিল, সেখান থেকে তাঁরা একটি যুগোশ্লাভ জাহাজে করে পালিয়ে গেলেন, যুগোশ্লাভিয়ায় আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে।

প্রতিবন্ধক

এই ঘটনাপরম্পরার ফল এ পর্যন্ত যা দাঁড়িয়েছে, মিশরের সঙ্গে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের আগেকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে একটা সংকট সৃষ্টি হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে মিশরের প্রেসিডেনট হোসনে মুবারককে নিজের দেশে এবং আরব দুনিয়ায় প্রচন্ড সমালোচনা এবং বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে ; ইটালির অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, ওই দুই পি. এল. ও. অফিসিয়ালের পলায়নের ফলস্বরূপ ; যুগোশ্লাভিয়া, যে আরব দুনিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ককে অত্যন্ত মূল্য দিয়ে থাকে, এবং মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও যে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে উৎসাহী, তার বিরুদ্ধেও আমেরিকাতে ঘোরতর অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

স্পষ্ট বোঝা যায়, রাজনৈতিক বাধা এখনও সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা ব্যাহত করতে পারে নানা ভাবে, নানা স্তরে। অভ্যন্তরীণ রাজনীতি তো আছেই ; তা ছাড়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রাজনীতিও দ্বন্দ্বসংকুল—স্বার্থের বিরোধ, পরস্পরের সম্পর্কে ভয় আর সন্দেহ, অহেতুক শত্রুতার মনোভাব ইত্যাদি পারস্পরিক সহযোগিতার পথে এখনও বড়ো-বড়ো প্রতিবন্ধক। এমন-কি, এক দেশের সরকার আরেক দেশে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ সক্রিয়ভাবে সমর্থন করছে—অস্ত্র দিয়ে, লোক দিয়ে, প্রশিক্ষণ দিয়ে সেখানে সন্ত্রাসবাদকে শক্তি যুগিয়ে যাচ্ছে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এমন অভিযোগ উঠেছে, সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে, কিউবা, পূর্ব জারমানি, লিবিয়া, ইরাক, সিরিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেন এবং কোনো-কোনো আরব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। প্রধানত মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, এবং কখনও-কখনও অন্যান্য রাষ্ট্রও বিশ্বের নানা স্থানে—দক্ষিণ আমেরিকায়, আফ্রিকায়, মধ্যপ্রাচ্যে, দক্ষিণ এশিয়ায়, দূর প্রাচ্যে অশান্তি, অস্থিরতা, সন্ত্রাসমূলক তৎপরতার জন্যে দায়ী করে ওইসব দেশকে। আবার, এই অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করে অভিযুক্ত পক্ষ বলে, ঔপনিবেশিক আধিপত্য থেকে, কিংবা নিপীড়ন- এবং শোষণমূলক শাসনব্যবস্থার হাত থেকে কোনো দেশের মুক্তির সংগ্রামে সহায়তা দেওয়া তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব। তেমনি আবার মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের যে পৃষ্ঠপোষকতা নিকারাগুয়া কিংবা আফগানিস্তানের সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের প্রতি, তাকেও সন্ত্রাসবাদের সমর্থনই বলতে হয়। অথচ, মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের চোখেই শুধু নয়, বিশ্বজনমতের এক বিপুল অংশের মতেও (রাষ্ট্রসঙ্ঘে একাধিকবার তার প্রকাশ আমরা দেখেছি) আফগানিস্তান এখন এমন সরকারের শাসনাধীন যা বাইরে থেকে চাপানো, অতএব আমেরিকার মতে, সেদেশের মানুষের স্বাধীনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পুনরুদ্ধারের বীরোচিত সংগ্রামে সব রকমের সাহায্য এগিয়ে দেওয়া আমেরিকার কর্তব্য। গত ১০ই ডিসেমবর মানবাধিকার দিবসে প্রেসিডেনট রেগন ঘোষণা করেছেন, "আমরা আমেরিকাবাসীরা আমাদের সহায়সম্পদ এবং প্রভাবপ্রতিপত্তি এই লক্ষ্য সামনে রেখে নিয়োগ করতে প্রতিশ্রুত, যাতে আমরা যেসব অধিকার ভোগ করি, বিশ্বের সবাই সেগুলি ভোগ করতে পারে। সেসব মানুষেরই প্রাপ্য।"

কিন্তু নিকারাগুয়ায় ? সেদেশের সরকারের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র সংগ্রাম চলছে, তাতে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশ্য এবং গোপন সাহায্যপ্রদান সমর্থন করবার মতো লোক বিশ্বে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কিন্তু সেই সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা বন্ধে মারকিন সম্মতি তথা সহায়তার আশা সুদূরপরাহত। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ (সেদেশের সরকারের হিসেব অনুযায়ী), এবং সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকার রাজনীতি তার সঙ্গে জড়িত। রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন, মানবাধিকারের প্রশ্ন, মতাদর্শ প্রভৃতি এমনভাবে এখন বিশ্বের নানা স্থানে জট পাকিয়ে আছে যে, সে জট খুলে সন্ত্রাসবাদ দমনের আশু প্রয়োজনটাকে অগ্রাধিকার দিতে, এবং তার জন্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যা নেওয়া দরকার তার

বিষয়ে একটা আন্তর্জাতিক সহমতে পৌঁছনো কত দিনে সম্ভব হবে, কে জানে !

ইতিমধ্যে কোনো-কোনো রাষ্ট্র নিজস্ব উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করতে আরম্ভ করেছে। এই প্রচেষ্টার পথিকৃৎ বলা যায় ক্ষুদ্র ইসরাইল। ১৯৭৬-এ একটি সশস্ত্র ইসরাইলী দল ব্রনটেবে বিমানবন্দরে একটি এয়ারবাসকে ছিনতাইকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করে। ছিনতাইকারীরা ছিল পশ্চিম জারমানির সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী আর. এ. এফ.-এর সদস্য। তাদের দুজন ইসরাইলীদের গুলিতে নিহত হয়। পরে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আফ্রিকান রাষ্ট্রজোট একটি প্রস্তাব তোলেন, এই উদ্ধারকার্যের জন্যে ইসরাইলের নিন্দে করে। কিন্তু তাতে অন্য কোনো-কোনো দেশকে ইসরাইলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা থেকে নিবৃত্ত করা যায় নি। ১৯৭৭-এর ১৩ই অকটোবর চারজন আরব মাজোরকা থেকে জারমানির পথে লুফতহানসা-র একটি বিমান ছিনতাই করে যখন তাকে ১৭ই অকটোবর তারিখ মোগাদিশুতে নামাতে বাধ্য করে, তখন পশ্চিম জারমান সরকার একটি বিশেষ উদ্ধারকারী দলকে সেদেশে পাঠান। তারা বিমানে হানা দিয়ে বন্দী যাত্রীদের উদ্ধার করে, তিনজন ছিনতাইকারী নিহত হন।

রাষ্ট্রসংঘে

রাষ্ট্রসংঘেও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সে চেষ্টা যে সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হয়েছে, তা বলা যায় না। ১৯৭২ সালে, টেল-আভিভে লড বিমানবন্দরে সন্ত্রাসবাদী হত্যাকান্ড, মিউনিক ওলিমপিকের সময়ে প্রাণহানি, এবং ইসরাইলি কূটনীতিকদের উদ্দেশ্যে ডাকযোগে বিস্ফোরক প্রেরণের একাধিক ঘটনার পর, রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব সাধারণ পরিষদকে অনুরোধ করেন এমন কার্যকর ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে যাতে, "সন্ত্রাসবাদ, যা মানুষের জীবনসংশয় ঘটায়, মৌলিক অধিকার বিপন্ন করে, তা যেন নিবারিত হয়।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে আকারে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়, তাতে কার্যক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদ দমনে রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা কী দাঁড়াবে সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায় অনেকেরই মনে। সন্ত্রাসবাদ দমনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে সে প্রস্তাবে বলা হয়, "যেসব জাতি ঔপনিবেশিক এবং বর্ণবাদী শাসনের অধীন তাদের সকলের আত্মনিয়ন্ত্রণের এবং স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অধিকার রাষ্ট্রসংঘ ঘোষণা করছে, এবং তাদের সংগ্রাম, বিশেষত স্বাধীনতালাভের সংগ্রাম, জাতিসংঘের সনদ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রস্তাব অনুযায়ী যা আইনসংগত, তার সমর্থন করছে।"

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দমনের নামে রাষ্ট্রসংঘ জাতীয় স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামের বিরোধিতা করুক, এ দাবি কোনো পক্ষ থেকে উঠবার সম্ভাবনা কম, কিন্তু একথাও ঠিক, পৃথিবীর কোনো প্রান্তে এমন-এমন কোনো সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার সন্ধান পাওয়া কঠিন যার সঙ্গে স্বাধীনতার, আত্মনিয়ন্ত্রণের কোনো দাবি জড়িয়ে নেই। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্ব সম্পর্কে একথা খাটে। এবং তার আঘাত গিয়ে পড়ছে তৃতীয় বিশ্বের বাইরেও। ফলে এখন ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের, কানাডার, যুক্তরাষ্ট্রের এই বিষয়ে বোঝাপড়ার প্রয়োজন হচ্ছে যে, সন্ত্রাসবাদ দমনে পরস্পরের সঙ্গে তাঁরা সহযোগিতা করবে। এবং, তৃতীয় বিশ্বেও পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়ার প্রয়োজন এখন অনুভূত হচ্ছে। ভারত শ্রীলঙ্কাকে কথা দিচ্ছে, যে তামিল উগ্রবাদীদের সে অস্ত্র সরবরাহ করবে না।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিপদ সম্পর্কে একটা চেতনার লক্ষণ যে ক্রমশ দেখা যাচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই চেতনার একটা প্রমাণ, বিমানছিনতাই সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী কঠোরতা। এখন আর ছিনতাইকারীরা আগেকার মতো আশা করতে পারে না, যে তাদের দাবি কোনো দেশের সরকারকে ভয় দেখিয়ে তারা মেনে নিতে বাধ্য করতে পারবে, কিংবা অন্য কোনো দেশে তারা নিরাপদ আশ্রয় পাবে। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া এখন যতদূর এগিয়েছে, বিমানছিনতাই সমস্যার নিরসনে তার সুফল ইতিমধ্যেই টের পাওয়া যাচ্ছে।

এর পরে, আধুনিক বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি যদি সন্ত্রাসবাদীরা কাজে লাগাতে আরম্ভ করে, তার পরিণাম কী হবে, এখন অবশ্য তা কল্পনা করাও কঠিন। এমন-কি, পারমাণবিক অস্ত্রও যে কোনোদিন তাদের হাতে পড়বে না তারই বা নিশ্চয়তা কী ?

ভরসার কথা, এখন পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে নতুন-নতুন পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা দেখা যাচ্ছে না।

আবেদন

রবীন সুর

কুলো থেকে চালঝাড়ার শব্দ হচ্ছে জমাট মগজে।
সারাদিন সারারাত ব্যস্ত ঝিঁ-ঝিঁ, উচ্চিংড়ে ইচ্ছার
বিশাল বাহিনী যেন নেমে পড়ল মাঠে—
যেখানে নৈঃশব্দ্য যত মুছে যাবে নিশ্চিত এবার!

এ যেন অনেক রাতে বাড়ি ফিরে ঘুমন্ত ঘরের
কেউ জেগে নেই। অনুগত সুইচ টিপেও
রমণী-বিদ্যুৎ বাতি নিভে থাকে লোডশেডিঙের
বরফশীতল প্রেম। ভেজা-ভাঙা দেশলাইএর শেষতম কাঠি
যত্নে জেলে মোমবাতির আঁধারবাড়ানো আলোটুকু
দৃশ্যের বৃত্তকে খুব একটা জ্যোতির্ময়
ব্যাসব্যাপ্ত দিগন্তের সীমানায় পৌঁছাতে পারে না।
আত্মপরিচয়হীন, ব্যর্থতার ভবঘুরে
নিজের শরীরখানা দুমড়েমুচড়ে রোগাটে আলোয়
আশপাশের বোবা দেওয়ালে ফ্রেস্কোর ঝাপসায়—
যতটা সম্ভব কদাকার বেঁচে থেকে সহ্য করা যায়।

ঘুমের ট্যাবলেট থাকে নিজমনে রাঙতামোড়া দেহে,
কে তার তোয়াক্কা করে উগ্রমদে? সে কি জানে তরল আগুন
কত খাদ দগ্ধ করে, নিষ্কাশিত সোনাটুকু বাঁচে?
কাকে বলে ঘুমে জাগরণ? স্বপ্নময় দিনের রোদ্দুর?
শীতল রমণী আছে যথাযথ যৌন ব্যাকরণে—
অহল্যা জাগিয়ে লাভ? সে কি জানে শরীরবিহীন
শতসুরতের তৃপ্তি পেতে পারে শুধুমাত্র কবি!
শুধু গুঁফো-লাগা শব্দ, মরা আলো অমনোযোগের
থুথু তার শিল্পে ছিটানোর আগে একটু ভেবো।

হে হৃদয়

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

হে হৃদয়—তোমার গভীরে আমি কোনো-কোনোদিন
নেমে যাই, যখন উদগ্র ঝড় মমতাবিহীন
আমাকে উদ্ব্যস্ত করে—ছিঁড়েখুঁড়ে নখরে-নখরে।
জানি যে, তোমার ভিতে কিছুক্ষণ ঘাসের উপরে
পা ছড়িয়ে সময় কাটালে, পরাভূত দেহ-মন
সান্ত্বনা পাবেই, প্রীত নিমগ্নতা—গভীরগহন।
বড়ো সুখময় স্বপ্ন উপঢৌকন দেব—হে হৃদয়
জানি যে, তখন তুমি—তা মোটেই ভোলবার নয়।

তোমার প্রাকার ঘিরে প্রসারিত কঙ্কালের ধাপ,
ধমনীবাহিত রক্ত পুঁজ শ্লেষ্মা মৃদু উষ্ণতাপ;
আর, নিম্নভূমি নীচে নিরিবিলি নিঃসাড়ে নীরবে
দৃষ্টির আড়ালে সরে তুমি থাক তুরীয় গৌরবে।
হে হৃদয়—কখনো জুড়োতে দাহ আমি এক প্রাণ
নেমে এলে তুমি ঢেলে দাও মেলে সবুজ বাগান।

বশ্যতাস্বীকার

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বয়স বাড়িয়েছে পা, দিগন্তের কিছু আগে
মেঘমাখা দীর্ঘ গাছ, সবুজ এবং নীল
নীলের লীলায় মেশা কিছুটা শূন্যতা
ওই গাছের ওপর নুয়ে থাকে, অন্ধকার
সেখানে দেখায় নক্ষত্রের ইপ্সিতপ্রধান প্রশ্ন
ঐশ্বরিক সেই বর্ণমালা
পাঠের প্রচেষ্টা নিয়ে মানুষ ক্রমশ
বড়ো আর বুড়ো হয়
শেষ হয়ে আসে তার নারী শেখা
ভালোবাসার সময়। এ সবই নিসর্গদৃশ্য
এ সবই বয়স্ক বিশ্ব, ক্রমে শেষ হয়ে আসা
আয়ুর ওপরে সন্তর্পণে নিঃশ্বাসের
চুপ ফিরে আসা—যেন আছি আছি
এখনো তো রয়ে গেছি সূর্যোদয় সূর্যাস্তের
চাক্ষুষ প্রমাণে পরিণামে!

বয়স বাড়িয়েছে পা, পা নয় আসলে তা
শব্দের এগিয়ে চলা শেষ কোনো শিরোধার্য দিকে
যা নাকি পড়ার আগে ভীষণ বিষণ্ণ হয়
আমাদের মেধা, যার জন্য
লাগে না জয়ের যুদ্ধ, সিংহাসন,
বংশপরাম্পরাক্রমের উত্তরাধিকার স্থায়ী,
মৃত্যুই একমাত্র পারে দীন ভিখারিকে
অলীক ধনাঢ্য করে দিতে। শব্দ শরণার্থী
শেষ অস্তরাগে যা কেবল চিনে নিতে জানে,
আমার সমস্ত জানা সমুদ্র পাহাড় নদী
শুষে নিয়ে গেছে
অন্য এক স্থাণু মহাদেশে,
আমি যৎসামান্য কথা বলি, ভাবি,
আমি আজকাল ওইসব প্রামাণ্য প্রীতিকে
বুড়ো করে বয়সে বসাই। পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হলে
অভিলাষ উঠে যায় গাছের ওপরে
সবুজে নীলায় মেশা অবয়বহীন অস্ত শূন্যতায়
চিন্তা, পরিণাম সব শেষ হয়ে থামে।

হয়েছি

শীর্ষেন্দু চক্রবর্তী

ফেরার হয়েছি মহানগরীর ভিড়ে,
কোথায় কখন গুমখুন হল, কবে হয়েছিল?
পুলিশ ফাইলে উঠেছিল ছবি—
সোজা মুখ, আর দুপাশে ফেরানো, গালে কাটা দাগ
কবেকার মুখ
ছবি, ম্লান ছবি, মেলে কি আদল?
সমর ওরফে শেখর ওরফে অমর ওরফে—
মিশে একাকার আসল-নকল;
বহুরূপী বেশে এত ভূমিকায়

মেলাতে পারি না নিজেরই নাম,
বুকের রক্ত-মাংসের থেকে
দূরে সরে যাই, নগরীর ভিড়ে
সকলের চোখে ধুলো দিয়ে ফেরে
আমার ছায়ারা,
কোথায় গভীরে বসে থাকি, যেন অলীক বাবুটি।

জল

সজল দে

নিহিত অনিবার্যতা থেকে একান্ত অসহায়তা নিয়ে নেমে এসেছি এইখানে,
জলের নীচু বুকে ; এখন শুধু জল কেটে-কেটে জল কেটে-কেটে চলা।
অন্বেষণ্য যা-যা ছিল প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ, স্মৃতির এবং বিস্মৃতির
তাকে সম্পূর্ণ খেয়েছে বালুচরের হাঁ ; সোনার মতো যা এখন জ্বলজ্বল
করে সারাদিন, নিঃসঙ্গতা নয়, আপাত অর্থহীনতা ঘিরে থাকে
চারিদিকে আমার ; আর থাকে জলের গভীর কালো সখা,
জলের অজস্র রঙ কত রঙ কী কী রঙ সব জেনে নেব বলে
নেমে এসেছি অকাতরে, সর্বস্ব পণ রেখে এসেছি উঁচু ডাঙায়।
যদিও বুঝতে পারি আগত ঘোর দুঃসময়, তবু নৌকা ফেরাব না।
বিপরীতমুখী হাওয়া দিলে বড়ো জোর নামিয়ে নেব পাল, দাঁড়ের
হাতলে না হয় আরো বেশি দেব চাপ, তবু আর ফেরাফিরি নেই।
এখানে গভীর জল, এখন শুধু জল কেটে-কেটে জল কেটে-কেটে চলা।

যথাস্থানে পৃথিবী

কামাল হোসেন

চারপাশে অস্পষ্ট যান্ত্রিক শব্দের গুঞ্জন। যদিও সুরের মধ্যে ছন্দের পতন কানে বড়ো বাজছে ; সমস্ত শ্রুতি-সৌকর্য অমিলের বেদনায় শুধু যেন একঘেয়ে শোকলিপি পড়ে যাচ্ছে। আর আছে হলুদ আবছায়া রঙের মৃদু প্রবাহ। নিজস্ব চেতনায় নেই কোনো দুঃখের গ্লানি।

আর একবার নিজের শরীর স্পর্শ করে সবকিছু বুঝে নিতে চেষ্টা করলাম। আমি কি মারা গেছি? নইলে মৃদু আলোর পাশাপাশি লম্বিত ছায়ার দোলায়মান নৃত্য কেন? মৃত্যুর প্রহরীরা কি এত তাড়াতাড়ি আমাকে নিতে চলে এল? অসহায়ভাবে চারপাশ ছুঁয়ে দেখতে গিয়ে কোনো পার্থিব পদার্থ খুঁজে পেলাম না। আধো অন্ধকার। আবছা হলুদ আলো। এবং ছায়াঘেরা পরিবেশ। শরীর যেন শূন্যে ভাসমান। নীচে এবং ওপরে সব কিছুই স্পর্শের বাইরে। সেই সঙ্গে ধাতব শৃঙ্খলের আশ্চর্য যন্ত্রণা। ঝন-ঝন-ঝনন ঝন—সেই দৈত্য বুঝি এখনো জীবিত আছে! আঃ, প্রাণ বাঁচানো কি তবে হবে না!

একটু জল—তৃষ্ণার তৃপ্তি এখন প্রধান সমস্যা—বুকের ওপরে হাত রাখলাম। না এ মর্তলোক ছেড়ে বোধহয় আমার যাওয়া হয় নি—ধুকধুক বুকের স্পন্দন বেশ সজীব। ক্রমে বাস্তব সম্পর্কে সচেতন হলাম। এতক্ষণ বোধহয় খুব একটা খারাপ স্বপ্ন দেখছিলাম। হ্যাঁ, বড়ো খারাপ স্বপ্ন...আমি আর ঋতু বুঝি আমাদের গন্তব্য সেই বড়ো শহরে পৌঁছে গেছি—চারদিক কী সুন্দর আলোঝলমলে—কী উজ্জ্বল! অথচ স্টেশনে পা দেওয়া মাত্র হঠাৎ যেন সব আলো নিভে গেল—নিকষ অন্ধকার। লোড-শেডিঙ কিনা বুঝতে পারলাম না। সেই শহরে প্রবেশ করে অন্ধকার ঠেলে আমি আর ঋতু দু-পা হাঁটতেই চারপাশে চলমান গাড়ির বিচিত্র শব্দ কান ঝালাপালা করে দিল। সেইসব যান্ত্রিক আক্রোশ অন্ধকারের রহস্যময়তায় মিলে মিশে এক বীভৎস বিপর্যয়কর পরিবেশ সৃষ্টি করল। আমরা পরস্পরকে স্পর্শ করে ওদের মধ্যে দিয়ে চলতে শুরু করলাম। তারপর শুধু অন্ধকার এবং ছুটে-যাওয়া মোটর-বাস-লরির শব্দ। সকলেই যেন আমাদের পিছু তাড়া করে ফিরছে। আমরা ক্রমাগত ছুটছি। সামনে অন্ধকার। ছুটতে-ছুটতে এক পাঁচমাথা রাস্তার মোড়ে পৌঁছে ট্রাফিক পুলিশের খোঁজ করব কিনা ভাবছি—এমন সময় বুঝতে পারলাম, পাঁচ দিক থেকে সেই ক্রুদ্ধ

যান্ত্রিক সরীসৃপেরা আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে। অনচ্ছ অন্ধকারে মোড়ের মাঝখানে গতিনির্দেশক প্রহরীর অস্পষ্ট অস্তিত্ব বুঝতে পেরে সাহায্য প্রার্থনা করলাম। ট্রাফিক পুলিশের শাদাটে ধোঁয়ার মতো মূর্তি মমি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। দুদিকে তার দুটি হাত বিচিত্র মুদ্রায় প্রস্তরীভূত। এইসব ভুতুড়ে আবহাওয়ায় ভয় পেয়ে ঋতু চিৎকার করল...এখনো আমার কপালে ফোঁটা-ফোঁটা স্বেদবিন্দু উত্তেজনায় টলটল করছে। আধশোয়া অবস্থায় পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালটা মুছে ফেললাম।

উঠে দাঁড়িয়ে বাঙ্কে তুলে রাখা ওয়াটার বটলটা থেকে খানিকটা জল খেলাম। এবার যেন একটু স্বস্তি। স্বপ্ন কি শুধুমাত্র অবচেতনে আশ্রিত অতীতের ভয়-ভাবনার জীবন্ত রূপ? কিছুক্ষণ আগের আধাজীবন্ত বিভীষিকার সবকিছু ভুলে যেতে ইচ্ছে হল আমার। আপাতত চারপাশে বর্তমান পরিবেশ বেশ স্পষ্ট—আমি ঋতু এই চলন্ত রেলগাড়ির কামরায় শুয়ে চলেছি সেই বড়ো শহরের উদ্দেশে।

হঠাৎ রেলগাড়ির সচল ইনজিনের ধাতব উচ্ছ্বাস মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হল। জানলাটা তুলে স্টেশনের নামটা দেখবার চেষ্টা করলাম। ছোটোমতো কোনো গ্রামের প্রবেশপথ। স্টেশন-মাস্টারের ঘরে মিটমিটে আলো জ্বলছে। বিদ্যুৎ এদিকে আসে নি। কিংবা হয়তো অন্য কারণে আলোর প্রবাহ এখন ব্যাহত। আকাশে গুটিকয়েক তারা। চাঁদের চিহ্ন নেই। কৃষ্ণপক্ষ বোধহয়। স্টেশনের গা-ঘেঁষে একটি অশথ অথবা কোনো ঝাঁকড়া গাছের অশরীরী অবস্থিতি। প্লাটফরমে তেমন লোকজনের চলাফেরা চোখে পড়ল না।

রেলগাড়ি আবার চলতে শুরু করল। জানলা বেয়ে একঝলক ঠান্ডা বাতাস চোখে মুখে এসে লাগল। শীত আসতে আর বেশি দেরি নেই বোধহয়।

এখন মধ্যরাত্রি। ওই কামরায় আমরা দুজন বাদে আর একজন আছে। গ্রামের মাঝবয়স্কা এক কৃষকরমণী। এখনো শরীরে যৌবনের শেষ অবশিষ্ট মোটেই অনুজ্জ্বল নয়। চাষীদের মেয়েটি খুবই গরিব, তার সংকোচহীন বেশবাশে তা স্পষ্ট। কী রকম কুকুরের মতো গোটানো অবস্থায় ওদিকে বেনচে শুয়ে আছে। ও নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছে—হয়তো ওর স্বামীর কিংবা অন্য কারোর অথবা কিছু ভালো ফসলের।

ঋতুর দিকে আমার চোখ পড়ল। কেমন সুন্দর নিশ্চিন্তে ঘুমন্ত ; অনেকটা স্থিরচিত্রের মতো। আমার মনের ভিতরে কেমন যেন মায়া হল। আস্তে-আস্তে ওর কাছে গেলাম। চাদরটা ভালো করে শরীরে জড়িয়ে দিতেই আমার হাতের স্পর্শে ও চোখ মেলল।

মৃদু কণ্ঠে বললাম—তোমার ঠান্ডা লাগতে পারে, তাই...

ঈষৎ ঘুমে আচ্ছন্ন আমার কণ্ঠস্বর শুনে ও হেসে ফেলল। অপ্রস্তুতভাবে আমার মুখেও হাসি এল। রেলগাড়ির সদর্প গর্জনধ্বনি শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলল।

আমার দিকে সন্দেহের দৃষ্টি তাকিয়ে ঋতু বলল—তুমি ঘুমোও নি?

—ঘুমিয়ে ছিলাম তো? এখুনি ঘুম ভেঙে গেল।

—তুমি ঘুমাবে না? অল্প একটু হাই তুলে আমার দিকে তাকাল।

ঘুমের আলস্যে সামান্য ফোলা-ফোলা চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে বুঝতে পারলাম—ও এখন আস্তে-আস্তে বড়িয়ে যাচ্ছে। নাক আর ঠোঁটের পাশ জুড়ে স্পষ্ট রেখায় বিচ্ছিন্ন চিহ্ন। কপালে শুকনো মলিনতা।

—কী দেখছ এত হাঁ করে?

—দেখছি, মানে তোমাকে—তুমি...তুমি...

—এতদিন দেখেও শখ মেটে নি? নিজস্ব কৌতুকে ও হাসল।

আমি সপ্রতিভভাবে বলে ফেললাম—কেন, আমার রানীকে আমি দেখব—এতে কার কী বলার আছে?

অনেক দিনের চেনা কণ্ঠস্বর যেন আমার গলায় বেজে উঠল। নিজের সংলাপে নিজেই চমকে গেলাম। পক্ষমুক্ত পালক বহুদিন পর খুঁজে পাওয়া এত বেদনাদায়ক। এবং নিষ্ঠুর।

ঋতু কিছুক্ষণের জন্য আনমনা হল। তারপর আবার নিজস্ব স্বরধ্বনি ফিরে পেয়ে বলল—তখন তুমি কেমন ছেলেমানুষ ছিলে না? মায়ের কাছে সকাল-বিকেল গল্প করতে। আমদের বাড়িটাই তো ছিল তোমার আড্ডা!

আমি যেন কতদিন আগে হারিয়ে-যাওয়া চাবিটা খুঁজে পেলাম। এখনই সিন্দুক খুললেই হয়তো বেরিয়ে পড়বে প্রথম রজনীগন্ধার সুবাস। আঃ, কত সব সুখ-

দুঃখের গন্ধমাখা মোহর স্বার্থপর যক্ষের মতো জমা করে রেখেছি এই সিন্দুকে।

তখন বোধহয় সেই শহরটাতে আমরা প্রথম এসেছি। ঋতুর মার সঙ্গে আমার হঠাৎ পরিচয় হয়ে গেছল। রেলগাড়িতে একই কামরায় ভদ্রমহিলা আসছিলেন। কেন মনে নেই—ট্রেনে সেদিন প্রচণ্ড রকম ভিড় হয়েছিল। ভদ্রমহিলার সঙ্গে কোনো পুরুষ সঙ্গী ছিল না। পরে শুনেছিলাম কাছাকাছি কোনো এক স্টেশন থেকে আসছিলেন বলে আর কাউকে সঙ্গে নেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। ট্রেন স্টেশনে পৌঁছাতেই লোকজনের চাপের ঠেলায় ভদ্রমহিলা পেছনে পড়ে গেলেন। সেই ভয়ানক ভিড়ের ব্যস্ততায় বিপর্যস্ত প্রৌঢ়াকে আমার সতেরো বছরের বলিষ্ঠতা কিছু সাহায্য করেছিল। ফল—ওঁদের বাড়ির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা। বাড়ির সকলেই আমাকে দারুণ ভালবাসতেন। উৎসবে-পার্বণে—বলতে গেলে সকল অনুষ্ঠানেই ছিল আমার স্বচ্ছন্দ গতি।

—বেশ ঠান্ডা লাগছে—সুটকেশ খুলে কোটটা পরে নাও। ঋতু বলল।

ওর দুর্ভাবনাকে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে বললাম—থাক গে—কিছু হবে না।

—ভালো মন্দ আমি বুঝব। মনে রেখো তোমার জন্য আমি সবকিছু ছেড়ে চলে এসেছি।

ঋতুর কথাগুলো ধারালো ছুরির মতো আমার চোখে মুখে এসে যেন আঘাত করল। প্রচণ্ড বেদনায় বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল। কমপার্টমেনটের সিলিং-এ লাগানো ছোটো বালবের অস্পষ্ট হলুদ আলোর খণ্ড ওর মুখের একপাশে এসে পড়েছে। মৃদু অথচ বড়ো সংযমী সেই আলো। ফিকে সবুজ রঙের শাড়ির আঁচল ওর কাঁধের উপর থেকে পড়েছে। মুখের উপর কয়েক গাছি অলকচূর্ণ। আমি যেন অনেক দূরে দাঁড়িয়ে। ক্রমাগত চেষ্টাতেও ওকে ছুঁতে পারছি না।

বস্তুত তখন আমি ঋতুকে আদৌ কিছু ভাবতাম। সে সময় ও কেমন যেন আলাদা ধরনের ছিল। ওর কত ছেলে-বন্ধু ছিল। তাদের সঙ্গে দিব্যি ঘুরে বেড়াত—উচ্ছলভাবে গল্প করত—সিনেমা যেত—চিঠিপত্তরের আদান-প্রদান করত। মফসসল শহরে কোনোকিছুর আবরু রাখা কঠিন। বিশেষ করে উঠতি-বয়সী ছেলেমেয়েদের এরকম মেলামেশা কেউ অন্তর থেকে সমর্থন করতে পারত না। সে সময় প্রথম দিকে ঋতু সম্পর্কে তাই তেমন ভালো ধারণা না থাকলেও নিতান্ত উপেক্ষা ভিন্ন কিছুই অনু ভূতি আমার ছিল না।

সুটকেশ থেকে গরম কোট বার করে গায়ে পরে ঋতুর তৃপ্তিভরা মুখের দিকে তাকালাম। ঠোঁটের মধ্যে হেসে ও বলল—নাক টেনে দেব নাকি?

হালকাভাবে আমি হাসলাম। বুকের ভিতরে অজস্র ঢেউয়ের দোলা। তখন আমার শরীরে শেষ কৈশোরের অপরিণামদর্শী উত্তেজনার প্রবাহ। আঠারো বছরের সেই নম্র ছেলেটি একটি সদ্য-যুবতীকে প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদি প্রকাশের কথা স্বপ্নেও ভাবতে সাহস পেত না।

একদিন বিকেলে ওদের বাড়িতে ঋতু ছাড়া কেউ নেই। ওর দাদার কোনো বন্ধুর বাড়ি সকলে বেড়াতে গেছে।

সমস্ত বিকেল ওর সঙ্গে গল্প হল। এরকম নিভৃতে একাকী কোনো সমবয়স্কা মেয়ের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ কথা বলার সুযোগ এর আগে পাই নি। সেদিনই প্রথম ঋতুকে অত কাছ থেকে দেখলাম—শ্যামল বর্ণের চমৎকার একটি তরুণী। তার উচ্ছল হাসির ছায়ায় সম্মোহিত হয়ে গেলাম।

তারপর পর-পর বেশ কদিন ওর সঙ্গে গল্প হয়েছিল। শাদামাটা অনেক কিছু। আমার সদ্য-পরিবর্তিত শরীর তখন কিছু নতুন জিনিস অনুভবের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল। এক অপরিসীম আত্মিক যন্ত্রণায় ছটফট করতে-করতে বার-বার ওর কাছে স্পষ্ট হবার চেষ্টা করেছি। প্রথম দিকে আমার অপটু চোখে ওর কোনো মানসিক পরিবর্তন ধরা পড়ে নি। অবশেষে এক সুন্দর অপরাহ্নে পরস্পরের মনের দরজায় এগিয়ে গেছলাম। অনেক বন্ধুদের ছেড়ে আমার মতো মুখচোরা যুবকের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল ঋতু।

কিন্তু আমাদের বিয়ের কুড়ি বছর পর ওসব পুরোনো কথা ভাবছি কেন? আমার হাসি পেল। ঋতুর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করি, এতদিন ধরে ও কি সত্যি সুখী হয়েছে?

কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পর পাশের শহরে একটা মাস্টারি জোগাড় করে ওর সঙ্গে রেজিস্ট্রি করে নিলাম। এধরনের পরিচয়মূলক বিয়ে—যা নিতান্তই প্রেমঘটিত,

দুজনের বাড়িতেই কেউ মেনে নেয় নি। যথেষ্ট অপমান মাথায় নিয়ে নিজের শহর ছেড়ে চলে এসেছিলাম। তারপর কুড়িটা বছর...

—সুমন্ত ঠিক দশ বারো দিনের মধ্যে ফিরবে তো?

—আসা তো উচিত। যা হুজুগে হয়েছে আজকাল।

এরকম অবস্থায় ওকে কেমন যেন সেকেলে মনে হয়। বিরক্তিতে ঋতুর কপালে দাগ পড়ে গেল।

সুমন্ত আমাদের একমাত্র সন্তান। ষোলো বছরের সুন্দর কিশোর। আমরা দুজনে ওর জন্ম থেকে কত কিছু স্বপ্ন দেখি। ওর কথা চিন্তা করলে আমাদের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ক্লান্তি আশ্চর্যভাবে মন থেকে উবে যায়।

ধরতে গেলে আমাদের কোনো আত্মীয় এতটুকু যোগাযোগ রাখে নি। এদিকে ওদিকে কখনো এক-আধজন চেনা-জানার দেখা পেলে আমরাই এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। ঘটনাচক্রে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলে তারা অবাক হয়ে বলে—তোমরা বেঁচে আছ? শুনেছিলাম কী একটা দুর্ঘটনায় তোমরা নাকি মারা গেছ...

ঋতুর দু-একটা চুলে পাক ধরে গেছে। আমার মাথা-জোড়া চকচকে টাক। সময় ক্রমশ আমাদের কুরে-কুরে খেয়ে নিচ্ছে। সেদিনের ঘর ছেড়ে আসা যেন অতীতের উত্তরাধিকারসূত্রে কেবল কিছু কৌতুকের খোরাক যোগায়।

সুমন্ত আস্তে-আস্তে বড়ো হচ্ছে। আমি একটা মাস্টারি আর গোটা কয়েক টিউশনি নিয়ে জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত। আর ঋতু সব সময় তার অপার্থিব শরীরের সংগোপন স্পর্শে আমাদের যত কিছু দুঃখবেদনার নিরাময়ে সাহায্য করে।

আসলে ঋতুকে পার্থিব কোনো নারী ভাবতে আমার খুব দ্বিধা হয়। সে যেন এসেছে কোনো ছায়াপথের অনির্দিষ্ট নক্ষত্র থেকে, জাগতিক সবকিছু যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেবার জন্য সে আমার নিত্যসহচরী। এরকম ভাবনা আমার রিক্ত অবসাদগ্রস্ত খুঁড়িয়ে-চলা জীবনে একটু যেন তৃপ্তির অনুভূতি এনে দেয়।

এমনি করে কাটছে দিন। সুমন্ত বড়ো হচ্ছে। আমরা চেয়ে-চেয়ে দেখছি। আনন্দে বুক ভরে উঠছে। আমাদের ছোট্ট দুঃখের সংসারে পারিজাত ফোটানোর স্বপ্নে আমরা বিভোর।

—হ্যাঁগো, আমরা কি ভোরের মধ্যেই পৌঁছে যাব?

—কী জানি, তাই তো মনে হয়। আমার মাথার কেশবিহীন টাকে হাত ছোঁয়াতেই হাসি পেল। সত্যি টাকসমেত আমিও যেন কবে একেবারে একজন ভারিক্কি ভদ্রলোক হয়ে গেছি।

এবার ছুটিতে স্কুলের কিছু ছেলের সঙ্গে সুমন্ত দার্জিলিঙ গেছে। ও চলে যাবার পরদিন দুপুরে সমস্ত বাড়ি-ঘর কেমন যেন নিঃশব্দ মনে হল।

ঋতুর অনেক দিনের বায়না সেই বড়ো শহরটায় একবার বেড়িয়ে আসে। সময় এবং সুযোগ দুটোরই অভাব সবকিছু বাসনা থেকে বহুদিন আমাদের সরিয়ে রেখেছে।

এবার ও ছাড়ল না। জোর করে আমাকে রাজি করাল আপাতত কদিনের জন্য টিউশনির একঘেয়েমি শিকেয় তুলে রাখতে।

—এই, সেই শহরে এখন কী যেন একটা বড়ো মেলা হচ্ছে, কাগজে পড়লাম।

—হ্যাঁ, কীসব বাণিজ্যমেলার ধুমধাম। মন্ত্রী-টন্ত্রী সব আসছে যাচ্ছে।

—কী মজা, তাই না...হাততালি দিয়ে ছেলেমানুষের মতো শরীরটা দোলালো ঋতু।

ঋতুর এই সোচ্চার উৎসাহে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। হয়তো ওর এই উচ্ছ্বাস ওপাশে চাষি মেয়েটির নিশ্চিন্ত শুয়ে থাকতে কিছু ব্যাঘাত করতে পারে।

আমার অস্বস্তিকে আরো গভীরতর করতেই যেন ও বেশ গুছিয়ে বসে ছোট্ট মেয়েদের মতো মুখ করে মাথা নেড়ে বলে চলল—ইস, ওখানে নাগরদোলা চড়েছিলাম কেষ্টপুরের মেলায়। ওঃ, মাত্তর চার পয়সা—আর বন—বন—বন—

আমি যেন স্পষ্ট দেখছি বড়ো-বড়ো ঝকঝকে রঙচঙে ইসপাতের স্বয়ংক্রিয় নাগরদোলায় পরম নিশ্চিন্তে ঋতু বসে আছে। ক্রমাগত বনবন করে ঘুরে যাচ্ছে—ঋতু একবার উপরে—একবার নীচে—কখনো বালিকা—কখনো কিশোরী—কখনো লাস্যময়ী যুবতী—কখনো বা ঠিক এখনকার ঋতু হাত নেড়ে আমাকে ডাকছে—তারপর সব কটি মুখ একসঙ্গে প্রচণ্ডভাবে হাসতে শুরু করল, আমি বুঝে পেলাম না ঠিক কোন্ ঋতু আমার।

—কী হল, কথা বলছ না যে, এই শোনো—সেবার না,

মেজমামার বড়ো মেয়েটা নাগরদোলায় উঠে ভয়ে অতখানি ধিঙ্গী মেয়ে আমাকে জাপটে ধরেছিল। উঃ মাগো, কী ন্যাকামো...বড্ড ঠাট ছিল মেয়েটার...

জানালার টুকরো অংশের মধ্যে দিয়ে কখনো দূর থেকে ছোটো-ছোটো আলোর বিন্দু ভেসে আসছে। আর বাদবাকি যা কিছু সব অন্ধকার। কেবল এই ভিতরকার আবছায়া আলোয় ভরা চলন্ত কক্ষ ছাড়া। শব্দ আর শব্দ আর গতির অনুভূতি। আমি ঋতু আমাদের কুড়ি বছরের বিবাহিত জীবনে এই প্রথম শুধুমাত্র দুজনে মিলে নির্ভেজাল ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয়েছি।

ঝরনার জল পেরিয়ে আলগোছে ভেসে যাওয়া ছোটো নুড়ি কুড়াবার লোভে ঋতুর সমস্ত শরীর নতুনভাবে দেখলাম। ওর ঘাড়ের কাছে এখন সামান্য চর্বি জমেছে। বয়সের জন্য বোধহয়। কথা বললে থুতনিটা আগের মতো ততটা নড়ে না। চলাফেরার সঙ্গে কথাবার্তাতেও যেন একটু মন্থর হয়ে পড়েছে। হয়তো ওর চোখে আমারও এরকম অনেক কিছু পরিবর্তন ধরা পড়ে।

মাঝে-মাঝে স্টেশনগুলিতে গাড়ি থামছে। মুহূর্তের জন্য হঠাৎ স্তব্ধতার মাঝে কত দূরে কোনো গ্রাম্য গায়কের এক-মনে-গাওয়া অমার্জিত মেঠো সুরের রেশ ভেসে আসছে। শেষ রাতের শীতল আবহাওয়ায় স্বল্প লোকের চলাফেরা। প্ল্যাটফরমের বিছানো অংশনে চাষাভুষো লোকেরা গায়ে মোটা কাঁথা বা ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে টিমটিমে অল্প আলোয় ভাতে মতো ঘুমিয়ে আছে।

শীতটা সত্যি ক্রমশ বাড়ছে মনে হয়। ঘুমের মধ্যে চাষি মেয়েটি ভালো করে গায়ের কাপড় গুটিয়ে নিল। বেশ বোঝা যাচ্ছে ওর শরীরে ওই বহুব্যবহৃত পাতলা ময়লা শাড়িটা ছাড়া ভিতরে নেই কোনো অন্তর্বাস। অথচ কী সাবলীল শয়নভঙ্গি।

অনর্গল কথা বলে চলেছে ঋতু। শরীরটা বার-বার ঘুরিয়েফিরিয়ে ওর ছোটোবেলার কথা শোনাতে চাচ্ছে। শৈশবকাল প্রত্যেক মানুষেরই কাছে চিরকালীন বিশ্বস্ততার প্রতীক। সবকিছু পবিত্রতা মিলেমিশে থাকে শৈশবের খণ্ড-খণ্ড স্মৃতির পাতায়।

কেমন যেন বিরক্তির মনোভাব আমার সমস্ত অনুভূতি ছুঁয়ে গেল। আমরা কি ক্রমশ একঘেয়েমির আশ্রয় নিচ্ছি না? এসব ছেলেমানুষির গল্প এই বিশ বছরে কতবার কতভাবে ঋতুর মুখে শুনেছি। তবু কেন এই কচকচানি!

আসলে কুড়িটা বছরের প্রাত্যহিকতায় পরিবর্তন ঘটিয়ে আজ আমরা সম্পূর্ণ একটি নতুন দিনের মধ্যে দিয়ে চলেছি। আজকের পরিবেশ, আজকের আবহাওয়া সবকিছু আমাদের অন্যান্য দিনগুলির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আর কিছুক্ষণ পরেই আমরা পৌঁছে যাব আমাদের গন্তব্য সেই বড়ো শহরে, পৃথিবীর লোকজন যেখানে হাজার রকম পছন্দমতো সৌভাগ্য কেনাকাটা করতে আসে।

এতদিন ধরে আমরা তো এই দিনটিরই স্বপ্ন দেখেছি। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে কেবল অঙ্কের সংস্থান এবং পতঙ্গের মতো দিনযাপন—এ সবই তো জীবনের একমাত্র অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সবকিছু সুখের প্রতীক সুমন্তর ভালোমন্দ চিন্তা করেই আমাদের বয়সের এতটা অংশ খরচ করে ফেলেছি। এ খরচে দুঃখ নেই, আমাদের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা শরীরে ধরে বেঁচে থাক সুমন্ত ভবিষ্যতের সুখের প্রাসাদে।

সুমন্তকে একা ফেলে রেখে আমরা দুজনে কোথাও আনন্দ অবসর কাটাতে যাব—এ বিশ বছরে একবারও সেরকম ঘটে নি। তবু যখন হঠাৎ এই সুযোগ পাওয়া গেছে—কী দরকার এই অপরিচিত আবহাওয়ায় সেই পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটবার। চব্বিশ ঘণ্টা সহস্র ক্রিয়া-কলাপের ফাঁকে-ফাঁকে যা শুনে-শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। চিরাচরিত অভ্যাসগুলি কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যেতেই তো এই প্রমোদভ্রমণ।

কোনো কিছু না বুঝে তাকিয়ে থাকার মতো অনেকক্ষণ ঋতুকে লক্ষ্য করতে-করতে হঠাৎ মনে হল ওর বুকের কিনারা ঘেঁষে একটা বাদামি তিল আছে, এতদিন চোখেই পড়ে নি। আমাদের চোখের সামনের কত নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুও অনেক দিন পর এভাবে হয়তো নতুনভাবে আবিষ্কার করে ফেলি।

ঝলকে-ঝলকে ঠান্ডা বাতাস ভিতরে আসছে—উঠে গিয়ে জানালার সার্সি নামিয়ে দিলাম। গোটা রেলওয়ে কমপার্টমেন্ট যেন একটি অর্গলবদ্ধ রথের মতো মনে হল। এই রথে চেপে আমরা চলেছি স্বর্গীয় কোনো-কিছু অমূল্য সম্পদের সন্ধানে।

জানলার কাচের মধ্য দিয়ে বাইরের পৃথিবী আরো

রহস্যময় মনে হল। ঠিক যেন আমাদের হৃদয়ের মতো। সব কিছু প্রশ্ন এবং উত্তর এই মানসকেন্দ্রে স্থিত।

একভাবে ছোটোবেলার গল্প বলে যাচ্ছে ঋতু...কবে নাকি একদিন ওর বড়দার হাত থেকে লাটাই নিয়ে একটা লাল ঘুড়ি উড়িয়েছিল। বাতাসে কেঁপে-কেঁপে সুতো-সমেত সেই ঘুড়িটা অনেক উঁচুতে উড়ে গেছিল...তারপর কোত্থেকে অন্য একটা ঘুড়ি এসে তার ঘুড়িটা কেটে দিয়েছিল।

ঋতুকে বড়ো বেশি পরিতৃপ্ত মনে হচ্ছে। নিজেদের সেই বহু চেনা শহর ছেড়ে আমরা যখন অন্য শহরে এসে ঠাঁই নিলাম, তখনও অনেক দুঃখকষ্টের মধ্যে ওকে এরকম তৃপ্ত মনে হত। অল্প টাকার ভাড়াবাড়ির অজস্র প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে সারাটা শরীর জুড়ে এরকম তৃপ্তির হিল্লোল বইয়ে রাখত।

খুব গভীর কোনো বিশ্বাস হঠাৎ খণ্ড-খণ্ড হয়ে ভেঙে গিয়ে পাশাপাশি দাঁড়ালে, কিংবা ত্রিশিরা কাচের শরীর বেয়ে ভেঙে-যাওয়া আলোর বর্ণালীকে পরদায় লক্ষ করলে যেমন দেখায়—মাঝে-মাঝে কোনো কারণে ঋতুর বিষণ্ণ মুখ দেখলে সেরকমই আমার মনে হয়।

ঋতুর সঙ্গে বিয়ে হবার পর আমার মা বাবা ভাই বোন সকলের কাছ থেকে দূরে চলে এসেছি। কখনো কোনো অসংলগ্ন মুহূর্তে বুকের ভিতর কী রকম কষ্টের অনুভূতি হয়। হঠাৎ কোনো পাখশু আকাশের দিকে তাকালে মনে পড়ে যায়—আমারও ছিল একটি হিরণ্ময় সকাল, যে সকালের শুভ্র আলোয় শিশিরভেজা ঘাসের উপর কত ছোটাছুটি করেছি। চড়কের মেলায় বাবার হাত ধরে চিনেবাদাম ছোলাভাজা চানাচুর কিনেছি। এসব কিছুই ছিল খুব সুন্দর অথচ এখন আমি আমার সমস্ত অতীত ভুলে যেতে চাই—আমি স্মৃতি খুঁড়ে আবিষ্কার করতে চাই না আমার কোনো শৈশব ছিল ; এক সহস্র-জিজ্ঞাসাউপরুদ্ধ কৈশোর, যে মুহূর্তগুলিতে কোনো উজ্জ্বল কিশোরী দেখলে হঠাৎ চমকে উঠতাম—সেইসব দিনগুলি রাতগুলি। এখন আমার কাছে জীবন মানে ঋতু, আমার ভবিষ্যৎ মানে সুমন্ত।

—আচ্ছা, সুমন্ত কোনোদিন প্রশ্ন করে না—আমি তুমি—দুজন কোথা থেকে এসেছি?

—মানে? ভুরু কুঁচকে ও প্রশ্নটা বোঝবার চেষ্টা করল।

—মানে আমাদের পিতৃপরিচয় মাতৃপরিচয় কিংবা আদিনিবাস—এসব কিছুই তো সে জানে না। আমাদের বাড়িতে কোনোদিন কোনো আত্মীয়কে আসতে দেখে নি।...হয়তো এখন সে এসব ব্যাপারে নিরুৎসুক, অথচ একদিন তার মনের সমস্ত দুর্বলতা পরিণত হয়ে সবল হয়ে উঠবে। তখন ওর প্রশ্নের জবাবে কীভাবে আমরা বলব আমাদের পূর্বপুরুষদের পরিচয় ; এবং কেন আমরা চোরের মতো মুখ লুকিয়ে কুড়িটা বছর তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন? এত দিন ধরে যেসব ছেলেমানুষি গল্প তাকে শুনিয়েছি, আর কি সে বিশ্বাস করবে?

—সেসব কথা ভেবে এখন কী লাভ?

—ঠিক বলেছ। এসব প্রশ্ন এখন মনে আনা বড়ো বেমানান। আসলে আমরা তো একটু বেড়াতে যাচ্ছি, বিদেশে যেমন শ্রমজীবী মানুষেরা একটু আমোদের জন্য উইক-এনডে যায়। কিন্তু ঠিকভাবে মনকে বুঝিয়ে দেখো, আমাদের সব কথার ফাঁকে-ফাঁকে কেমন করে যেন আমাদের ফেলে-আসা অতীত বারবার উঁকি দিয়ে যাচ্ছে।

অদ্ভুত ঘোরলাগা চোখে ও তাকাল।

—বছর পাঁচ-ছয় আগে আমাদের ওখানে বাজারে একদিন রমেনকে দেখেছিলাম।

—কই, তখন কিছু তো বল নি? হিসহিস করে ঋতু বলল।

—আচ্ছা, রমেনের সাথে তুমি তো কত বায়োস্কোপ দেখেছ, নদীর ধারে বেড়িয়েছ...

—তখন ওসব ভালো লাগত...। সাপের মতো তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ও ফুঁসে উঠল।

—সত্যি, তোমরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে তোমাদের পেছনের দরজায় দাঁড়িয়ে কত গাল-গল্প করতে...

—কী দরকার এখন ওসব পুরোনো কথা টেনে আনার...

—আলবত দরকার আছে...। চিৎকার করে উঠলাম আমি। ভুলে গেলাম এই শীত-শীত আবহাওয়ায় একটু উত্তাপের স্বপ্ন দেখতে-দেখতে ছিন্ন অপরিষ্কার কাপড় জড়ানো একটি চাষি মেয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে—আমার অভদ্রজনোচিত শব্দের হুংকারে তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। ভয়ংকর অসুরের মতো চোখ দুটো বড়ো করে ওর দিকে তাকালাম।

—ওভাবে তাকাচ্ছ কেন? আমার কেমন ভয় করছে।

কুড়ি বছরের দাম্পত্য জীবনে ওর চোখের তারায় এই প্রথম ভয়ের ছায়া দেখলাম। মুখ ফিরিয়ে বাঙ্কের দিকে তাকালাম। আমাদের একটি সুটকেশ আর জল রাখার পাত্র সেখানে সযত্নে রক্ষিত আছে। হলুদ আলোর উজ্জ্বলতা যেন আরো কমে এসেছে। অন্ধকার ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। ঘসা কাচের আস্তরণের বাইরে ছুটে চলেছে কিছু পদার্থ, সেগুলি জাগতিক—এরকম মনে করার মতো কোনো বিশ্বাস খুঁজে পেলাম না।

অস্পষ্ট বোবা শব্দধ্বনি অনুসরণ করে দেখলাম দুহাতে মুখ ঢেকে ঋতু কাঁদছে। সমস্ত দেহ ফুলে-ফুলে কেঁপে উঠছে। তার ঘাড়, গলা, আঙুল মুহূর্তের জন্য সবকিছু অসম্ভব মায়াবী মনে হল। মাথায় চুলের উপরে কোথা থেকে একটি শাসনহীন পোকা উড়ে এসে বসেছে।

চকিতে ওপাশে চেয়ে দেখলাম সেই কৃষক-রমণী অদৃশ্য। হয়তো আগের কোনো স্টেশনে নেমে গেছে—আমরা এতক্ষণ খেয়াল করি নি। হঠাৎ নিজেকে খুব ছোটো মনে হল। অপরাধ স্খালনের ইচ্ছায় পরম আদরে ঋতুকে আকর্ষণ করলাম।

তারপর বুকের কাছে টেনে চোখের জল মুছিয়ে আবার কেন জানি না সেই পুরোনো যন্ত্রণাবিদ্ধ ক্ষতটাকে স্পর্শ করলাম—সত্যি করে বলো তো ঋতু, আমার কাছে কুড়িটা বছরে তুমি এতটুকু সুখের স্বাদ পেয়েছ কিনা... কিংবা বাস্তবিকই তুমি কোনোদিন আমাকে ভালোবাসতে পেরেছিলে কিনা...আমি বেশ বুঝতে পারছি তুমি এখন আমাকে ঘৃণা করছ, ঋতু।

ঋতুর উত্তর শোনা হল না। দরজায় ছন্দহীন অনেক শব্দের সমাবেশ ; সেই আবছায়া আবহাওয়ায় আমরা যেন মধ্যযুগে পৌঁছে গেলাম। একদল সশস্ত্র তরুণ—বিচিত্র পোশাক, হাতে ছুরি বন্দুক পাইপগান...

ঋতু আতঙ্কে আমার বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল।

অদ্ভুত মাস্তানি উচ্চারণে সেই আগন্তুকদের একজন জলদস্যুদের মতো আমাদের কাছে যা-কিছু আছে দিয়ে দিতে আদেশ করল।

কম্পিত হস্তে কাপুরুষদের মতো তাদের হাতে আমাদের সমস্ত-কিছু-সম্পদ-ভরা তোরঙ্গ, জলের আধার তুলে দিলাম। সব শব্দ থেমে গিয়ে রেলগাড়ি একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সেই দস্যুরা অস্ত্র শানিয়ে কসাইয়ের মতো আমাদের দিকে এগিয়ে এল। হঠাৎ প্রাণের ভয়ে ঋতুর হাত ধরে টানতে-টানতে সেই থেমেথাকা স্টেশনে দুজনে নেমে পড়লাম। আমরা সেই বড়ো শহরে যাব বলে বেরিয়েছি, এই এঁদো অখ্যাত স্টেশনে নেমে এখন কী করব, কিংবা ওদের কী অধিকার আছে আমাদের সমস্ত সম্পদ এভাবে বিনা প্রতিবাদে লুণ্ঠিত করে নেবার—এরকম অনেক প্রশ্নই গলার কাছে আটকে থাকল।

সুবোধ বালক-বালিকার মতো আমরা সেই অচেনা স্টেশনে নেমে মুখের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। সামনে দিয়ে ঝকঝক করে ট্রেনটা চলে গেল।

তারপর শুধু অন্ধকার। ট্রেনের জানালার কাঁচের মধ্য দিয়ে এতক্ষণ লক্ষ করিনি মাথার উপরে ছাতাধরা আকাশের চাঁদোয়ায় কখন নক্ষত্ররা অদৃশ্য হয়ে গেছে ; অথবা আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের মতো কোনো মানসিক স্থৈর্যেরও অভাব ছিল।

আমাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে সকল বিরুদ্ধে-পক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একরাশ ঘন কালো মেঘ ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ে শেষের মুহূর্তের অপেক্ষায় যেন ওত পেতে বসেছিল। বাতাসের শনশন শব্দ। হাড়কাঁপানো শীতের অনুভূতি। সেই নিঃসীম তমিস্রার নিবিড় ভিড়ে একসঙ্গে সুর মেলাবার জন্য বৃষ্টি এল।

ফোটা-ফোটা বৃষ্টির ছোটাছুটির মধ্যে সবকিছু অজানা এই পরিবেশে সম্পূর্ণ রিক্ত অবস্থায় একরূপ নির্বাসিতের মতো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে বুঝতে পারলাম মাঝে-মাঝে জীবনের একটা মানে খুঁজে পাওয়া প্রয়োজন। এই কুড়িটি বছরের দাম্পত্যজীবনে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে কতটুকু পেয়েছি না পেয়েছি নিরাবরণভাবে তা জেনে ফেলার পক্ষে উপযোগী এই অদ্ভুত নির্জন আলোহীন বৃষ্টিমুখর প্রান্তরে যে শুভ-ক্ষণ উপস্থিত হয়েছে, তার সদ্ব্যবহার অবশ্যই করা উচিত।

মানুষ মানে আমরা, এই গ্রহে অবস্থানকারী সবথেকে মস্তিষ্কসমৃদ্ধ জীবেরা নিজেরাই প্রত্যহ নিজেদের হাজার রকম সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছি। হঠাৎ মনে হল, সেই বড়ো শহরের রঙিন মেলার উজ্জ্বল আকর্ষণ কখন যেন মন থেকে বিদায় নিয়েছে। মনের ভিতরে শুধু এক দৃঢ় প্রত্যয়, এতদিন পর এরকম একটি অপার্থিব স্থানের

সন্ধানই হয়তো আমরা দুজনেই মনের অগোচরে করছিলাম : এ কোনো স্বর্গীয় স্থান নয় ; তবু এখানেই সংকোচহীন যাবতীয় ক্রোধ অবিশ্বাস সন্দেহ বৃষ্টির পতিত জলের সঙ্গে ধুয়েমুছে যাবে।

কুড়ি বছরের জমাখরচের হিসেবে প্রেম-নামক অনুভূতির অস্তিত্ব প্রমাণে আমরা পরস্পরের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে থাকলাম। অবিরত বৃষ্টির পতনে পাশাপাশি সময় যুগ এবং পরিবেশর্জনিত মূল্যবোধও অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকল। হয়তো বা সেই পাথরের যুগ থেকে আমরা দুজনে এরকম মুখোমুখি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি প্রকৃতির সমস্ত প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে।

বৃষ্টি তখনো ঝরে চলেছে।

শিল্পী শিপ্রা ভট্টাচার্য

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৬ সালের স্নাতক। সরকারি চারুকলা বিদ্যালয় থেকে সার্টিফিকেট কোরসটি সমাপ্ত করে কলেজ অব ভিজুয়াল আর্টস-এ শুভাপ্রসন্নর সাহচর্য এবং শিক্ষকতায় পাঁচ বছর বিধিবদ্ধ তালিম নেন। বিড়লা অ্যাকাডেমি, ললিতকলা অ্যাকাডেমি, জ্যাভেরিয়ান আর্ট গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত যৌথ প্রদর্শনীতে তার ছবি বহুবার প্রদর্শিত হয়েছে। সম্প্রতি জারমানির জনৈক কোলাজ শিল্পীর সঙ্গে তিনি এবং সমকালীন আরও তিনজন উদীয়মান শিল্পী একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। ১৯৮৫-র এপ্রিল মাসে বোমবাইয়ের জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারিতে প্রদর্শিত হয়েছে তাঁর একাধিক ছবি। নিত্যকার পরিবেশের অতি-পরিচিত মানুষ—তাদের বিচিত্র আচরণ, স্বভাব, চারিত্রিক অসংগতি, এমনকি মুদ্রাদোষ পর্যন্ত তুলির মজাদার টেকসচারে এক ধরনের সংগীতময়তায় ধরতে চান শিল্পী।

সমরেশ বসুর রাজনৈতিক উপন্যাস

বিজিতকুমার দত্ত

১

সমরেশ বসু বেশ কিছুকাল ধরে 'নিজেকে জানবার জন্য' উপন্যাস রচনা করছেন। সমরেশ একদা কমিউনিসট পার্টির সংস্পর্শে এসেছিলেন। দীর্ঘকাল পার্টির নানাবিধ কর্মে তিনি সহযোগিতা করেছিলেন। পরে তিনি পার্টি থেকে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু রচনাকর্ম থেকে বিরত হন নি। পার্টি-জীবনে তিনি নিশ্চয়ই কোনো সংকটের মুখোমুখি হয়েছিলেন। সে সংকটের সমাধান তিনি কিভাবে করেছিলেন জানি না। আমরা তাঁর রচনাকর্ম থেকে বুঝতে পারি, কমিউনিসট পার্টির প্রতি তাঁর কৌতূহল-অনুসন্ধিৎসা আর রাগ-বিরাগ এখনও প্রবল। নচেৎ কংগ্রেস রাজনীতি অপেক্ষা কমিউনিসট রাজনীতির প্রতি তিনি বেশি উৎসাহিত হবেন কেন? আসলে, তাঁর পার্টি-জীবন এবং এখনকার পার্টি-বিহীন জীবনের মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। এবং বর্তমান কমিউনিসট পার্টির মতাদর্শ, মতাদর্শের প্রয়োগ ইত্যাদির বিশ্লেষণ করে তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছেন। 'স্বীকারোক্তি', 'মানুষ' ইত্যাদি গল্পে সেই উত্তেজনার পরিচয় পাই। উপন্যাসগুলিতে সেই ভাবনারই বিস্তার।

সম্ভবত নিজেকে বুঝতে চেয়েছেন বলেই কিছু উপন্যাসে তিনি স্মৃতিকথা-আত্মকথা রচনাশৈলীর আশ্রয় নিয়েছেন। এই কারণে ইদানীংকার সমরেশ বসুর উপন্যাসে নসট্যালজিক বেদনা বিস্তৃত হতে দেখা যায়। কখনও-কখনও ইতিহাসের পাত্রে তিনি উপন্যাসকে স্থাপন করতে উদ্যোগী হন এই কারণে। আসলে স্মৃতি তো একদিক থেকে ইতিহাস। সমরেশের উপন্যাসগুলি যেন সাহিত্যের আর-একটি শাখা-ইতিহাসের (ব্যাপক অর্থে ইতিহাসও সাহিত্য) সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হয়েছে। দৃষ্টিকোণ অবশ্যই সমরেশের নিজস্ব।

ইতিহাসরচনাকর্মে প্রত্যেক ঐতিহাসিকেরই দৃষ্টিকোণ থাকে। এই দৃষ্টিকোণ থাকে বলেই একই সময় নিয়ে লেখা বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন আবেদন নিয়ে আসে। সমরেশ বসু একেবারে সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক জীবনকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। ইতিহাস-রচনার জন্যে যে দূরত্ব প্রত্যাশিত, তা তিনি পাচ্ছেন না। সেখানে সমরেশ ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণকে আশ্রয়

করেছেন। পাঠকের চিত্তে সেই কারণে নানা প্রশ্ন জাগে, পাঠককে তর্কে প্রবৃত্ত করায়। ঔপন্যাসিকের বিশেষ শিল্পবিবেকটিকে সব সময় পাই না বলে উপন্যাসের দৃশ্য, ঘটনা, নৈতিক চেতনার সঙ্গে আমরা একাত্ম হয়ে যেতে পারি না।

উপন্যাসগুলিতে কখনও-কখনও তিক্ত মনোভাব বিস্তৃত হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি। সন্দহ জাগে, সমরেশ যখন পার্টি পরিত্যাগ করেন তখন তিনি সেই-রকম কোনো তিক্ত অভিজ্ঞতার স্পর্শ পেয়েছিলেন কিনা। তিনি তাঁর উপন্যাসে কখনও-কখনও বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, এবং রায়দানেও কুণ্ঠিত হন না। এখানে সমরেশ আর ঔপন্যাসিক নন—তিনি একজন বিচারক। বলা বাহুল্য, সমসাময়িক কালের রাজনীতির বিচার এই মুহূর্তে করা সঠিক নাও হতে পারে। জরজ অর-ওয়েলের তিক্ততার কথা আমাদের মনে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু তিনিও একজাতীয় রূপকের আশ্রয়ে নিজেকে আড়াল করেছিলেন। সমরেশের রাজনৈতিক উপন্যাসে (সব উপন্যাসে নয়) সেই মোহিনী আড়ালটুকুও নেই।

বোধ করি সেই কারণেই সমরেশের কিছু চরিত্র তাদের নিজস্ব ন্যায়ে চলে না। সমরেশ সূত্রধারের ভূমিকায় রয়েছেন। সুতো তিনি ছাড়তে চাইছেন না। এই 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় আমরা উত্তেজিত হই বটে, কিন্তু মাঝে-মাঝে বড়ো বিপন্ন বোধ করি। আমরা তো ভুলতে পারি না জগদ্দলের স্রষ্টা সমরেশ বসুকে। অথবা 'বি টি রোডের ধারে'র সহদয় মানুষটিকে। 'গঙ্গা' উপন্যাসে তিনি বিলাসকে পাঠাচ্ছেন মহাজীবনের দিকে। কিন্তু এসব উপন্যাসের নায়করা অধিকাংশই বিধ্বস্ত। সমরেশ বসুর রাজনৈতিক উপন্যাস পড়ে মনে হয়, তিনি সমকালের রাজনীতিকে বন্ধ্যা রাজনীতি বলতে চেয়ে-ছেন। কিন্তু ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে এটা উঠে আসে যে, রাজনীতিই পরিত্যাজ্য। হয়তো সমরেশও বিলাসের মহাজীবনের তৃষ্ণাকে সম্প্রতি আর বুঝে উঠতে পারছেন না। কিংবা খুব কাছের বলেই হয়তো পুরো পারস-পেকটিভ লেখকের কাছে স্বচ্ছ হয়ে উঠছে না। 'শ্রীমতী কাফে' অথবা 'যুগ যুগ জীয়ে'-তে সমরেশ যে-সাফল্য অর্জন করেন, পরবর্তী রাজনৈতিক উপন্যাসগুলিতে সে সাফল্য তিনি পান নি। এবারে উপন্যাসের আলোচনায় চলে আসি।

২

Exploitation of the poor can be extinguished not by effecting the destruction of a few millionaires, but by removing the ignorance of the poor and teaching them to non-cooperate with their exploiters. *Harijan*, July 1940.

...her (India's) backwardness in the science of modern warfare, the peaceful contentment engendered by her latter-day philosophy and adherence to *ahimsa* carried to the most absurd length. Subhaschandra Bose.

ভারতবর্ষের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসে গান্ধীজীর আবির্ভাব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাল গঙ্গাধর তিলক থেকে গান্ধীজীর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক চিন্তাধারা অনুসরণ করলে অবশ্যই বলতে হবে, গান্ধীজী কংগ্রেসের আন্দো-লনকে বিশেষ একটা দিকে মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। গান্ধীজীর রাজনীতির প্রধান অস্ত্র অহিংসা। অসহযোগ, সত্যাগ্রহ, অনশন স্বাধীনতা-অর্জনের বিভিন্ন উপায়। গান্ধীজী রাজনীতির সঙ্গে নৈতিক চিন্তাধারার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। অস্পৃশ্যতা-এবং নিরক্ষরতা-দূরী-করণকে তিনি জীবনের অন্যতম ব্রতরূপে গ্রহণ করে-ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যেই ধীরে-ধীরে কতকগুলি রাজনৈতিক দলের সূচনা ঘটছিল। বিপ্লবী দল তো ছিলই—এবং পরবর্তী কালে কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট ইত্যাদি নানা দলের প্রতিষ্ঠা ঘটছিল কংগ্রেসের মধ্যেই। কংগ্রেসের মঞ্চেই বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী মতবাদ কখনও মৃদুভাবে কখনও সরবে প্রকাশ পেতে লাগল। জওহরলালকে তো কোনো-কোনো বামপন্থী দল বিশেষ শ্রদ্ধার চোখেই দেখতেন। কিন্তু গান্ধীজীর বিরোধিতায় কোনো দলই প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামতে সাহস পায় নি। সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেস ছাড়েন (১৯৩৯) তখন তিনি তাঁর দলে কংগ্রেসের বৃহত্তর অংশকে পান নি। এর কারণ, বোধ করি, ভারতবর্ষ তখন পরাধীন। পরাধীনতা থেকে মুক্তির প্রশ্নই ছিল প্রত্যেক দলের বড়ো সমস্যা। এ বিষয়ে সকলেই একমত ছিলেন। অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টি ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের সঙ্গে একমত হয় নি। ১৯২০ সালে কমিউনিস্ট পার্টির বাঁজ বপন করা হয়েছিল। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ বিশেষভাবে

প্রতিষ্ঠিত হন ভারতীয় চিত্তে। তারপর থেকে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা বাড়তেই থাকে। গান্ধীজীর ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের সময় কমিউনিস্ট পার্টি ভারতীয় রাজনীতিতে লক্ষণীয় একটি শক্তিরূপে বিবেচিত হয়েছিল। ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতিতে বৈপ্লবিক পন্থা হিসাবে সশস্ত্র অথবা নিরস্ত্র—এই উভয় মতবাদই প্রবাহিত ছিল। এই পটভূমিকায় সমরেশ বসু তাঁর 'শ্রীমতী কাফে' গ্রন্থটির অবতারণা করেছেন।

শ্রীমতী কাফে-কে কেন্দ্র করে সমরেশ রাজনৈতিক-চেতনাসম্পন্ন কিছু তরুণের সমাবেশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায় উপন্যাসেও এমন একটি চায়ের আড্ডার অস্তিত্ব ছিল। তরুণ বিপ্লবীদের সমাবেশ সেখানে ঘটত। কিন্তু সমরেশ শ্রীমতী কাফে-কে সিম-বলিক থেকে রিয়ালিসটিক পর্যায়ে বিস্তৃত করে দেন। সিমবলিক এই অর্থে যে, শ্রীমতী কাফে-র প্রতিষ্ঠা থেকে পরিণতি পর্যন্ত রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার একটি ইতি-হাসকেই সূচিত করে। সমরেশের ভাষায়, "শ্রীমতী কাফে কোন একটা বিশেষ রেস্তোরাঁ নয়। তবু একাধিক মিলে শ্রীমতী কাফের একটা বিশেষত্ব আছে। অর্থাৎ শ্রীমতী কাফে একটা ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। সে ঐতিহ্য আমাদের জাতীয় জীবনেরই আলোআঁধারির খেলা।" আবার রিয়ালিসটিক এইজন্যে যে, ওই কাফে-র "কাহিনী ও চরিত্রই এর প্রধান উপজীব্য এবং তা বাস্তবধর্মী হলেই এর উৎস-সন্ধানে যে ইতিহাস আপনা হতেই এসে পড়ে, উপন্যাসে সেটা অপ্রধান নয়।" লেখকের এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, চলমান রাজনৈতিক জীবনের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির হয়ে ওঠার যে ভাঙচুর, দ্বন্দ্ব-সংঘাত তিনি তাকেই স্পর্শ করতে চেয়েছেন।

শ্রীমতী কাফে-র মালিক ভজনলাল হালদার। ভজু-লাট নামে সকলের কাছে পরিচিত। মামলাবাজ নেকো হালদারের ছেলে ভজু বাপের পথ ধরে নি। বাপ প্রচণ্ড জেদের বশে একের পর এক মামলা করে গেছে এবং নিয়মমাফিক হেরেছে। সেই আপোসহীন জেদ অবশ্য ভজু উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করেছে। গ্রাজুয়েট ভজু চাকরি নেয় নি, অন্য কোনো সুখসুবিধাও চায় নি। স্বাধীন থাকবে বলেই এই চায়ের দোকান খুলেছে। উচ্চাশা তারও ছিল। একঘেয়ে জীবনের প্রতি তার তীব্র প্রতিবাদ সকলকে চমকে দেয়। পরাজয় সে মানতে পারে না। ভজুলাটের এই সমাজের প্রতি যত অশ্রদ্ধা তত দম্ভ। জীবনের নিরাপত্তা সে খোঁজে নি, তাই চাকরির পথে না গিয়ে ঝুঁকি নেয় চায়ের দোকান দেবার। কিন্তু ভজুলাটের এই প্রচণ্ড গতিবেগের মধ্যে আছে পশ্চাৎ-টান। মরুভূমির দাহের মধ্যে আছে তার দাদার প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসার ওয়েসিস। দাদা নারায়ণ বিপ্লবী। দাদাকে সে শ্রদ্ধা করে, দাদার জন্যে সে প্রাণবিসর্জন দিতে পারে, কিন্তু বিপ্লবী সে হতে চায় না। কিন্তু কোনো বিপ্লবী থেকে সে কম সাহসী নয়। বিপ্লবীদের পরীক্ষার কথা যখন সে শোনে তখন দাদার উপর তার অভিমান হয়েছিল। অভিমানেই সে সকলের অলক্ষ্যে শ্মশানে যায় রাত্রে। দাদাকে সে বুঝিয়ে দেয় সেও অনা-য়াসেই ওই বিপ্লবীদলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারত। দাদার সূত্রেই ভজুলাট রাজনৈতিক কর্মীদের শ্রীমতী কাফে-তে নিমন্ত্রণ জানায়। সকল রাজনৈতিক কর্মীর প্রতিই ভজু-লাটের শ্রদ্ধা, এমন-কি ভালোবাসাও। এত ভালোবাসা সত্ত্বেও ভজু ভাবে, "আমি একটি নিঃস্ব। স্নেহ: ভাল-বাসা আমার জন্য নেই এ সংসারে।...জীবনের পথে কেবলি কোলাহল। অস্থির। কি যেন চাই, কি যেন নেই। এ জীবনে কেবলই ছুটে চলেছি...। কিন্তু বৃক্ত-হীন।...কোথাও মাথা নত করতে পারি নে, বুক ভরে পাইনে কাউকে আলিঙ্গন করতে। তবুও শুনি নহ-বতের সুর, বেতালের তালে দেখি গজলের তালফেরতার মোহিনী কটাক্ষ।" স্বভাবতই জীবনের চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার দ্বন্দ্বে ভজু ধ্বস্ত। তার চিরকালের সঙ্গী হয়ে উঠল উত্তেজক সুরা। সে শ্রীমতী কাফে-কে সাজিয়েছে। শ্রীমতী কাফেই তার জীবন, তার প্রেয়সী। বাড়িতে স্ত্রী যূথী আছে, মাতাল স্বামীকে যূথী বুঝে উঠতে পারে না। রাজনৈতিক কর্মীরাও না। ভজু রাজনৈতিক কর্মীদের ধারে চা দেয়, কিছু না নিয়েও চা পরিবেশন করে। রাজনৈতিক কর্মী যখন আহার-বাসস্থানের জন্যে টাকা দিতে যায়, ভজু হাসে, টাকা নেয় না। মরুভূমির মধ্যে ওইটুকু জল চিকচিক করে। দাদা নারায়ণ যখন গভীর রাত্রে অত্যন্ত বিপজ্জনক জায়গায় রেখে আসতে বলে, ভজু তখন ভুলু গাড়োয়ানকে নিয়ে সে অভিযানে বেরিয়ে যায়। বিপ্লবীদের সে আশ্রয় দেয়। লুকিয়ে রাখে। পুলিশের সঙ্গে উদ্ধতভাবে কথা বলে। পুলিশের

চোখে ধুলো দেয়। পুলিশ যখন ভজুর দোকান সারচ করে ভজু তখন ঠাট্টা-ইয়ারকি করে। দোকান যখন পুলিশ তছনছ করে দিয়ে যায় তখন ভজু ক্ষিপ্ত হয় পুলিশের উপর, ঘৃণায় সে বিদ্রোহী হয়, কিন্তু রাজনৈতিক কর্মীদের আসা বন্ধ করে দেয় না সে। ভজু রাজনীতিক নয়, কিন্তু তাকেও স্পর্শ করে রাজনীতির স্বার্থ এবং স্বার্থত্যাগের চরিত্র। চারিত্র্য আর চরিত্রহননের বিচিত্র রূপ। গান্ধীবাদী হীরেন যখন প্রায় ব্যর্থতার মুখোমুখি, এবং কোন পাপে তার এই হতাশা —এই প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত, তখন ভজু বলে, "তবে কি পাপ করেছে আন্দামানের বন্দীরা? তাদের জন্য তোমরা একটি কথা বলেছ? বাকি ফাইল বগলদাবা করে ইংরেজের অফিসে গিয়ে কোন্ স্বরাজের জন্য তোরা লড়ছিস্? বন্দীদের এই তিলে তিলে মরণ, তোমাদের এই শত্রুর সঙ্গে হাত মেলানো আর পরস্পরের সাহায্যের রাজনীতির জন্যে? তোমাদের এ খাতা-বদলীর দাবী আর সমাজসংস্কারের ধাপ্পা দিয়ে ভেবেছ এ রেল আর চটকল মজুরদের তোমরা ঠাণ্ডা রাখবে?...আগামী দু-চার বছরে তোমরা আরও ক্ষমতা পেতে পার...কিন্তু জেল সেটাই শেষ নয়। তোমরা ভেক নিতে পার, সাধু হতে পার না।" ভজুলাট শ্রীমতী কাফে-তে বরাবর রাজনীতিবিদদের প্রশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু সে বিপ্লবী অথবা সাধু হতে চায় নি। তার দাদা আন্দামান জেলে। বীরের রক্তস্রোতে স্নান করে ভজুলাটের নিঃস্ব একাকী জীবনে চৈতন্য আসে। সে চৈতন্যে ভারতবর্ষের রাজনীতির চেহারাটা ফুটে ওঠে। এইভাবে সমরেশ ভজুলাটকে নিয়ে আসেন রাজনৈতিক আবর্তে। বস্তুত, শ্রীমতী কাফে-র রিয়ালিসটিক পরিচয় এইখানে। ভজুর প্রতি সমরেশের সহানুভূতি শিল্পরূপে পেয়ে যায়। এক সময়ের রাজনীতির গলিঘুঁজিগুলি সমরেশ স্পষ্ট করে তোলেন। সমরেশ এখানে কোনো তাত্ত্বিক চিন্তাকে বিশেষ প্রশ্রয় দেন নি। কতকগুলি চিত্র এবং ঘটনার প্রবহমানতায় তিনি রাজনৈতিক চেহারাটাকে ধরতে চেয়েছেন। যার সাক্ষী হয়ে থাকছে শ্রীমতী কাফে। কিন্তু সাক্ষী তো নিজের কথা বলে, শ্রীমতী কাফে রাজনৈতিক সমগ্র প্রেক্ষাপটটি ধরে থাকে। বিপ্লবীদের একটা অংশ কমিউনিসট মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। ভজু কানুর হাতে তুলে দেয় কার্ল মার্কসের বই। জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতিদিবস উদ্‌যাপিত হবে কংগ্রেসের ডাকে। শ্রীমতী কাফে-তে জড়ো হয় হীরেন, কৃপাল, সুবিমল। নিরস্ত্র প্রতিবাদের ডাক। স্কুল থেকে বেরিয়ে আসছে ছেলে-মেয়েরা। রথীন কিছুটা উত্তেজিত। পুলিশ জুলুম চলল। শ্রীমতী কাফে-তে ভজুলাট বসে থাকে। অ্যালকোহলিক ভজুলাটের জীবন শেষ হয়ে আসে। সে গম্ভীর গলায় বলে, "নীলে নীলে বিষ শিরে শিরে বয়/লক্ষ জীবনের মিছে অপচয়।/আজ কিসের উচ্ছ্বাসে ওঠে বুদ্‌বুদ।/এ কোন রক্ত চাহিতেছে সুদ?" ভজুলাটের যন্ত্রণা ফুটে ওঠে। গান্ধীজীর দেশব্যাপী আন্দোলনের চরিত্র যেমন একদিকে দেশবাসীকে উত্তাল করে তুলেছে, তেমনি আর-এক দিকে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মতান্তর, পরিশেষে তিক্ত মনান্তর, দেশবাসীকে কিছুটা দিশেহারা করে ফেলেছে। ভজুলাটের "কথা বল হে মৌন রাত" এবং মুক্তিকামনা ব্যক্তির সীমা পেরিয়ে বৃহত্তর দ্যোতনায় ব্যাকুল করে তোলে।

১৯১৯ সাল থেকে ভারত-ছাড়ো আন্দোলন পর্যন্ত ভারতব্যাপী গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ দেশে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই অসহযোগ আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে মরিয়া করে তুলেছিল। দমননীতির নিষ্ঠুরতা গান্ধীজীর শক্তিকে যেন আরও উজ্জ্বল, আরও ব্যাপক করে দিয়েছিল। জনগণের মধ্যে প্রকৃত স্বদেশচেতনা দেখা দিয়েছিল। তাঁর বারদলৌ অভিযান, ডান্ডী যাত্রা জনগণমনে বিপুল উন্মাদনা এনে দিয়েছিল। দেশবাসী সত্যাগ্রহ, অহিংসা, স্বরাজপ্রতিষ্ঠার মধ্যে দেশপ্রেমের যথার্থ উৎস খুঁজে পেয়েছিল। সমরেশ হীরেন নিয়োগীকে সেই আদর্শের প্রতিনিধিস্থানীয় রূপ দিয়েছেন। সমরেশের ঔপন্যাসিক দৃষ্টি এখানে নির্ভুল। একটু দূরের দৃষ্টি পেয়েছেন বলেই হীরেন সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। গান্ধীজীর আদর্শে প্রাণিত হীরেন গীতাকে মন্থন করে, অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণে অচ্ছুতদের সঙ্গে একসঙ্গে অন্নগ্রহণে এগিয়ে যায়। আর নারায়ণ, প্রিয়নাথ, রথীনের সঙ্গে সে ঝগড়া করে না বটে, কিন্তু বিপ্লবী অথবা কমিউনিসট আদর্শ যে ভ্রান্ত, এ বিশ্বাস তার দৃঢ়। মাঝে-মাঝেই অতীত ভারতবর্ষের মহান স্মৃতি তার চিত্তে জেগে ওঠে। সেই স্মৃতিতে বিহ্বল হীরেনের চরিত্রটি পাঠকের সহানুভূতি কেড়ে নেয়। গান্ধীজীর আদর্শেই সে বয়কট আন্দোলনে এগিয়ে আসে বউদিকে নিয়ে। কিন্তু সে আন্দোলনের হিংস্র রূপ দেখে হীরেন সংকুচিত হয়ে যায়। পাঠকের চিত্তে গান্ধীজীর চৌরিচৌরা ঘটনার বেদনার স্মৃতি চকিত হয় তখন। হীরেন রাজনীতি করে, জীবনকেও সে রাজনীতির আদর্শে গড়ে। বিত্তশালী পরিবারের ছেলে সে। বাড়ির মানুষদের ক্ষুদ্রতা তাকে ব্যথিত করে। সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে বৃহৎ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। চিত্তে তার রোমান্টিক আশা। হীরেন ধাঙড়-রমণী রামাকে দেখে মুগ্ধ হয়। তার যৌবনকে ঘা দিয়েছিল রামা। রামারই নিমন্ত্রণে তার চিত্ত নেচেছিল। ধাঙড়-বস্তিতে গিয়ে তার যে যন্ত্রণাকর অভিজ্ঞতা হল, নিপুণভাবে সমরেশ তাকে বিশ্লেষণ করেছেন। হীরেন দেখতে পেল ধাঙড়রা মদ খায়, মাতাল হয়, মাতাল যুবক রামাকে টানে। রামাও মাতাল হয়। হীরেনের স্বপ্ন ভেঙে যায়, ধাঙড় বস্তির পরিবেশ তাকে অস্থির করে দেয়। হীরেন অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কথা বলে নি, কিন্তু আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার সত্যটুকু দেখতে পাই। দেশোদ্ধার-ব্রত যে কত কঠিন এবং নির্মম, হীরেন তার অভিজ্ঞতা দিয়ে যেন বুঝতে পারে না। একটু স্বপ্নালু চরিত্র বলেই এই মানুষটি অশিক্ষার, অস্পৃশ্যতার গ্লানি খোলা চোখে দেখতে পায় নি। তথাপি এই চরিত্রটির আন্তরিকতা, সততা, দেশপ্রেম যথার্থ। সমরেশ দেশের রাজনীতির প্রকৃত দিগদর্শন করেন হীরেন চরিত্রে।

১৯২০ সালে তাসখন্দ সামরিক বিদ্যালয় থেকে কিছু বিপ্লবী ভারতবর্ষে কমিউনিসট পার্টির গোড়াপত্তন করেন। মুজফ্‌ফর আহমেদ, এম. এন. রায়, এস. এ. ডাঙ্গে এই পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। যুগান্তর-অনুশীলন দলের বিপ্লবী সদস্যরা ধীরে-ধীরে সাম্যবাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মও অবশ্য অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। সমরেশ বসু নারায়ণ, প্রিয়নাথ, রথীন ইত্যাদির টুকরো-টুকরো ছবি তুলেছেন। আর সে ছবিগুলো মিলিয়ে নিলে বিপ্লবীদের সাম্যবাদে আস্থাস্থাপনের দৃশ্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটা উদাহরণ দিই, "প্রিয়নাথের কোলের উপর একটা খোলা বই। দুটো ছবি দেখা যাচ্ছে বইটার পাতায়। একটা চরকাধারী নারায়ণ, আর একটা দাড়িওয়ালা মুখ। সে মুখের মাথায় বড় বড় উসকো খুসকো চুল, খানিকটা সাধু সন্তদের মত। অথচ গায়ে কোট। নারায়ণের মত এ মুখ হাসি দীপ্ত নয়। এ মুখ গম্ভীর, যেন কোন ভাবনার ঘোরে ডুবে রয়েছেন। চোখের দৃষ্টি গম্ভীর। নীচে লেখা রয়েছে, ঋষি কার্ল মার্ক্স।" প্রিয়নাথ শ্রমিকবিপ্লবের কথা বলে। সাম্যবাদের প্রকৃত রূপ তখনও প্রিয়নাথের কাছে নীহারিকার মতো। কিন্তু সে সাম্যবাদের কথা সকলকে বুঝিয়ে বলতে চাইছে। দলের সকলের সঙ্গে তার আদর্শের মিল হচ্ছে না দেখে সে দল থেকে বেরিয়ে আসছে। মনোহর, ভাগন, বাগ্গালী প্রভৃতি মজুরদের সে সঙ্ঘবদ্ধ করবার চেষ্টা করে। মজুর-আন্দোলনের বীজ বপন করা হয় এইভাবে। নারায়ণ, প্রিয়নাথ, কৃপাল, শঙ্কর ইত্যাদির আলোচনার মধ্য দিয়ে সেকালের রাজনৈতিক চিত্রটি প্রত্যক্ষ করেছেন সমরেশ। এ রাজনৈতিক বিতর্ক উষ্ণ, মনুষ্যত্বের মাপে স্পষ্ট এবং দেশপ্রেমের উঁচু আদর্শে বিশ্লেষিত। বক্তারের উত্তেজনা, উত্তাপ, বেদনা সমরেশ উপন্যাসের পাত্রে স্থাপন করেছেন সযত্নে। বিপ্লবী নারায়ণ এখনও সশস্ত্র বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করে নি। কিন্তু তার দ্বিধাদ্বন্দ্বটি লক্ষণীয়। এই দ্বিধাদ্বন্দ্বটি মানবিক। তেমনি আদর্শবাদী হীরেনের হতাশাও হৃদয়বেদী। কংগ্রেসের দলাদলি তাকে মুষড়ে দেয়। সে রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এম. এল. এ. হবার উত্তেজনা সে বোধ করে না। এই উপন্যাসটিতে বাস্তবতা এবং সেই সূত্রে একটি মনোরম প্যাটার্ন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভজুর উত্তাপ আর দীর্ঘশ্বাস এবং মাঝে-মাঝে তার কবিতায় আত্মপ্রকাশে যেন এক-একটি দৃশ্যের সার সংকলিত হচ্ছে। আবার তাই পরবর্তী ঘটনার জন্য আমাদের ব্যাকুল করে তুলছে। আর সমরেশ উপন্যাসটিকে স্থানের দিক থেকে খুবই সংকীর্ণ করে এনেছেন। সবকিছুই ঘটছে বা ঘটেছে শ্রীমতী কাফে-র সামনে, কাফের বাহির এবং অন্দরে। ফলে, উপন্যাসটির ঘনিষ্ঠ রূপ আমাদের চোখে পড়ে যায়। কাফে কখনও রাজনৈতিক উত্তেজনায় গমগমে, কখনও অনাগত অনিশ্চিত ভাবনায় থমথমে, কখনও-বা অন্দরের রহস্যময়তায় রাজনৈতিক বাতাবরণটি শিহরিত। জীবনের পদধ্বনিতে কাফে কখনও মুখর, আবার এই জীবনেরই সামাজিক শূন্যতাবোধে কাফে মৌনমূক। এমন-কি, ভুলু গাড়োয়ানও কাফের সঙ্গে অন্বিত। ভুলুর মাতালামি, রাজাবাজী (ঘোড়া)-প্রীতি এবং দেশপ্রেমের চকিত স্বার্থে উত্তেজনা চরিত্রটির একটি সুঠাম রূপ দিয়েছে।

সমরেশ রাজনৈতিক উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ জীবনকে ভোলেন নি। আসলে, রাজনীতির পথ সংঘর্ষের পথ—বিশেষ করে পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনীতি। যে মানুষগুলি এই সংঘর্ষের পথে এসেছে তাদের পশ্চাৎ-টানও লক্ষণীয়। সুনির্মল-সরসী, হীরেন-রামা-বৌদি, নারায়ণ-প্রমীলা, ভজু-যূথই ইত্যাদির টানাপোড়েনে সমরেশ স্বল্প রেখা আর রঙে চিত্রিত করেন। রঙ-রেখা কম হলেও মানুষগুলিকে চকিত করতে যথেষ্ট। এমন-কি ভজুর কাফের বিশে এবং চরণকেও সমরেশ ওই কাফের চরিত্রের সঙ্গে অন্বিত করেছেন।

উপন্যাসটি শেষ হয়েছে ভজুর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই। কিন্তু সমরেশ জাল গুটোনোর সময় কিছু সংবাদ আমাদের পরিবেশন করেন। শ্রীমতী কাফের শেকড় অনেক দূর ছড়িয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতা পাবার পরও সে কাফেকে শাসকরা ভুলতে পারে নি। কাফে বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু গভীরের শেকড় তৃষ্ণার বাহু বাড়িয়ে দেয় সমুদ্রের দিকে। সমরেশ প্রকৃতপক্ষে থেমেছেন কমিউনিসট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার সংবাদ নিয়ে। আবার সে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার সংবাদও পাই ওই উপন্যাসে। তারপরের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আরও জটিল, আরও যন্ত্রণাময়। কিন্তু সমরেশ বিশ্বাস করেন মানুষের কণ্ঠস্বর 'যুগ যুগ জীয়ে'।

৩

The Soviet entry into the war isolated Fascism as the main enemy of mankind...It transformed the war of the imperialists into a war of the peoples and opened the gate to a world-wide people's unity. Communist manifesto of Indian Communist Party.

When lakhs of Indians staked their all for the country's cause the Communistt were in the opposite camp, which cannot be forgotten. Jawaharlal Nehru, 23rd October 1945.

'শ্রীমতী কাফে' ভারতীয় রাজনীতির যে পর্বে শেষ হয়েছে, তার পরের পর্বের সূচনা 'যুগ যুগ জীয়ে' উপন্যাসে। ভারতীয় কমিউনিসট পার্টির মতাদর্শ কংগ্রেসের মতাদর্শ থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা হয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে। কংগ্রেস কর্মীরা তখন জেলে। নিষিদ্ধ পার্টির নেতারা জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে কমিউনিসট পার্টি জনযুদ্ধ বলে ঘোষণা করে। দেশের রাজনীতিতে তখন কমিউনিসট পার্টির মুখ্য ভূমিকা। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর কংগ্রেস সরকারের প্রতি কমিউনিসট নেতারা আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিছুটা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে কমিউনিসট পার্টি জড়িয়ে পড়ে। তেলেঙ্গানা ইত্যাদি অঞ্চলে কিছুটা সাফল্যলাভ করলেও কমিউনিসট পার্টি বুঝতে পারে তাদের ভ্রান্তনীতির কার্যক্রম। সংসদীয় গণতন্ত্রে কমিউনিসট পার্টি আস্থা স্থাপন করে। বিপ্লবের প্রয়োজনেই সংসদীয় গণতন্ত্রকে তারা মেনে নেয়। 'যুগ যুগ জীয়ে' ভারতীয় রাজনীতির এই পটভূমিতে স্থাপিত।

আঠারো বছরের যুবক ত্রিদিবেশ এই উপন্যাসের নায়ক। উপন্যাসটির সূচনা (নায়কের প্রসঙ্গে) ত্রিদিবেশ-শিউলীর ভালোবাসার চিত্র দিয়ে। ত্রিদিবেশ স্কুল-কলেজের শিক্ষা পায় নি। বাড়িতেও সে উপেক্ষিত। ঘরছাড়া লক্ষ্যহারা ত্রিদিবেশ ছবি-আঁকায় দক্ষ। পাড়ার মস্তানদের সে শায়েস্তা করে। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মঞ্জুদি ত্রিদিবেশের সাহসের প্রশংসা করেন, ত্রিদিবেশকে তিনি ছবি আঁকায় উৎসাহ দেন। শিউলী ত্রিদিবেশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সন্তানসম্ভবা শিউলী দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠে। বিমূঢ় ত্রিদিবেশ চাকরির সন্ধান করে। কিন্তু চাকরি পাওয়া তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। দেশব্যাপী ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের জোয়ার তখন। চারদিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি। আইনসভায় মন্ত্রিত্বে তখন ফজলুল হক, প্রমথ ব্যানার্জী, হবিবুল্লা, নলিনাক্ষ সান্যাল, কিরণশঙ্কর রায়। চাকরি-পাওয়ার রাজনীতি চলে সেখানে। ত্রিদিবেশ 'চায়—একটা কাজ, যে কাজে আশ্রয় আর খাবার জুটবে।' কিন্তু কোনো কাজের উপযুক্তই নয় সে।

বন্ধু রশীদের কাছে সে যায় চাকরির সন্ধানে। এখানে রুজভেলট টাউনের আশেপাশে মারকিন সৈন্যদের বীভৎসতা ত্রিদিবেশের চোখে পড়ে। দারিদ্র্যপীড়িত নিরন্ন মেয়েরা মারকিন সৈন্যদের কাছে দেহবিক্রয় করে। দেখা যায়, রশীদের বন্ধু এই মেয়েবেচাকেনার দালাল।

রশীদ এবং তার বন্ধুর প্রলোভন দেখে ত্রিদিবেশ স্তম্ভিত হয়ে যায়। যুদ্ধকালীন এই ভয়াবহ পরিস্থিতি ত্রিদিবেশকে আহত করে। আর আমরা পেয়ে যাই সেই সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কিছু দালালের ঘৃণ্য যোগাযোগ। প্রতিরোধ-সংগ্রামের অসহায় অভাব। সমরেশ নিপুণভাবে দেশের এই করুণ পরিস্থিতিকে চিত্রিত করেছেন।

রশীদের সঙ্গে ট্রেনে কলকাতা আসার সময় চীনা-বাঙালি দাঙ্গার দৃশ্য দেখে ত্রিদিবেশ। মারকিন সৈন্যদের নারীমাংসলোলুপতার দৃশ্যটিকে যেমন, তেমনি এই দাঙ্গার বিষয়টিকেও সমরেশ বিস্তৃতভাবে উদ্ঘাটিত করেন। চিত্রকর ত্রিদিবেশের চোখের সামনে দৃশ্যকে মেলে ধরে তার চিত্র। সত্তার উত্তেজনাকে লক্ষ করেন। আবার এসব দৃশ্যে মনুষ্যত্বের গ্লানি এবং ক্ষয়কেও তিনি ফুটিয়ে তোলেন। ত্রিদিবেশের সমস্ত সত্তা আলোড়িত হয়। ট্রেনে বেশ্যা মেয়েকে নিয়ে যুবকদের বেলেল্লাপনাকেও সমরেশ অঙ্কিত করেন। যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম মানুষের রিপুর উন্মত্ততা। উপন্যাসটিতে বারে-বারে সমরেশ আমাদের মনোযোগ সেই দিকে ফেরান। চীনা-বাঙালি দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চিয়াঙ-কাইশেককে আমন্ত্রণ এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর আলোচনার ব্যর্থতার ফলাফলটি আমাদের জানান। ত্রিদিবেশ দেখতে পায়, এই সূত্রেই সুভাষচন্দ্র বসু প্রসঙ্গ এসে যায়। এসব আলোচনা যখন চলছে, তখন মৃত্যুভয়ে ভীত একজন চীনা যুবক বাথরুমে খিল দিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করছে। সমরেশ (নাকি ত্রিদিবেশ?) বলেন, "যখন রাজনৈতিক মতবিরোধ দুজনের আলোচনায় সোচ্চার এবং যে কারণে মতবিরোধের উত্থাপন, সেই নিমিত্তের ভাগী রক্তাক্ত আহত অবস্থায় এখনো বন্ধ বাথরুমে।" এই রক্তাক্ত পরিস্থিতির মধ্যে সমরেশ অবতারণা করেন অধ্যাপক ধরণী মজুমদারকে। ধরণী মজুমদারের আলোচনায় কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধের এবং পরিশেষে পদত্যাগের কথা জানা যায়। তিনি সুভাষচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দিয়েছেন। অনুরূপ কারণে তিনি কমিউনিসটদের উপরও বীতশ্রদ্ধ। ধরণী প্রায় দৈববাণী করেন কমিউনিসটদের জবাব দেবার সময়। পালটা জবাব দেয় তর্করত কমিউনিসট যুবক—সময়েরই আর-এক নাম আজ ইতিহাস। সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক করণকৌশলের ভিত হল রাজনৈতিক মতাদর্শ। বস্তুত, বিয়াল্লিশের আন্দোলন আজ ইতিহাস। সে ইতিহাসের উষ্ণপ্রবাহ সমরেশ লক্ষ করেছেন।

ত্রিদিবেশ এই আলোচনায় কৌতূহলী হয়। সে কমিউনিসট সবিতাব্রতের সান্নিধ্যে এসেছিল। সবিতাব্রতের আচার-আচরণ ত্রিদিবেশের চিত্ত স্পর্শ করেছিল। সেই কারণেই সে এই কমিউনিসট যুবকটির পক্ষপাতী হয়ে ওঠে। যুবকের প্রতি এই প্রীতিপক্ষপাত থেকে কমিউনিসট পার্টির প্রতিও তার মমতা জাগে।

কলকাতায় রশীদ যে আস্তানায় ত্রিদিবেশকে নিয়ে যায়, সেটি হল ধুকড়িবাগানের বেশ্যাপল্লী। ওইখানেই একটি ঘরে ত্রিদিবেশের সাময়িকভাবে স্থিতি হয়। এই নোঙরা অঞ্চল ত্রিদিবেশকে অস্থির করে তোলে। সে ফিরে আসে। কমিউনিসট পার্টির সাহায্যে সে একটি আস্তানা খুঁজে পায়। শিউলীকে সে নিয়ে আসে। শিউলী মধ্যবিত্ত মূল্যবোধে বিশ্বাসী। এক সময়ে ত্রিদিবেশের সিগারেট খাওয়া দেখেও সে আহত হয়েছিল। "তেরো বছর বয়সেরও আগে, খেলাধুলা দুষ্টামীর মধ্যে, অন্যায় করা, নির্দয়তা, শালীনতা ইত্যাদির প্রতি প্রতি ওর একটা অনায়াস সজাগ দৃষ্টি ছিল।" কখনও-কখনও বাপের কথায় সে নিজেকে জগৎপালিকা, নায়িকালক্ষণাক্রান্ত বলে মনে করত। এই শিউলী যখন সন্তানসম্ভবা হল স্বভাবতই পাপবোধ তাকে গ্রাস করে। সে আত্মহত্যার জন্যে প্রস্তুত হয়। একটি পাপ বহুতর পাপের পথে নিয়ে যায়। ত্রিদিবেশ তার দায়িত্ব পালন করে। ত্রিদিবেশের চরিত্রের এই সততাকে সমরেশ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। শিউলী স্বস্তি পায়। গৃহস্থালিতে আসক্ত হয়। ঠাকুরের ঘট স্থাপন করে ঘরে।

আর ত্রিদিবেশ পার্টির কিছু-কিছু কাজ করতে থাকে। এবারে ত্রিদিবেশকে পাই মধুদির সান্নিধ্যে। চটকলে মার্ক বয়ের কাজ করতে-করতে ত্রিদিবেশ ছবি আঁকে। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে চটকলের ইংরেজ মালিকদের গিন্নিদের ছবি এঁকেও কিছু রোজগার করে। এখানেও ত্রিদিবেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। শাসক ইংরেজ মহিলার নীচতা ক্ষুদ্রতা ত্রিদিবেশকে বিপর্যস্ত করে—ব্যতিক্রম দেখলে ত্রিদিবেশ করুণায় কাতর হয়ে ওঠে। কায়ক্লেশে এই দিনযাপনের মধ্যেই সে মধুদির কাছে আসে। হঠাৎ সাইরেন বাজে। জাপানি বিমানের আক্রমণের

সংবাদ। বাইরে ভয়াবহ অন্ধকার। অ্যানটিএয়ারক্রাফটের বিকট গর্জন। আলিঙ্গনাবদ্ধ দুই নরনারী পিপাসায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। ত্রিদিবেশ তখন "অলৌকিক অমোঘ প্রবাহে গতিশীল, আত্মধিক্কারে নষ্ট এবং রুচিশীল সংস্কারাদি।" এই ভয়ঙ্কর অথচ অনিবার্য ঘটনায় ত্রিদিবেশ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এই আচ্ছন্নতার মধ্যেও সে শিউলীর জন্যে ছটফট করে, ছুটে যেতে চায় শিউলীর কাছে। গর্ভবতী শিউলীর জন্যে ত্রিদিবেশ কাতর হয়। চলে আসে ত্রিদিবেশ নিজের ঘরে, মূর্ছাগত শিউলীকে সে ঘরে নিয়ে আসে। ত্রিদিবেশের অন্তরে কিছুক্ষণ আগের ঘটনার জন্য গ্লানিবোধ, অন্যদিকে শিউলীর প্রতি অকপট ভালোবাসা একই সঙ্গে প্রবাহিত হতে থাকে। ত্রিদিবেশের পাপবোধ এবং তা থেকে উত্তরণের চিত্রটি উদ্‌ঘাটনে সমরেশ দক্ষতার পরিচয় দেন। জাপানি বিমান-আক্রমণের পটভূমিকায় গর্ভবতী শিউলীর যন্ত্রণাকাতর চিত্র সমরেশ সূক্ষ্ম রেখায় আঁকেন। মধুদি এবং শিউলী দুজনেই সেই দিনে শঙ্কাকাতর ছিল। দুজনেই ত্রিদিবেশকে আশ্রয় করে সেই শঙ্কা কাটিয়ে উঠতে চেয়েছিল। দুজনেই ভয়ের সাগরে ঢেউ তোলে। ত্রিদিবেশ এর অর্থ হয়তো খুঁজে পায় না। তার শিল্পী-সত্তা জেগে ওঠে। শিউলীর ছবি আঁকে সে। হয়তো সে খুঁজে পায় মধুদিকেও।

এরপর সমরেশ ত্রিদিবেশের নিদারুণ দারিদ্র্যের বর্ণনা দেন। সমরেশ তাঁর ছোটোগল্পের ভূমিকায় "নিজেকে জানবার জন্যে"-তে তাঁর নিজের জীবনের অসহ্য অভাবের যে কথা বলেছেন, তারই আরো বিস্তৃত আরো রূঢ় বর্ণনা দেন ত্রিদিবেশের প্রসঙ্গে। ত্রিদিবেশের মধ্যে সমরেশের আত্মজিজ্ঞাসার প্রতিফলন। ত্রিদিবেশের চরিত্রে সমরেশ শিল্পীর উন্মেষ এবং বিকাশ লক্ষ করেছেন। আসলে সমরেশ কেমন করে লেখক হয়ে উঠলেন, সে কথাটাও বলা জরুরি তিনি মনে করেছেন। শিল্পীকে বহু চড়াই-উতরাই ভেঙে জীবনের মুখোমুখি হতে হয়। সে চড়াই-উতরাইয়ের একটা অংশ সমরেশের কমিউনিসট পার্টির জীবন। ত্রিদিবেশ কমিউনিসট পার্টিতে এসেছে। আর পার্টির সূত্রেই সে মধুদির মুখোমুখি হয়। এবং পার্টির সূত্রেই সবিতাব্রতের তার প্রতি সহানুভূতি। কমিউনিসট ইন্দ্রনাথ এবং নীলুই ত্রিদিবেশকে ছন্নছাড়া হয়ে যেতে দেয় নি। পার্টির এই মানুষগুলির প্রতি ত্রিদিবেশ কেবল দলীয় আনুগত্যই নয়, জীবনের উত্তাপেই সে তাদের আপন করে নেয়।

তথাপি সমরেশ লক্ষ করেন পার্টির বাইরেও ত্রিদিবেশের শিল্পীসত্তা আরো কিছুর সন্ধান করে। সেইজন্যেই সমরেশ দ্বিতীয় খণ্ডে ত্রিদিবেশের স্বগত-চিন্তায় স্বর্গ-নরকের স্মৃতি উদ্ধার করেন। ত্রিদিবেশ ভারতীয় পুরাণ-কাহিনীতে আস্থা পায়। ত্রিদিবেশের শিকড় কোথায়? সে তাকে খোঁজে। সাবিত্রী-সত্যবানের কথা তার মনে হয়। ভারতীয় পুরাণে যে অনিঃশেষ প্রাণের কথা বলা হয়েছে তাকে স্মরণ করে ত্রিদিবেশ উত্তেজিত হয়। নরকের অভিজ্ঞতা ছাড়া স্বর্গলাভ অসম্ভব—পুরাণে যেন তারই ইঙ্গিত। 'দ্য ডিভাইন কমেডি' সমরেশ স্মরণ করেন। দান্তের নরক অভিজ্ঞতা যে স্বর্গের দুরূহতম সিঁড়ি, কিন্তু সেখানেই তার শেষ নয়—সে যে স্বর্গের পথ দেখায়, সমরেশ তা স্মরণ করেন। দুঃখের তিমিরে জ্বলেই মুক্তির সন্ধান। ত্রিদিবেশ স্মরণ করে তার জীবনের নরকের কথা। ধুকড়িবাগানের বেশ্যাদের ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত জীবনকে ত্রিদিবেশ মনে করতে থাকে। রশীদ তাকে নিক্ষেপ করেছিল এই পঙ্কে। সে নরকযন্ত্রণা থেকে বেরিয়ে এসেই কি ত্রিদিবেশ মুক্তি পেয়েছিল? না। কমিউনিসট ইন্দ্রনাথের স্নেহমমতয় সে নরক উত্তীর্ণ হয়েছিল। "ইন্দ্রনাথ বড়লোকের ছেলে হয়েও কমিউনিসট পার্টিতে এসেছে। নীলু মিস্তিরির মতো লোককে নীলুদা বলে ডাকে। কমিউনিসট না হলে এসব হয় না। ...আমার ভালো লেগেছিল।" এইভাবে ত্রিদিবেশ কমিউ-নিসট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

ত্রিদিবেশ দেখতে পায় অসংখ্য মানুষ চটকল ছেড়ে গ্রামে চলে যায়। কুলি সর্দারদের নিষেধ মানে না যুদ্ধ-ভীত মানুষগুলি। যুদ্ধের করাল ছায়া নেমে আসে রুজভেল্ট টাউনে। অন্যদিকে কমিউনিসট বিদ্বেষ বিস্তৃত হতে থাকে। মস্তানরা কমিউনিসটদের থুতু দেয়। ত্রিদিবেশ এই বিরূপতায় কমিউনিসটদের প্রতি মমতায় কাতর হয়। মোহন-শিউলীর সংবাদে আমরা জানতে পারি ত্রিদিবেশ কমিউনিসট পার্টির এখন সারাক্ষণের কর্মী। বস্তিতে-বস্তিতে ও কাজ করে। পোসটার লেখে। লাইব্রেরি গড়ার কথা ভাবে, ম্যাগাজিন বার করে, বই পড়ে। অবশ্য ঘরসংসারেও ত্রিদিবেশের অবহেলা নেই।

ত্রিদিবেশ মধুদির সঙ্গে সেই রাত্রের নিষ্ঠুর অথচ মধুর অভিজ্ঞতার কথা শিউলীকে বলে নি কোনোদিন। কিন্তু মধুদির ঘরে ফেলে আসা তার শাল শিউলীর হাতে তুলে দেয় মোহন। শিউলী স্তম্ভিত, বিমূঢ়। শিউলী বুঝতে পারে ত্রিদিবেশ তাকে মিথ্যে বলে-ছিল। ঈর্ষায় দগ্ধে শিউলী ত্রিদিবেশকে আঘাত করে। আহত ত্রিদিবেশ রাত্রে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। অন্ধকারে সে পেয়ে যায় মংলি আর তার স্বামীকে মাতাল অবস্থায়। উদ্‌ভ্রান্ত ত্রিদিবেশ এদের নিয়ে আসে তাদের নোঙরা বস্তিতে। আর ত্রিদিবেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয় সে রাত্রিতে। মংলি অতিথিসেবায় তৎপর হয়ে ওঠে। কৃতজ্ঞতা জানায় স্বামীর অনুমতি নিয়েই ত্রিদিবেশকে দেহদান ক'রে। ত্রিদিবেশ পেয়ে যায় তার সাবিত্রী-সত্যবানকে। শিউলীর উপেক্ষা আর মংলীর আহ্বান—এই দুই বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে ত্রিদিবেশের এক সঙ্কটময় পরিস্থিতি। শিউলীর অপমান তাকে নিয়ে গিয়েছিল এক শূন্যতায়। তার তখন মনে আসে নি, "ইন্দ্রনাথ-মায়াকোভস্কি-ইলিয়া এহরেনবুর্গ-পারীর পতন—জয়নাল আবেদিনের ছবি—তুলির টানে ক্ষুধার গোঙানি শোনা যায়—আর সেই অভূতপূর্ব স্থির চিত্র-গুলি ক্যামেরায় ধরা, সোঁদা গন্ধ কাঁচ ডাঁটার মতো মেয়েরা চলে যায় ট্রাকভরতি—বিমান অবতরণের ক্ষেত্র তৈরী করতে—অন্নের সন্ধানে, প্রকৃতপক্ষে দৈহিক ক্রেতার সন্ধানে, নিজেদের বিক্রয়ার্থে!" ত্রিদিবেশ বাড়ি ফিরে-ছিল ইন্দ্রনাথের বোন জয়ার প্রেরণা নিয়ে। পার্টির সদস্য হিসাবে সেও যুদ্ধের ছবি আঁকবে। বস্তিতে গিয়ে বস্তির মানুষকে দেখে তার মনে হয়েছিল এই-ই যুদ্ধের ছবি। একজন পার্টি শিল্পী ছবি-আঁকার বিষয় খুঁজে পেয়েছিল বস্তিতে। সমরেশের এই বিবরণ একদিক থেকে খুবই মূল্যবান। একজন শিল্পীর দায়িত্ব কিভাবে জীবনভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে যায়, সমরেশ সেই কথাই বলতে চেয়েছেন। কমিউনিসট পার্টি শিল্পচর্চার ক্ষেত্রেও মতাদর্শের কথা বলে। ত্রিদিবেশ সেই মতাদর্শ যতটা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে পারল, তার বিচার না করেও বলা যেতে পারে—ত্রিদিবেশ যে-জীবনের কথা বলতে চেয়েছে তা পার্টির কর্মজীবনসূত্রেই অর্জিত। কিন্তু সমরেশ যেন আরো কিছু বলতে চান। শিল্পী-সত্তা কেবলমাত্র পার্টির কাজেই দায়বদ্ধ নয়, নিজের জীবনের কাছেও। মংলির দেহদান ত্রিদিবেশকে "মাধ্যা-কর্ষণশক্তির মতো আকর্ষণ করে, তীব্রতা এনে দেয় ত্রিদিবেশের আবেগে, এবং তাকে কেবল ক্রিয়াশীল করে তোলে না, মমতা ও প্রমত্ত আনন্দে যেন বাঞ্ছা পূর্ণ করে, নিজের এবং আর-এক জনের। আঁকা ছবির মৌন কথা বলে, অন্ধকে পথদ্রষ্টার কাজ করে—যেন ছবি আঁকা হতে থাকে অনুশীলিত পরিশ্রমী প্রতিটি নির্ভুল রেখায়। সৃষ্ট আনন্দের প্রবাহে বহে মূর্তি রূপ পেতে থাকে রঙের ছটায়।" জয়াকে ত্রিদিবেশ বলেছিল, "জানি বুঝতে পারি না এক-একটা ঘটনা কেন ঘটে যায়। আমি যা চাই না, তাই করি, মনে হয় আমাকে দিয়ে আর কেউ করিয়ে নিচ্ছে।...আমার ইচ্ছায় কিছুই ঘটছে না।" এ দুটি উদ্ধৃতি থেকে সহজেই বোঝা যায়, সমরেশ শিল্পী ত্রিদিবেশকে পার্টির সদস্য হিসাবে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন না। কেননা কমিউনিসট পার্টি ত্রিদিবেশের এইসব ধারণাকে গ্রহণ করে না। শিল্পীর স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হয়েও কমিউনিসট পার্টি শিল্পীর দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করে। সমরেশ কি লেখকের অথবা চিত্রীর সংকটের মুখোমুখি হচ্ছেন? কমিউনিসট পার্টির জি. বি. মিটিং-এ ত্রিদিবেশ লেনিনের ছবি বোর্ডে ফুটিয়ে তোলে, তখনও সে ছবি দেখে কারও-কারও মনে হয়েছিল এ লেনিনের পূর্ণচিত্র নয়। ত্রিদিবেশ বুঝতে পারে না শিল্পীর দর্পণে যেভাবে একজনের মুখ প্রতিভাত হবে, তাই বা ছবি হবে না কেন? নিত্যানন্দ চৌধুরী ত্রিদিবেশকে ভাববাদী বলে তিরস্কার করেছেন। তখনও ত্রিদিবেশের উত্তর একই রকম। নিত্যানন্দ বলে-ছিলেন ত্রিদিবেশকে দুর্ভিক্ষের, বস্তির, কারখানার ছবি আঁকতে। ত্রিদিবেশ ভাবে, বুরজোয়াদের কাছে ওইসব ছবি একঘেয়ে লাগে, এরকম চিন্তা ওর মাথায় আসে নি। অথচ সুধা ওর পেছনে ধাওয়া করে, উপবাস কী, এবং তার কষ্ট, সকলই ওর প্রতিটি ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভূত। মন্বন্তরকবলিত ওর নিজের জীবন। ভিক্ষা-পাত্র হাতে নিয়ে ওকে আর শিউলীকে দরজায় দরজায় ঘুরতে দেখা যায় নি, তথাপি ওর স্বীকৃতি, দুর্ভিক্ষের ছবিগুলো আজকাল ওকে উৎসাহিত করে না, ক্লান্ত করে।" ত্রিদিবেশের চিন্তায় শিল্পীর যন্ত্রণা ফুটে ওঠে। পার্টির মতাদর্শের সামনে ত্রিদিবেশ অসহায় বোধ করে।

ত্রিদিবেশ এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও পার্টি ছাড়ে না।

মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম যে একটা শয়তানি চক্রান্ত, ত্রিদিবেশ তা বুঝতে পারে। আবার নৌবিদ্রোহে কংগ্রেস নেতাদের কৌশল এবং কমিউনিসটদের দূরে সরিয়ে রাখার হীন মনোভাবকে ত্রিদিবেশ ধিক্কার দেয়। (নকশালপন্থীরা কিন্তু মনে করেন কমিউনিসট নেতৃবৃন্দ একটা বড়ো ভুল করেছিল নৌবিদ্রোহে এগিয়ে না এসে)। নৌবিদ্রোহের আত্মসমর্পণকে অবশ্য কমিউনিসট নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতকতা বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

ত্রিদিবেশ পার্টির প্রগতি প্রকাশনীতে আসে। সেখানে সে দেখতে পায়, এই সংস্থার ডাইরেকটাররা চূড়ান্ত বিলাসী। ডিরেকটারদের বৈকালিক টিফিনের ফলাও ব্যবস্থা। ত্রিদিবেশের জন্যে এক কাপ চা। শ্রেণী-সংগ্রামের ফাঁকা বুলি যারা আওড়ায় সমরেশ তাদের চাবুক মেরেছেন এই সংস্থার কর্ণধারদের আচার-আচরণ উদ্‌ঘাটন করে। দাঙ্গার দিনে যখন সমস্ত কলকাতা আতঙ্কিত, তখনও ডিরেকটাররা নিজেদের গাড়ি হাঁকিয়ে যার যার বাসস্থানে ফিরে যেতে থাকেন ত্রিদিবেশকে একলা ফেলে।

এরই পাশাপাশি বামপন্থী কমিউনিসটদের দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে পরিক্রমা, আটকে-পড়া হিন্দু-মুসলমানদের উদ্ধার, রাত্রির ভয়াবহ অন্ধকারে নারকীয়তার মধ্যে কমিউনিসট কর্মীর এগিয়ে যাওয়ার চিত্র সমরেশ চমৎকার ফুটিয়েছেন। কমিউনিসটদের এই সাহসিকতা এবং অসাম্প্রদায়িক-মানসিকতা সমরেশ বাস্তব অভিজ্ঞতার উত্তাপ-উত্তেজনা দিয়ে এঁকেছেন। ত্রিদিবেশও অভিভূত হয়। সে চলে আসে সেই রাত্রে মধুদির বাড়িতে। সেখানে সে দেখতে পায় কমিউনিসট হিন্দু-মুসলমান সদস্যবৃন্দ আহত মানুষের সেবায় নিযুক্ত। মধুদির ব্যস্ততা, পরিশ্রম এবং সেবাপরায়ণতা তাঁকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। আর আমরা পেয়ে যাই সালামকে যে আহতের সেবায় নিবেদিত। ত্রিদিবেশ সালমার মধ্যে খুঁজে পায় চিরন্তন সেবাপরায়ণা নারীকে। অক্লান্ত কর্মী সবিতাব্রত তো আছেই। মধুদির বাড়িতেই আমরা পাই বিজলী শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা অহীন মুখার্জীকে। ব্যায়ামবীর, দুঃসাহসী অহীন পার্টির কর্মী কিন্তু কর্তৃত্বপরায়ণ। সেবাব্রতে উৎসর্গিত হিমাংশু ডাকতারকে সমরেশ কয়েকটি রেখায় স্পষ্ট করেন কমিউনিসট কর্মী হিসেবে। হিমাংশু সতর্ক করে দেন, "আসলে তো পার্টির মধ্যে ভদ্দরলোকেরা আসর জমিয়ে বসে আছেন। কলকেতার বনেদী বড়লোকের ছেলে আর জমিদারের ছেলেরা পার্টিতে এলে, কোনো কোনো নেতার জিভ দিয়ে লালা ঝরে—গরীব কমরেডদের কাছে সেসব আবার শ্লোরিফাই করা হয়। আর আমাদের গরীব কমরেডরা ভাবে, যাদের কংগ্রেসে যাবার কথা ছিল, তারা যখন কমিউনিসট পার্টিতে এসেছে তাদের মতো মহান লোক আর হয় না।" ত্রিদিবেশেরও এই জিজ্ঞাসা। বস্তুত, সমরেশ হিমাংশু ডাকতারের এই বিশ্লেষণই পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে আরও বিস্তৃত করেছেন। ত্রিদিবেশ পার্টিতে থেকে শান্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। ছবি আঁকার প্রেরণা পায়। তার তুলিতে ফুটে ওঠে "একটি আবক্ষ চিত্র, করুণ আর উদ্বিগ্ন মুখ, চোখের দৃষ্টি স্নিগ্ধ এবং অতি জীবন্ত। সালমার মুখ।" মধুদিকে ত্রিদিবেশ নূতন করে আবিষ্কার করে। মধুদি ত্রিদিবেশকে বোঝান, জীবন শিল্পের থেকে বড়ো। এই জীবনই যেন ত্রিদিবেশের কাছে শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠে। ত্রিদিবেশ এই জীবননদীর ঘাটে-ঘাটে অবগাহন করে।

পার্টির সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও ত্রিদিবেশ পুলিশের সঙ্গে একযোগে শান্তিরক্ষার কাজে যোগ দেয় না। এই প্রথম সে বিদ্রোহ করে। ঝুঁকি নিতে সে ভয় পায় না। চটকল মজদুর বৃদ্ধ তুরাপ ইন্দ্রনাথকে বলে, ত্রিদিবেশ মিছিলে যাবে কেন? সে তসবীর আঁকবে। দাঙ্গার তসবীর। তুরাপের এই উচ্চারণ রণরণিয়ে ওঠে ত্রিদিবেশের সমস্ত সত্তা জুড়ে। শিল্পীর জাগরণ ঘটে যায়। ত্রিদিবেশের এই জাগরণ আমাদের মনে করিয়ে দেয় পিকাসোর কথা। গুয়েরনিকা ছবি আঁকার কথা। ত্রিদিবেশ এতদিন ছবি এঁকেছে এক-একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা দৃশ্যকে কেন্দ্র করে। আজ তার কাছে এই টুকরো অভিজ্ঞতাগুলি ঐক্যসূত্রে বিধৃত হয়ে তাৎপর্য পেয়ে যায়। সে ইন্দ্রনাথের বোন জয়ার বাড়িতে বসে তার স্বপ্নের কথা বলে। দাঙ্গার ভয়াবহ মর্মন্তুদ ছবি। খুনী মানুষের বীভৎস রূপ। খুনীরা কেন এইরকম করে? "আসলে তারা সকলেই অন্যের হাতের পুতুল হয়ে এসব করছে। পোস্টারগুলো হবে সবই পুতুলখেলার ছবি, পুতুলগুলোকে যারা নাচাচ্ছে—যাদের হাতে সুতো তাদের হাতগুলো কেবল দেখা যায়, আর মাথায় মুখে সারা গায়ে কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা। ভয়ংকর আর কুচ্ছিৎ তাদের দেখতে, দেখলে ভয় লাগে। তারপরে পুতুলগুলো হঠাৎ মানুষের মতো বেঁচে দাঁড়ায়, যারা তাদের নাচায় তাদের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়, ঝাঁপিয়ে পড়ে আর তাদের মুখোশগুলো খুলে পড়ে, তাদের চেনা যায়।" বলা বাহুল্য, এখানে ত্রিদিবেশ যে দিগন্তকে স্পষ্ট করেছে তা রাজনীতির সঙ্গে এক-সূত্রে বাঁধা। পুতুলগুলো ছবিতে হঠাৎ মানুষের মতো বেঁচে ওঠে না—বেঁচে ওঠে ত্রিদিবেশ, ইন্দ্রনাথ, সবিতাব্রত, মধুদির মতো রাজনৈতিক কর্মীর নিরন্তর সংগ্রামের জন্যে। এখানে রাজনীতি আর মানুষ একই মাত্রায় মূল্য পেয়ে যায়। পার্টিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। স্বার্থপরতাও পার্টিতে বিস্তৃত হতে পারে, কিন্তু এই পার্টিই ত্রিদিবেশকে একটা বিশেষ জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেয়। সমরেশ ত্রিদিবেশের পার্টিজীবন এবং শিল্পসাধনার যুগ্মবেণী রচনা করেন এইভাবে।

আগেও যেমন দেখেছি, এবারেও দেখব—ত্রিদিবেশের রাজনৈতিক জীবনে সংকট উপস্থিত হয়। রাজনৈতিক পট বদলে যায়। উপন্যাসে এর পরের এবং কিছু আগের ঘটনা সমরেশের 'স্বীকারোক্তি' বা 'মানুষ' গল্পের বিষয়ই অনুসৃত হয়েছে। ত্রিদিবেশের বন্ধু অনিল বলেছিল, আপনাকে (ত্রিদিবেশকে) রাশিয়ান বা চীনা শিল্পী হতে কেউ বলবে না, একজন ভারতীয় শিল্পী হতে হবে আপনাকে। একজন ভারতীয় কমিউনিসট শিল্পী। পার্টির নির্দেশে সেই অনিল আজ পার্টিবিদ্রোহী। ত্রিদিবেশ তাকে লুকিয়ে নিয়ে যায় নিরাপদ আশ্রয়ে। ত্রিদিবেশ পার্টির কাছে বিচারাধীন। এমনকি শিউলীও (এখন সে পার্টির কর্মী) ত্রিদিবেশকে মিথ্যা বলার জন্যে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ত্রিদিবেশ ইন্দ্রনাথকে বলে, "মনুষ্যত্বকে আমি জলাঞ্জলি দিতে পারি না। ইন্দ্রদা, আমার ভয় হয়, আমি বোধ হয় আমাদের এই বিপ্লবের থেকে মনুষ্যত্বকে বড় চোখে দেখছি।" ভ্রান্ত তলেংগানা নীতির শিকার হয়ে যায় সৎ, সাহসী কমিউনিসট।

কিছু কমিউনিসট সদস্যের চক্রান্তে ত্রিদিবেশ জেলে আসে। ত্রিদিবেশের আবার ছবি আঁকার প্রেরণা জাগে। সে ছবি আঁকে "একটি নগ্ন পুরুষ, শরীরের প্রতিটি পেশীতে একটা আকৃতি, কিন্তু মুখ গভীর, চিন্তামগ্ন।" ত্রিদিবেশের ভাষায় এই হল অমর মানুষ। যে মানুষ চিরদিনের বিদ্রোহী, আর বিপ্লবী—যে বিদ্রোহ আর বিপ্লব অন্তহীন। অন্যান্য কমরেডরা বাড়িয়ে দেয় ত্রিদিবেশের ছবি। এখানে সমরেশের বক্তব্য কী? তিনি যেন বলতে চান, বিদ্রোহী আর বিপ্লবীর কোনো বিশেষ পরিচয় নেই—না ধর্মীয়, না দলীয়, না জাতীয়। সেজন্য অমর মানুষ নগ্ন। নিরাবরণ নিরাভরণ রূপেই মানুষের শুদ্ধ রূপ। রাজনৈতিক খোলশটা পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জনের পথে তবে কি বাধা?

সমরেশ উপন্যাসটিতে দেশকালপাত্রকে যথাযথভাবে উপস্থিত করেছেন। রাজনৈতিক বাতাবরণ পরিস্ফুট করেছেন ভারত-ছাড়ো আন্দোলন, কমিউনিসট বন্দীদের মুক্তি, রাজ মন্ত্রিসভা, কমিউনিসট পার্টির সংভাষচন্দ্র, জনযুদ্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য, কংগ্রেসের মতাদর্শ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নানা চক্রান্ত, চিয়াং কাই-শেকের বিবরণ, কমিউনিসট পার্টির মতাদর্শ ইত্যাদির সংবাদ পরিবেশন করে। দুর্ভিক্ষ, জাপানি বিমানের আক্রমণ, মারকিন সৈন্যদের উপস্থিতি, নিষ্প্রদীপ কলকাতা এবং মফসল, এ. আর. পি.'র উপস্থিতি, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদির উল্লেখে উপন্যাসটির সময় সুদৃঢ় বাস্তব-ভূমির উপর স্থাপিত হয়েছে। প্রধানত কমিউনিসট পার্টির কার্যকলাপই এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে।

জনযুদ্ধের সমর্থক ইন্দ্রনাথ মারশাল ঝুকভের সাফল্যে উল্লসিত। একজন কমিউনিসটকে সহজেই আমরা চিনে নিতে পারি। দেশের দুর্ভিক্ষ নিয়েও ইন্দ্রনাথ পার্টির মতাদর্শকে প্রতিফলিত করে। শ' ওয়াল্লেশ এবং ইস্পাহানি কিভাবে সরকারের সাহায্যে দেশে মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষ ঘটায়, সমরেশ তাকে অনাবৃত করেছেন নানা মন্তব্যের দ্বারা। ইন্দ্রনাথ বলে, অনটন রাশিয়াতেও আছে। সে অনটনের কারণ শত্রুর খাদ্য লুটে করে নেওয়ার জন্যে, কৃষিকর্মের অভাবেও। কিন্তু আমাদের দেশের দুর্ভিক্ষ আমাদেরই দেশের মানুষের তৈরি। গর্জন করে ওঠে ইন্দ্রনাথ, "এদের আর দেশের শত্রুদের আমরাই শায়েস্তা করব।" অথচ এই মুহূর্তে এই শত্রুকে শায়েস্তা করতে পারে না ইন্দ্রনাথ পার্টির নীতির জন্যেই। কংগ্রেস নেতারা জেল থেকে ছাড়া পেলে কমিউনিসটদের যে প্রবল প্রতিরোধের সামনে আসতে হবে, সে বিষয়েও ইন্দ্রনাথ সচেতন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির চেহারা কী হবে, ইন্দ্রনাথের কাছে সেটাও বড়ো সমস্যা।

দুর্ভিক্ষের সময়ে ইন্দ্রনাথ পার্টির সদস্যদের নিয়ে সেবায় নেমে পড়ে।

উপন্যাসটির গোড়ার দিকেই মোহন এবং তার দাদা রমনের তর্কবিতর্কের অবতারণা করে সমরেশ কংগ্রেস আর কমিউনিসট মতাদর্শের পার্থক্যটি পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। জারমানি এবং রাশিয়ায় যুদ্ধ কেন জনযুদ্ধ হয়ে উঠল, সে বিষয়ে মোহন তার কথা বলে। কমিউনিসট শক্তিকে রুখতে হলে মিত্রবাহিনীকে সমর্থন করতেই হবে। লক্ষণীয়, কমিউনিসটরা কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করে নি এই উপন্যাসে। যুদ্ধ শেষ হলে নূতন করে যুদ্ধ করতে হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে—এই হল মোহনের মত। সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে কমিউনিসটদের বিরূপতার কথা কয়েকবারই উত্থাপিত হয়েছে এই উপন্যাসে। সমরেশ বসু উপন্যাস লিখছেন। অতএব এইসব বিপ্লবের, দলীয় কর্মের প্রকরণগত সমস্যা উত্থাপন করেও তিনি মানুষের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার প্রতি বেশি মনোযোগী হন। তিনি লক্ষ করেন কমিউনিসট সবিতা পন্ডিতের ক্ষোভ। সবিতা পন্ডিতের সামনেই কংগ্রেসি দয়ালের উপর পুলিশি নির্যাতন চলে—সবিতা পন্ডিতের মনে আগুন ধরে যায়। কিন্তু সে দেখতে পায় দয়ালকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে আর তাকে করে করুণা। মেদিনীপুরে ভারত-ছাড়ো আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশবাসীর সেই সংগ্রামের বৃত্তান্ত সবিতা পন্ডিতের চিত্ত স্পর্শ করে। সবিতা পন্ডিত হাতের মুঠোয় 'জনযুদ্ধ' কাগজ ছিঁড়ে ফেলে। ঘটনাটিকে সমরেশ সিমবলিক করে তুলতে চান। কমিউনিসটদের দ্বিধাদ্বন্দ্বকেও সমরেশ ফুটিয়ে তোলেন জনযুদ্ধ প্রসঙ্গে। সমরেশ অবশ্য জানেন—একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবেই জানেন—সদস্যদের পার্টির প্রতি আনুগত্য লৌহকঠিন। এর সুন্দর দৃষ্টান্ত মোহন। সে সবিতাব্রতর অন্যায় আচরণকে সমর্থন করতে পারে নি, জেলা কমিটিতে সব ব্যাপারটাই সে খুলে বলতে চায়। কিন্তু তার কলম কেঁপে যায় : অভিযোগ করতে গিয়ে সবিতাব্রতর আন্তরিকতা, সততাকে ভুলতে পারে না। বাঙালি মূল্যবোধে রেসখেলা গুরুতর অপরাধ। একজন কমিউনিসট সদস্য সবিতাব্রত রেস খেলে। মধ্যবিত্ত পার্টি-সদস্য রেস খেলছে, এ ঘটনা পার্টির দিক থেকেও অবমাননাকর। মোহন সবিতাব্রতকে সে কথা বলে। সবিতা বলে "এ পথের (রেসের) সঙ্গে পার্টির কোনো সম্পর্ক নেই, তবু তুমি বোধ হয় ঠিকই বলেছ। তোমার খারাপ লাগলে আমি ওসব করবো না।" সমরেশ বসুর চরিত্রাঙ্কনে দক্ষতা এখানে ফুটে উঠেছে। একজন সৎ কমিউনিসট সৎ হয়ে উঠতে চায়। বস্তুত, সবিতাব্রতর চরিত্রটি কমিউনিসট পার্টির সে সময়ের সদস্যদের চিনিয়ে দেয়। কেবল শেষ মুহূর্তে এই চরিত্রটি সম্বন্ধে সমরেশ যেন নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছেন। পাঠক সবিতাব্রতর কারখানার দরজায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতাকে ভুলতে পারে না, "ইয়ে দুনিয়াভর জনতা কা লড়াই মে জিতনে কে লিয়ে হমারা মাঙ হ্যায়, চটকলোঁ কে মালিক, তুম পুরা রেশন চালু করো..."। সবিতাব্রত গ্রামে-গ্রামে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলে। বিপিন, মোহন, তারাপদকে নিয়ে "কেকেড়া নাম বাতাও/জগমে বড়া লুটেরোয়া হো।" ছড়া কাটে সবিতাব্রত। আগুনে-পুড়ে-যাওয়া সুধীরের শোচনীয় মৃত্যুকে কেন্দ্র করে একটি সভার আয়োজন করে সবিতাব্রতরা। সুধীরকে কেন্দ্র করে দলীয় সদস্যদের উদারতা এবং সংকীর্ণতার চিত্র ফুটিয়ে তোলেন সমরেশ। ইতিহাসের সাক্ষ্যে বলতে পারি, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যখন জেলে তখন কমিউনিসট পার্টি কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন তৈরি করে রাজনৈতিক আন্দোলনের একটা সুস্পষ্ট চেহারা দেয় এই সময়ে। সমরেশ এখানে ইতিহাসকে স্পর্শ করেন।

সবিতাব্রতের আত্মীয় নিশিকান্ত কমিউনিসট। নিশিকান্ত ব্যারিসটার, বিলাতি গানবাজনায় অভ্যস্ত। বাড়ির পরিবেশেও বিলাতিয়ানা। নিশিকান্তর বাবা নরেন্দ্রনাথও বিলাত-ফেরত ব্যারিসটার। বিরাট সম্পত্তির মালিক তিনি। তিনি কংগ্রেসি। নরেন্দ্রনাথ একটু বেশিমাত্রায় উদারপন্থী। পুত্রের সঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শগত বিরোধ সত্ত্বেও তিনি নিশিকান্তকে কোনো কাজে বাধা দেন না। সমরেশ নির্ভুলভাবে ভারতীয় রাজনীতির চরিত্রও স্পর্শ করেন। ভারতীয় রাজনীতিতে পাশ্চাত্য রাজনীতির প্রবেশ প্রায় গোড়া থেকেই। কংগ্রেস, সোস্যালিসট, কমিউনিসট—সব দলেরই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকেই বিলাতফেরত। এবং প্রায়ই তাঁরা প্রথম সারির নেতা। আমরা পেয়ে যাই নরেন্দ্রনাথকে, নিশিকান্তকে। কমিউনিসট পার্টির সর্বহারার নেতৃত্ব দেয়। শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাসী এই দল। এখানে এই নেতৃবৃন্দের স্থান কোথায়? সমরেশের এটাও যেন একটা জিজ্ঞাসা। কেননা 'শেকল-ছেঁড়া হাতের খোঁজে' উপন্যাসে নাওয়ালের এঁদের সম্বন্ধে বিরূপতা সুস্পষ্ট, তার সমালোচনা কঠোর। কমিউনিসট বিপ্লবী লেনিনের এ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য আছে। তিনি বুদ্ধিজীবীর ভূমিকাকে কখনোই খাটো করে দেখেন নি। 'যুগ যুগ জীয়ে' উপন্যাসে সমরেশ তার দৃষ্টিকোণকে অবশ্য খুব তীক্ষ্ণ করে তোলেন নি।

তৃতীয় খন্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে দেখি, মুক্ত কংগ্রেস সদস্যরা কমিউনিসটদের প্রতি তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষ নিয়ে কংগ্রেসি যুবকরা ঝাঁপিয়ে পড়ে কমিউনিসটদের উপর। সবিতাব্রত, ইন্দ্রনাথ, মোহন মার খায়, আহত হয়। কমিউনিসটদের বেইমান লালঝান্ডাওয়ালা, বিশ্বাসঘাতক ইত্যাদি গালাগালিতে ভূষিত করে কংগ্রেস কর্মীরা। সমরেশ আহত কমিউনিসটদের এই অপমান ফুটিয়ে তোলেন ছোটো একটি দৃশ্যে।

ত্রিদিবেশ প্রসঙ্গেই উল্লেখ করেছি, সমরেশ কমিউনিসট পার্টির পরবর্তী ইতিহাস অল্প কথায় ব্যক্ত করেছেন। আমাদের মনে হয়েছে, উপন্যাসটি শেষ হতে পারত সেইখানে যেখানে ত্রিদিবেশ ছবি আঁকার বিষয় খুঁজে পায়। তার পরের ঘটনা আর-একটি উপন্যাসের বিষয়।

এই উপন্যাসে চন্দ্রনাথ-মালতী প্রসঙ্গ যথেষ্ট জায়গা নিয়েছে। আমাদের কাছে বোধগম্য হয় না ত্রিদিবেশ-কাহিনীর সঙ্গে এর সম্পর্কটি কোথায়। অথবা সাধুফুলবাসিয়া (ফুলবার্ষিয়া নামে প্রায় একই কাহিনী নিয়ে তিনি একটি ছোটোগল্পও লিখেছেন) কাহিনীটির সার্থকতা কী—এ বিষয়েও পাঠকের প্রশ্ন জাগতে পারে। চন্দ্রনাথের কর্মচারী রামচন্দ্র ভট্টাচার্যের রাজনীতি-বিশ্লেষণের অংশটি উপন্যাসের সঙ্গে শিথিলভাবে যুক্ত।

সমরেশ এই উপন্যাসে যে প্রশ্ন তুলেছেন তা কিন্তু গভীর-অর্থবহ। মানুষের হয়ে ওঠার পথে রাজনীতির ভূমিকা কী? উপন্যাসটির শেষে আমরা বুঝতে পারি, রাজনীতি মানুষের পূর্ণ মুক্তি এনে দিতে পারে না। হয়তো মধুদিই সত্য কথা বলেন—জীবন শিল্পের থেকে বড়ো। শিল্পীর লক্ষ্য হল সেই জীবনকে খোঁজা।

৪

The shark in Darjeeling will start a prairie and will certainly set the vast expanses of India ablaze. That a great storm of revolutionary armed struggle will eventually sweet across the length and breadth of India is certain. Liberation, November 1969.

We have failed many times in the past. We have to remove the reasons that were responsible for our failure in order to prepare for the revolution. Whither Revolution? Promade Sengupta, 1969.

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে নকশাল আন্দোলন একটি স্মরণীয় অধ্যায়। একদা এই আন্দোলনে পশ্চিম বাঙলা এবং ভারতের অন্যান্য স্থান চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। চারু মজুমদারের নেতৃত্বে বাঙলাদেশে প্রধানত কৃষক-বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনের সূচনা হয়। সশস্ত্র অভ্যুত্থান হয়েছিল বটে, কিন্তু আজ আমরা বুঝতে পারি এই অভ্যুত্থান ছিল বিক্ষিপ্ত। সমগ্র ভারতবাসীর চিত্তে এই লড়াই খুব বেশি উত্তেজনার সঞ্চার করতে পারে নি। নকশালপন্থীরাও সুগঠিত ছিল না। নকশাল নেতারাও প্রায় সকলে তাঁদের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু ভারতের রাজনীতির ধারাবাহিকতা লক্ষ করলে দেখা যাবে, যদিও কংগ্রেসি রাজনীতিরই সাফল্য এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট, তথাপি সশস্ত্র বিপ্লবপন্থা কখনই একেবারে বর্জিত হয় নি। দেশেবিদেশে স্বাধীনতার জন্য উনিশ শতকের গোড়া থেকেই বিপ্লবীদের প্রয়াস, সুভাষ চন্দ্রের সংগ্রাম, তেলেঙ্গানা-কাকদ্বীপের লড়াই, এবং পরিশেষে, নকশাল আন্দোলন এইটিই প্রমাণ করে। একথা মানতেই হবে যে, নকশাল এবং বিপ্লবীদের আন্দোলন ব্যর্থ হলেও বামপন্থী মতাদর্শের ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। নকশালপন্থীরা মার্কসবাদে বিশ্বাসী। চীনের সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা তাঁরা অনুপ্রাণিত ছিলেন। বহু তরুণ বুদ্ধিজীবী এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সমরেশ সেই আন্দোলনের একটি অধ্যায়কে স্পর্শ করতে চেয়েছেন 'মহাকালের রথের ঘোড়া' উপন্যাসে।

এই উপন্যাসের নায়ক রুহিতন কুরমি। উত্তরবাঙলার তরাই অঞ্চলের ভূমিহীন কৃষক। নকশাল আন্দোলনের অন্যতম যোদ্ধা। তার নাম প্রবাদের পর্যায়ে উন্নীত। পুলিশ অফিসার বলে, "এই হলো রুহিতন কুরমি। এমনি এমনি কি আর এই লোককে সবাই তরাইয়ের ভয়ংকর দাঁতাল বলে?" আন্দোলন করতে গিয়ে রুহিতন ধরা পড়ে। নিদারুণ পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয় সে। উত্তরবাঙলার জেল থেকে তাকে হাতেপায়ে ডান্ডাবেড়ি দিয়ে কলকাতার জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রুহিতন জানে না তার সব প্রিয় নেতারা জেলে বন্দী। আন্দোলনের ব্যর্থতা সম্বন্ধেও সে কোনো সংবাদ পায় নি। সমরেশ রুহিতনের এক জেল থেকে অন্য জেলে স্থানান্তরের সময় পুলিশি সতর্কতার বিবরণ বিস্তারিতভাবে দিয়েছেন। রাত্রির অন্ধকারে তরাইয়ের নির্জন এক জঙ্গলভূমি ভেদ করে রুহিতনের জীপ যখন এগিয়ে যায় তখন রুহিতনের শারীরিক নির্যাতনে ভেঙেপড়া মনটিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। রুহিতনের স্মৃতিরোমন্থন কিছু অতীত ঘটনাকে চকিত করে। পাঠক নির্যাতিত রুহিতনের প্রতি সমবেদনায় একাত্ম হয়।

সমরেশ নকশাল আন্দোলনের প্রত্যক্ষ চিত্র খুব সামান্যই দিয়েছেন। উপন্যাসটিকে তিনি এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যে সেখানে প্রত্যক্ষ আন্দোলনের অবতারণার অবকাশ কম। উপন্যাসটির বিষয় নকশাল আন্দোলনের সাত বছর পরের। ১৯৭৭ সালে নকশাল আন্দোলন স্তিমিত। কেউ-কেউ দলছুট হয়ে গেছেন। এখন পোসটমর্টেম বিবরণ যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখি নকশাল আন্দোলনের সময়েই এই আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে নকশাল নেতাদের মধ্যেই কারো কারো সন্দেহ ছিল। প্রমোদ সেনগুপ্তের কপালটুকি উদ্ধৃতিটিই তা প্রমাণ করে। সমরেশ বসুও পোসটমর্টেম করছেন—একজন ঔপন্যাসিক যেভাবে করেন। নকশাল নেতাদের কেউ-কেউ বন্দুকের পথ যে ভুল পথ, তা স্বীকার করেছেন। কেউ-কেউ সংসদীয় গণতন্ত্রের (রুহিতনের ভাষায় গর্তের শিয়াল) পথকে বেছে নিয়েছেন। সমরেশ যথাসাধ্য অতীতচারণের সাহায্যে এই আন্দোলনের চরিত্র বুঝতে চেষ্টা করেছেন। সে স্মৃতিচারণ পাঠকের চিত্তে উত্তেজনার সৃষ্টি করে না। যতদূর বুঝি, সমরেশের অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের চিত্র ধরা পড়েছে কম। সমরেশ যেন মাঝে-মাঝে রেনজ-এর বাইরে পা ফেলতে চেয়েছেন।

নকশাল কর্মীরা দলবদ্ধ হয়েছিল মুখ্যত মধ্যবিত্ত নেতাদের তাত্ত্বিক মতবাদে। দীনু বাগচীর পুত্র দিবা বাগচী এইরকম একজন নেতা। দীনু বাগচী জোতদার। কিন্তু দিবা বাগচী এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। দিবা বাগচী শ্রেণীসংগ্রামের রূপটি দলীয় সভ্যদের কাছে তুলে ধরেছিল। বাপের জোতজমির সঙ্গে দিবা বাগচী কোনো সম্বন্ধ রাখে নি। এমন-কি সে বাপের "তাবত জমিন তো সে (দিবা) কোরফা রায়ত আর আধিয়ারদের বিলি বাঁটোয়ারা করে দিচ্ছিল।" দিবার বাপ দীনু অবশ্য পরে আধিয়ারদের পিটিয়ে মেরেছিল। সেই সময়েও দিবা বাপের পক্ষ নেয় নি। রুহিতন কুরমি যখন জেলে খেলু চৌধুরীর দিবা-নিন্দা শোনে তখন সে বুঝতে পারে না দিবা কী করে দেশের নকশাল আন্দোলনের শত্রু হয়ে যায়? রুহিতনের এই জিজ্ঞাসাকে সমরেশ স্পষ্ট করেছেন। রাজনীতির মুহুর্মুহু পরিবর্তনের গোলকধাঁধায় রুহিতন অসহায় বোধ করে। দিবার জন্যে রুহিতনের চিত্ত ব্যাকুল হয়। "রুহিতন মনে মনে বিভ্রান্ত হলেও স্থির বুঝেছিল তাদের সেই জগতের নানান জায়গায় ভাঙচুর ফাটল ধরেছে। নিজেদের মধ্যে ঘৃণা আর রাগ, সেই প্রথম জানতে পেরেছিল। বড় যন্ত্রণা বোধ হয়েছিল তার। শ্রেণীশত্রু কাকে বলে? কাদের? খেলুবাবুর বাবার তো অনেক চা-বাগানের মোটা শেয়ার আছে। এইসব তরুণ কমরেডদের কার কী আছে, সে জানে না। পার্টিকে ভুল পথে চালানো? আগে কেউ বুঝতে পারে নি? নাকি দিবাবাবুর নেতৃত্ব সফল হয়নি বলে, আজ তার মড়া নিয়ে টানাটানি?" কিন্তু প্রাণ থাকতে সে দিবা বাগচীকে শ্রেণীশত্রু ভাবতে পারবে না। সে তার ফ্যাসফেসে করুণ স্বরে বলেছিল, "কিন্তু খেলুবাবু, দিবাবাবু আমাদের নেতা ছিল। তার জন্যে আমার মন চিরকাল পুড়বে হে, মিথ্যা বলবো না।" আমরা বুঝে নিই রুহিতনের মধ্যে ঠিক অন্তর্দ্বন্দ্ব না জাগলেও প্রশ্ন জেগেছে। অতএব সমরেশ অন্তর্দ্বন্দ্বকে পরিস্ফুট করার কথা ভাবেন না। তিনি কোনো রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণও করেন নি। রুহিতন কুরমির এই ক্ষেত্রে একটা সংকট উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এবং এই সংকটের মধ্য দিয়েই সে নূতন পথের সন্ধান পেয়ে যেতে পারত। গান্ধীজীর প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে এসেছে। আমরা তো জানি, গান্ধীজীও চৌরিচৌরার পর তাঁর বারদৌলি আন্দোলন সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু আমরা দেখি, রুহিতন সেই সংকটের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে না। অবশ্য সেও জ্বলছে। কিন্তু সেই জ্বলুনি এক ধরনের বিকার মাত্র। সমরেশ রুহিতনের কুষ্ঠরোগের প্রতি পাঠককে মনোযোগী হতে বলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে রুহিতনকে তিনি সরিয়ে দেন। খেলু চৌধুরী যখন রুহিতনের সম্বন্ধে বেশ্যাগমনের অভিযোগ তোলেন তখন রুহিতনের প্রতিবাদ ছিল। কিন্তু সেখানেও তার কৈশোরকের স্মৃতিরোমন্থন রুহিতনকে একজাতীয় ঔদাসীন্যে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছিল।

জেলেই রুহিতনের গায়ে ক্ষত এবং নাকমুখঠোঁটের বিকৃতি স্পষ্টভাবে সকলে দেখতে পেয়েছিল। রোগনির্ণয়ের আগে সবাই ধরে নিয়েছিল রুহিতনকে দুরারোগ্য যৌনরোগ আক্রমণ করেছে। সকলে বলতে থাকে রুহিতনের শুধু খাঁকড়ি (নরম বা মেয়ে কাঁকড়া) রোগ। রুহিতন ভেবে পায় না এই রোগ কোথা থেকে এল? বয়ঃসন্ধিকালে সে টেঁপাড়ির সঙ্গে প্রেম-প্রেম খেলা করেছে। টেঁপাড়ির ছিল দাদ। কিন্তু কুষ্ঠ তো ছিল না। রুহিতনের মনে পড়ে যায়, টেঁপাড়ি ছিল ঝরনার মতো। মঙ্গলার সঙ্গে যখন তার বিয়ে হল রুহিতন তখন যথার্থ 'মণি'র সন্ধান পেয়েছে। মঙ্গলাকে ঘিরে তার প্রেম ঘন হয়ে এসেছিল। রুহিতনের চাঞ্চল্য তখন চলে গিয়েছিল। অথচ এখন ভুলতে পারছে না তার নেতা তাকে ঘৃণা করছে। রুহিতন জেলের এমন একটা জায়গায় তখন বিচরণ করছিল যেখানে বন্দী মহাত্মা গান্ধী প্রার্থনা করতেন। যিনি কুষ্ঠরোগীকে সেবা করেছেন। রুহিতনের মনে প্রশ্ন, "সেই মানুষটির মতো কোনো প্রার্থনা রুহিতনের জানা নেই। প্রার্থনা করলে কি হয়? পরাধীনরা স্বাধীন হয়? ভূমিহীন ভূমি পায়? জনমজুরে রাজ্য চালায়? প্রাণের এই যে যন্ত্রণা, দুঃখে অপমানে পুড়ে যাচ্ছে, এর কি উপশম হয়?" এসব প্রশ্নে রুহিতন ভেঙে পড়ে। রুহিতনের লড়াই ছিল ভূমিহীনের ভূমি পাবার। মহাত্মা গান্ধীর ট্র্যাজিক মৃত্যুর পরও সে প্রত্যাশা পূরণ হয় নি। অন্তত রুহিতনের নয়। রুহিতন তার সংগ্রামের ব্যর্থতা অনুভব করে। তার সামনে বিরাট একটা শূন্যতা।

আমরা দেখতে পাই, সমরেশ রাজনৈতিক চিত্রটিকে চালচিত্র করে রুহিতনের কুষ্ঠব্যাধির গ্লানিকর জীবনের হতাশাকেই মুখ্য করে তুললেন। রুহিতনই এই উপন্যাসের নায়ক। কবে কখন সে রাজনৈতিক জীবনে এসেছিল সেকথা স্পষ্ট করে বলা নেই উপন্যাসে। দিবা বাগচীর কাছে সে দীক্ষিত। লড়াইয়ের জীবনে সে এসেছিল। দেশ স্বাধীন হবার পরও দিবা বাগচী দু-বছর জেল খেটেছিল। ধরে নিলে রুহিতন তার পরেই কমিউনিসট পার্টির সভ্য হয়। কমিউনিসটদের একটা অংশ যখন নকশালপন্থা গ্রহণ করে, রুহিতনও তখন নকশাল আন্দোলনে যোগ দেয়। "তার লড়াই তো কেবল নিজের জীবনকে পণ করে না। তার সমস্ত কিছুকে পণ করে, সবাইকে পণ করে।" রুহিতন কলকাতায় কৃষক-মজুর মিছিলে এসেছিল। মনুমেনটের নীচে সভায়ও গিয়েছিল। কমিউনিসট পার্টির এই সময়ের ক্যাডারদের সম্পর্কে ঘোর উদাসীনতার কাহিনী সমরেশ শুনিয়েছেন। সমরেশ যেন ডকুমেনটারি ছবি তুলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ফিরে যাবার সময় অভুক্ত কৃষকদের মর্মান্তিক অবস্থা। অবশ্য কৃষকরা তাৎক্ষণিক অভিনন্দনও কুড়িয়েছিল বহু মানুষের। কিন্তু এ যেন 'দ্য পেট্রিয়ট'-এর অবস্থা। আসার সময় গোলাপমাড়ানো পথ। যাবার সময় ফাটক। সমরেশের রাজনৈতিক নায়করা সকলেই ব্রাউনিং-এর স্বদেশপ্রেমিকটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

রুহিতনের বাপ পশুপতি কুরমি ছিল চাবাগানের মজুর। পশুপতির ভেতরে ছিল জমির টান। জমির টানেই কাজ ছেড়ে দিয়ে সে কৃষক বনে গিয়েছিল। একফালি জমি "একজন কুরমির আদিম পিপাসা"। কিন্তু জমিতেও শোষণ। চৌধুরীরা খাজনা আদায় করে, জমির ভাগবাঁটোয়ারায় নাক গলায় আর সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে প্রজাশাসনে উৎসাহিত হয়। প্রজারা চৌধুরীদের নামে তেড়ে আসা পাগলা হাতির ভয়ে ভীত হয়। "জোতদার আর টিক্‌কাদারদের হাতের লোক মন্ডল, যারা আধিয়ারদের, কুকুরের গায়ে লেগে থাকা, রক্তচোষা এঁটুলির থেকেও খারাপ।" এই অভিজ্ঞতা নিয়েই রুহিতনের জীবনের শুরু। অত্যাচারিত কৃষক দিবা বাগচীর শ্লোগানে মুগ্ধ হয়। শ্লোগান ছিল "গ্রাম দিয়ে

শহর ঘিরতে হবে। শহরকে গ্রামের কবজায় ঘিরতে হবে। কলকাতায় জমায়েত না। দক্ষিণের যাবৎ শহর ঘিরতে ঘিরতে, কলকাতাকেও গ্রাম দিয়ে ঘিরতে হবে।" এই উত্তেজনায় রুহিতন কুরমি যখন যোগ দেয় তখন তার চোখে স্বপ্ন। পুলিশের চোখে সে হয়ে উঠেছিল ডেন-জারাস। জীপে শুয়ে থেকে আজ রুহিতন দেখছে একটা লালচে সাপ—রক্তহীন কাঁচা মাংসের মতো গায়ে যার লাল চাকা-চাকা দাগ। সমরেশ সাপটাকে কিসের প্রতীক করতে চেয়েছেন। কুষ্ঠরোগীর বিকার না সমগ্র নকশাল আন্দোলনের চিত্র?

রুহিতনের গায়ে চাকা-চাকা দাগ আর সাপের চাকা-চাকা দাগের সম্পর্ক কী? আপাতত একটার সঙ্গে আর-একটার কোনো বিরোধ নেই, অনিবার্য সম্পর্কও নেই। রুহিতন যখন তার বন্ধু বড়কাকে শ্রেণীশত্রু বলে মেরে ফেলেছিল সেই মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল, "বড়কা বন্ধু ছিল? হ্যাঁ বন্ধু ছিল। তারপরে শত্রু। জীবন তো এইরকমই। সকল জীবের যদি নিজের ধর্ম থাকে, তবে ভূমিহীন কৃষক রুহিতন কুরমিরও একটা ধর্ম আছে। সেই ধর্মের কাছে শত্রুর একটাই মাত্র বিচার। মরো, না হয় মারো।"

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ থেকেই এই বৈপ্লবিক রাজনীতির আদর্শ গৃহীত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র সে বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত মন্থরশান্ত করেছেন, সমরেশ তা করেন নি। করা সম্ভবও নয়। তিনি অন্য কালের মানুষ। তিনি রুহিতনের পরবর্তী স্তরে চলে আসেন অনায়াসে। আধুনিক কালের সাংবাদিকদের বর্ণনাকে অনুসরণ করে। রুহিতন কুরমি যখন তার নিজের বাড়িতে ফিরে এল তখন সে একা, নিঃসঙ্গ। তাকে পার্টির কর্মীরা বলে, "তুমি হলে রুহিতন কুরমি। সরকার তোমার ওপর অবিচার করতে পারে না।...সরকারি ব্যবুদেরও নজর রাখতে বলা হয়েছে, যেন তোমার পরিবারের কোনো ক্ষতি না হয়।" নকশাল বিপ্লবী এতে কি সান্ত্বনা পায়? রুহিতন দেখে দিল্লী থেকে মন্ত্রী আসবেন বলে তার পত্নি সম্বর্ধনার কাজে ব্যস্ত। স্ত্রী মণ্ডলাও ভাতেকাপড়ে সুখী। কিন্তু রুহিতন কুষ্ঠরোগ নিয়ে একা। স্ত্রী-ও তাকে দূরে সরিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, রুহিতন এ জীবন মেনে নিতে পারে না।

বিপ্লবের সময়ে সে একটা বন্দুক লুকিয়ে রেখে-ছিল টিলার জঙ্গলে। গভীর রাত্রে রুহিতন একা বেরিয়ে পড়ে। বন্দুক খুঁজে পায়। ট্রিগার টিপল। শব্দও হল। অশক্ত রুহিতন "আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল। বন্দুকটা রইলো তার বুকের পাশে মাটিতে। কাত হয়ে মাথাটা রাখলো জোড়া ব্যারেলের ওপর। পুচ্ছহীন লাল চোখের পাতা বুজে এলো। তার মনে এখন একটিমাত্র সান্ত্বনা, সে অপমান আর অভিশপ্ত আশ্রয় থেকে নিজের যথার্থ জায়গায় ফিরে এসেছে, সে বুঝতে পারছে গভীর ঘুম আসছে তার।"

রুহিতনের এই পরিণতি করুণ। সমগ্র নকশাল আন্দোলনের এই কারুণ্য আমাদের স্তম্ভিত করে। একটা প্রশ্ন জাগিয়ে তোলেন সমরেশ এই উপন্যাসে; আমাদের তিনি বিব্রত, বিপর্যস্ত করেছেন। সেটি হল, নকশাল আন্দোলনের নেতা খেলু চৌধুরী রুহিতন কুরমিকে ঘৃণা করবেন কেন? নকশাল নেতারা জেলের মধ্যেই আত্মসমালোচনা করছিলেন। বিভিন্ন গোষ্ঠীরও অভ্যুদয় ঘটেছিল সেই সময়। রাজনৈতিক চিন্তাধারা নানা খাতে বইছে তখন। খেলু চৌধুরী রুহিতনকে বীরের সংবর্ধনা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সহ্য করতে পারেন নি রুহিতনের দিবা বাগচীর প্রতি আনুগত্যকে। খেলু চৌধুরীর কাছে দিবা জোতদারের সন্তান। রুহিতন মানতে পারে না। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে আসছে রুহিতন। কিন্তু খেলু চৌধুরীর ঘৃণাপ্রকাশ বেমানান।

গান্ধীজীর প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে এসেছে। নকশাল রাজনীতিতে গান্ধীবাদের স্থান নেই। বাল্যকাল থেকেই রুহিতন গান্ধীজীর নাম শুনে এসেছে। পরে গান্ধীর পথ সে পরিত্যাগ করে। গান্ধীজীর শত্রু হয়ে ওঠে রুহিতন। কিন্তু গান্ধীজীর প্রদত্ত অহিংসা এবং অন-শনের পথ কখনও-কখনও রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে রুহিতনরাও ব্যবহার করেছে। সমরেশ যেন রাজনৈতিক প্রকরণ এবং আদর্শক বুঝে নিতে চাইছেন এখানে। তিনি আভাসে-ইঙ্গিতে গান্ধীজীর পথের অমোঘ দিকটি নির্দেশ করতে চান। অথবা সমরেশ নিজেও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছেন না। বস্তুত, রাজনৈতিক অস্থিরতার এটা একটা দিক। সমরেশ বড়ো কাছের ঘটনাকে উপন্যাসের বিষয় করেছেন। এমন-কি রুহিতনের চরিত্রের অনুরূপ কোনো পরিচিত নকশাল নেতার কথাও

আমাদের মনে ভেসে ওঠে। অতিনিকট ঘটনাকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখাও সম্ভব হয় না সব সময়। শিল্পীর দূরত্বের কথা তো ছেড়েই দিলাম। সমরেশ লক্ষ করেন রাজনীতির হঠকারিতায় মানুষ পিষ্ট হচ্ছে। রুহিতন ধরা পড়ে তার নিজেরই দলীয় কর্মীর বিশ্বাসঘাতকতায়। ত্রিদিবেশও ধরা পড়েছিল দলের ষড়যন্ত্রে। রাজনীতি মানুষকে যান্ত্রিক করে তোলে। রাজনীতি যাঁরা করেন তাঁদেরও সামাজিক এবং পারিবারিক বন্ধন থাকা স্বাভাবিক। অতএব রাজনীতির সঙ্গে স্নেহমমতার টানা-পোড়েন থাকেই। কিন্তু সমরেশ দেখান, একালের রাজ-নীতি এই স্নেহমমতাকে দলিত করে। মানুষকে মত-বাদের বাহন করে তোলে। জেলের বন্দীরা যখন রুহিতনের কাছ থেকে লড়াইয়ের সংবাদ শুনতে চায় তখন রুহিতনের মনে পড়ে যায় ছেলে বুধুয়া আর করমার কথা। রুহিতনের "মনের মধ্যে এখন একটা যন্ত্রণাবিদ্ধ অনুতাপ। ছেলেদের কথা তার মনে পড়ে গেল কেন? আজকাল প্রায়ই এরকম ঘটে।...সে রুহিতন কুরমি। এসব দুর্বলতা তার কেন থাকবে? জীবনের সব কিছু পণ রেখে যার লড়াই, তার কি কোনো অতীত থাকে? অথবা স্মৃতি?" এমন কোনো অনিবার্যতাকে সে মেনে নিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়ের অতীনের মধ্যেও পূর্বস্মৃতি জেগেছিল। বস্তুত অতীন তো তার ছায়াটাকেই (রাজনীতিপূর্ব জীবন) বেশি ভয় পেত।

কিন্তু এ ভাবনায় একটা ফাঁক থেকে যায়। রাজ-নীতির সঙ্গে সমাজ আর পরিবারের কোনো জল-অচল সম্বন্ধ নেই। রাজনীতি বিচ্ছিন্ন নিরালম্ব বেনো ব্যাপার নয়। গোপাল হালদারের বক্তব্য এখানে স্মরণ করি। তিনি বলেছেন, "জীবনকে যাঁরা সমগ্র করে দেখতে চান, পেতে চান...রাজনীতিকে তাঁদের ছেঁটে ফেলে দিলে চলে না। আর রাজনীতিকেও যাঁরা সমগ্র করে পেতে চান তাঁরাও একালে জানেন, জীবনের সমগ্রতার সঙ্গে মিলিয়ে তা গ্রহণ না করলে রাজনীতিও হয় অচল, অনর্থের কারণ। কারণ, রাজনীতি হচ্ছে সমাজের রূপায়নবিদ্যা, তার জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ।" [বাংলা সাহিত্য ও মানব-স্বীকৃতি, 'বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস'।] নকশালপন্থী-দের অনেকেই এখন মনে করেন তাঁরা দেশের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন নি। দেশবাসী থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। সমরেশ বসুর রুহিতন কুরমিও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তার রাজনীতির জন্যে নয়, কুষ্ঠরোগের জন্য। এই কারণে রুহিতন রাজনৈতিক উপন্যাসের নায়ক হয়ে উঠতে পারে নি। [পুলিশ কিছু নকশাল বন্দীদের কুষ্ঠরোগীদের সঙ্গে রেখেছিল। রুহিতনের কুষ্ঠরোগ হওয়া বিচিত্র নয়।]

১৯৭৪ সালে প্রকাশিত সমরেশ বসুর 'মানুষ শক্তির উৎস' উপন্যাসেও বিপ্লবী সজলের শোচনীয় পরিণামের দিকটি উদ্ঘাটিত হয়েছে। সজল পার্টির সমালোচনা করেছিল। বলা বাহুল্য, এর ফলে তার মৃত্যুদণ্ড হল। এই উপন্যাসটি যমুনার আত্মকথা। মুখ্যত যমুনা-সজলের প্রেমোপাখ্যান উপন্যাসটি। একালের বাঙলা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতিকথা, আত্মকথা ইত্যাদির প্রাচুর্য। সাহিত্যে সাংবাদিকতার প্রবেশও দুর্লক্ষ্য নয়। সমরেশ একালে উপন্যাস রচনায় সেইরকমই একটি শৈলী গ্রহণ করলেন। উপন্যাসটি কতকগুলি দৃশ্যের প্রদর্শনী। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় উপন্যাসটি লাফিয়ে-লাফিয়ে অগ্রসর হয়েছে। সজলের ইংরেজি- এবং রবীন্দ্র-সংগীতপ্রীতি, টুইস্ট নাচ এবং কিণ্ডিৎ মদ্যপানের পর বিপ্লবী পার্টিতে যোগদান ও নিহত হওয়ার সংবাদ পরিবেশনে স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব রচনাটির দুর্বলতা। যমুনা এবং সজলের রাজনীতি এবং মনুষ্যমহিমার বিচার স্বাভাবিক বলে মনে হয় না।

৫

How will you reveal the true character of parliament to the really backward masses, who are deceived by the bourgeoisie? How will you expose the various parties, if you are not in parliament, if you remain outside parliament? Lenin, Collected Works, Vol. 31.

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিসট পার্টির ভূমিকা ব্যাপক এবং গভীর। শ্রমিকসংগঠনের মধ্য দিয়ে শ্রমিক-দের দাবি আদায়ের ইতিহাস রক্তাক্ত। শ্রমিক-আন্দোলন যতই এগিয়ে গেছে ততই কমিউনিসট পার্টির পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক এবং গভীর হয়েছে। কৃষক-আন্দোলনও নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে কৃষক-

আন্দোলনের বিবরণ উল্লেখযোগ্য নয়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পাবার আগে থেকেই এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আট ঘন্টা কাজের দাবি আদায় হয়েছিল। বলা বাহুল্য, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের কলকারখানায় সে দাবি আদায় করা সহজসাধ্য ছিল না। শ্রমিকরা লড়াই করে সে দাবি আদায় করেছে।

এইরকম লড়াইয়ের সৈনিক ছিল নাওয়াল। জন্মেই হাতে শেকল পরেছে। আর বারবার শেকল ছিঁড়তে গিয়ে নাওয়াল মিলমালিকদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছে, জেলে গিয়েছে। কিন্তু সে খুঁজতে চেষ্টা করেছে শেকল-ছেঁড়া হাত। কোনো আন্দোলনই একক অথবা বিচ্ছিন্ন হলে সফল হতে পারে না। তার জন্যে চাই সংগঠন। এই সংগঠনের নেতৃত্ব দেয় পার্টি। আর তা চালায় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী। সমরেশ বসু এই বুদ্ধিজীবীর ভূমিকাও বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন এই উপন্যাসে। কমিউনিস্ট পার্টির ঐতিহাসিক সংগ্রামের বিবরণ সমরেশ বিস্তৃত-ভাবে উদ্ধার করেছেন নাওয়ালের স্বগতভাষণের মধ্যে।

সমরেশ বসু উপন্যাসে ফ্ল্যাশব্যাক রচনাশৈলী প্রয়োগ করেছেন। নাওয়ালের স্মৃতির পটে অতীতের চিত্রগুলি ভেসে উঠছে। নাওয়ালের বাপ লছমন, লছমনের বাপ রামদাস—সকলেই লোহাকাটা মজুর। মজুরের জীবনের বেঁচে থাকার বিচিত্র ইতিহাস এই উপন্যাসে উদ্ঘাটিত। কনট্রাকটরের অধীনে মজুররা কারখানায় কাজ পেত। কনট্রাকটর ছিল মজুরের মা-বাপ। বলা বাহুল্য, এই কাজের মধ্য দিয়েই অর্থনৈতিক সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছিল। কনট্রাকটর যেদিন মজুরি থেকে দু-পয়সা কেটে নেবার কথা ঘোষণা করে, সেদিন লছমন বাধা দিয়েছিল। বাধার প্রত্যুত্তরও সে পেয়েছিল—অপমান আর লাঞ্ছনা। অপমানিত আর লাঞ্ছিত মজুররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করেছিল। মজুর আবদুলের বক্তব্য, "আমরা কোনো অন্যায় করি নি। আমাদের মনে কোনো পাপ নেই। পাপীরাই ভয় পায়। আমরা ভয় পাই না। আর আইন-কানুন? আমরা গায়ের কানুনি কোনো কাজ করি নি। পুলিশ কেন আমাদের মারপিট করবে? জেলে পুরবে? ঠিকাদারবাবু পয়সা কাটাই করে অন্যায় করেছে। পুলিশ আমাদের মারপিট করলে, জেলে পুরলে, তারা নিজেরাই গায়ের কানুনি কাজ করবে। তা বলে আমরা তো চলে যেতে পারি না।" ঠিকাদারবাবু ইংরেজ মালিকদের সঙ্গে পরামর্শ করেছিল। সে মজুরদের সম্মিলিত শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে নিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। অবশ্য এখানে লড়াইয়ের কৌশলটাও সমরেশবাবু ধরিয়ে দিয়েছেন পাঠকদের। ঠিকাদারি ব্যবস্থায় কোমপানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কোমপানি মজুরদের ওপর প্রত্যক্ষ আধিপত্য চাইছিল। স্মৃতিচারণায় এখানে নাওয়াল থামল। বাপ একদিন লড়াইয়ে জিতেছিল। সে লড়াই নাওয়াল দেখেছে। তার রক্তেও সেই লড়াই জ্বালা ধরিয়েছিল। সেও লড়াকু হয়েছিল। কিন্তু আজ "জানলার ওপর দেওয়ালে হিন্দিতে লেখা লাল অক্ষরের কথাগুলোর ওপর তার নজর আটকে গেল। "হে সর্বহারা মজুর! হাতের শৃঙ্খলমোচন ছাড়া তোমার আর হারাবার কিছু নেই"।' বাপ সর্বহারা লছমনের জন্যে নাওয়ালের দীর্ঘশ্বাস কেন? পার্টির যে মন্ত্রে নাওয়াল দীক্ষিত—যে মন্ত্র সে এইমাত্র পড়ল—সেখান থেকে আজ সে চ্যুত। সমরেশ নাওয়ালের স্মৃতিচারণায় এই দীর্ঘশ্বাসটুকু জুড়ে দেন। নাওয়াল কেবল স্মৃতিচারণাই করছে না—এ এক রকমের আত্মসমীক্ষাও বটে। আসলে দু-পয়সার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের একটা দিকের বীজ বপন করেছিল তো লছমন আগরিয়া। সে বীজ থেকে গাছ হয়ে জন্মেছিল নাওয়াল আগরিয়া। এখন সে বিধ্বস্ত গাছ। বিধ্বস্ত গাছের সবুজ সতেজ অবস্থার কথা মনে পড়ে যায়। পার্টির বড়ো তাত্ত্বিক নেতা বিনোদ সেনের ঢোলের আওয়াজে। লড়াকু পার্টি এখন সংসদীয় গণতন্ত্র মেনে নিয়েছে। নির্বাচনে জেতার কৌশল নিয়ে পার্টি ভাবনা করে। বিনোদ সেন নাওয়ালকে জানায় মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলে নির্বাচনী প্রচারের জন্যে নাওয়ালের যেতে হবে না। কেননা মহম্মদ ইউনিস সকালের ফ্লাইটে এসে যাচ্ছে। মুসলমান অঞ্চলে পার্টির মুসলমান সদস্য প্রচার চালালেই নির্বাচনে জেতার সম্ভাবনা। এই সূত্রে নাওয়ালের স্মৃতিচারণায় বিশ্লেষিত হচ্ছে বর্তমান পার্টির চেহারাটা। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা বর্জন করলেও নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক কৌশলই পার্টিকে গ্রহণ করতে হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, পার্টির মতাদর্শগত লড়াইয়ে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর প্রয়োজন। যদিও পার্টি কিষাণ-মজুরের, তথাপি তাত্ত্বিক নেতার প্রয়োজনে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর অনুপ্রবেশ ঘটে। বিনোদ সেন এককালের অধ্যাপক, এখন পার্টির প্রথম সারির নেতা। ইউনিসের বাবা বিধান-

সভার সদস্য। তিনি হজ করেছেন। তিনি আইনজীবী। তাঁর মক্কেল সব মুসলমান। "ইউনিস নট ওনলি মুসলিম। হি ইজ ইয়ং পার্টি লিডার।" হাজি সাহেবের প্রচুর বিত্ত। তিনি পার্টির মেমবর নন, কিন্তু সিমপ্যাথাইজার। নাওয়াল এখন প্রায় বাতিলের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু এককালে নাওয়াল "আনসোফিসিকেটেড রাইট রোনক কালার লায়ন ফিগার।" বঙ্কিম মুখার্জি ও মুজফফর আহমেদের সঙ্গে ফটো তুলেছে নাওয়াল। কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান রূপটি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পার্টিতে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর খাতির, সাম্প্রদায়িক নীতিকে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পার্টি অকুণ্ঠিত এবং ইউনিসের সকাল বেলার ফ্লাইটে চলে আসবার সংবাদে বুঝি, পার্টির সদস্যরা কিছুটা বিলাসপ্রিয়। বর্ধমানের সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের ছেলের সঙ্গে সর্বহারা নাওয়াল আগরিয়া একই মাত্রায় উচ্চারিত হতে পারে না। ইউনিস বিলেতফেরত বুদ্ধিজীবী। এখন এম. পি-। ইউনিসকেও লড়াকু মজুর বলা হয়। নাওয়ালের ভাষায় সেটা হল আদরের সম্ভাষণ। নাওয়ালের পার্টি-সমালোচনা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে : "সারা হিন্দুস্থানের পার্টিই কি জানে না, লড়াকু মজদুরের জমানা আর নেই। এখন নতুন জমানা এসেছে। এখন বিনোদ সেনদের জমানা। ওপরওলা থেকে নীচুতলা পর্যন্ত, সবখানে তারা।" অথচ এক সময়ে পার্টির নীতি ছিল অন্যরকম : "মজুর কিষাণ সর্বহারাদের মধ্যে পার্টিকে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। আর তাদের পরিষ্কার বুঝিয়ে দেবার আন্তরিক সাফল্য, এ পার্টি তোমাদের। এ পার্টির নেতৃত্ব তোমাদের হাতে। তোমরা এগিয়ে এসো। নিজের পতাকা তুলে নাও। শ্রেণীসংগ্রামের পথে এগিয়ে চলো। বিপ্লবের পথে, শ্রেণীশত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, ক্ষমতাকে ছিনিয়ে নাও। সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা হবে তোমাদের হাতে।" পার্টি-চরিত্রের এই পরিবর্তন সদস্যদের মধ্যেও এনে দিয়েছিল দারুণ হতাশা। আর সেই বিপর্যস্ত হতাশ নাওয়াল আর একটা চূড়ান্ত সংকটের মুখোমুখি। এই সংকটের সামনে এসেই সে তার জীবনের স্মরণীয় দিনগুলি টেনে আনছে। আট ঘন্টার কাজের দাবিতে কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল নাওয়াল। বাপের মতোই ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করেছিল। দাবি আদায় করতেও পেরেছিল। কমরেড নাওয়াল মুজফফর আহমেদের প্রশংসাধন্য হয়েছিল। একলাফে নাওয়াল পার্টির জগৎী নেতা হয়ে উঠে এসেছিল। পার্টিতে আসবার পর থেকেই সে ট্রেড ইউনিয়নের ওপরে ওঠবার সিঁড়িগুলি চিনে নিচ্ছিল। অথবা সে তার অজ্ঞাতসারেই (?) নেতা হয়ে উঠছিল। নাওয়াল এম. পি. হয়ে দিল্লীতে এল। এম. পি'র বিলাসে সে নিমজ্জিত হল। বিদেশে প্রতিনিধি হয়ে গেল। সেখানে রাশিয়ান ইনটারপ্রিটার আনার সঙ্গে বন্ধুত্ব অথবা ক্লিসটালের সাহচর্য সে লাভ করল। হুইসকি-ভডকা-বিয়ারের স্রোত বইতে লাগল। সমরেশের নায়ক তখন পার্টি করে বটে, কিন্তু সে মজদুর থেকে বিচ্ছিন্ন। নাওয়ালের মেয়ে মুসলমান মেয়ে বিবাহ করে। জামাই মসকোর পার্বালিকেশন বিভাগের উচ্চপদে আসীন। মেয়ে দেশে থাকে, কিন্তু বাপের বাড়িতে থাকতে চায় না অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বলে। স্ত্রী লছমি কিন্তু সব ব্যাপার বুঝতে পারে না। লোহাকাটা মজুরের স্ত্রী তখনও বদলে যায় নি। নাওয়াল দেখতে পেল, পার্টিতে দলাদলি, অসাধু পন্থা গ্রহণ বেড়েই চলেছে। নির্বাচনে দাঁড়াবার অনুমতি পেল না। পার্টি হয়ে উঠছে মস্তানের পার্টি। সমরেশ বসু কমিউনিসট (এম) পার্টির সংসদীয় রাজনীতিতে দেখতে পেয়েছেন শিকল—এখানে একটার পর একটা ভ্রম বেড়েই চলেছে। লুমপেন প্রলেতারিয়েত শিউপুজন এখন পার্টির কাছের লোক। শিউপুজনের চেলা বুলেট নাওয়ালের প্রশ্নের জবাব দেয় এই বলে, "আজ আপনার পার্টি ছেড়ে গেলে, অন্য পার্টি আমাদের লুফে নেবে।" নাওয়াল পুরানিয়া। এখন নওজওয়ানের সময়। নাওয়ালের মুখ দিয়ে সমরেশই যেন বলছেন, "এখন শুনছি, ওটার (সমাজতন্ত্র) দায়িত্ব মধ্যবিত্ত ইনটেলিজেনসিয়ার হাতে, ওরাই পার্টি নেতৃত্ব দেবে। আমি এটা মানিনে। এরা নিজেদের খুদে লেনিন ভাবছে। ভাবুক। আমি এখন একলা ভাবছি, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য থেকেই সেই ইনটেলিজেনসিয়ার ক্যাডার বেরিয়ে আসবে। গ্রামের ভূমিহীন কৃষকরা আজকের নেতাদের মাথা কাটবে।" এই অভিজ্ঞতায় নাওয়াল পেছন ফিরতে চায় দু কদম।

উপন্যাসটিতে পার্টি রাজনীতির কুৎসিত দিকটি অনাবৃত করেছেন লেখক। বর্তমান পার্টিতে রাজনীতির বিকৃত রূপ কিছু ঢোকে নি, এমন কথা বলা যাবে না।

বেশ কিছু কর্মী পার্টির কাজকর্মে হতাশ হয়েছেন, একথাও ঠিক। "এক সময়ের লড়াকু মজদুরটার হাতে এত শিকল কোন কয়েদখানার প্রহরীরা বেঁধে দিল, আমি তাদের একবার চোখ ফিরিয়ে দেখতে চাই।" এই ফিরে দেখার কাহিনী শেকলছেঁড়া হাতের খোঁজে। স্মৃতি-চারণের ফাঁকে-ফাঁকেই নাওয়াল বলে, "আমি নিজেকে খুঁজতে চলেছি। আমি লড়াকু মজদুরের বাচ্চা, কিন্তু আমি আসলে কে, তাকেই আমি খুঁজতে যাচ্ছি।" ভব-নাথদা নাওয়ালকে বলেছিলেন, "তুমি কি গাছের শেকড়টা খুঁজে দেখেছো? কী গাছ, কোন্ গাছ, তার আবার শেকড় খোঁজাটাই বা কী? ভবনাথদা তাজ্জব। বলেন, যে-মানুষ নিজের সঙ্গে লড়েনি, সে বাইরের শত্রুদের সঙ্গে লড়বে কেমন করে? পার্টির ভেতরেই বা লড়বে কেমন করে?" বুলেটকে নাওয়াল বলে, "আমি নিজেকে খুঁজে দেখছি, আমার সেই শিকড়টাকে।"

সমরেশ নিজেকে একবার প্রকাশ করেছিলেন (সমরেশ বসুর গল্পসংগ্রহ, বিশ্ববাণী), 'নিজেকে জানবার জন্য' ক্ষুদ্র কথিকায়। লীলা রায় সমরেশ বসুকে বলেছিলেন লেখকের দৃষ্টিতে 'নিজেকে জানবার জন্য' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হবে না কেন? এই প্রশ্নে সমরেশ বিচলিত হয়েছিলেন, কিছুটা অভিভূতও। তিনি মনে করেন, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই তাঁর লেখার বাঁক ফিরল। সেই বাঁকে যে তিনি এখনও আছেন নাওয়ালের আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যেই তা পরিস্ফুট। সমরেশ এখন দু কদম পিছিয়ে যেতে চাইছেন। তিনিও শিকড়ের সন্ধানে। উপন্যাসটি উত্তমপুরুষে লিখিত। ফলে সংঘাত-সংকট এখানে দানা বাঁধে নি। নায়কের একতরফা সন্ধানের গতিপ্রকৃতি এই উপন্যাসে বিস্তৃত হয়েছে। সমরেশের কিছু উপন্যাসে তাই আত্মকথনরীতির ঝোঁক দেখা যায়। সম্প্রতি লিখিত 'তিনপুরুষ' উপন্যাসেও এই রীতির প্রয়োগ দেখতে পাই। তিন পুরুষকে স্বচ্ছন্দে তিন জনের আত্মকথা বলা যায়। হেনরি জেমস আত্মকথাধর্মী উপন্যাসের পক্ষপাতী ছিলেন না। সমরেশ নিজেও 'স্বীকারোক্তি' প্রসঙ্গে বলেছেন, "যার কণ্ঠস্বর ছিল না উচ্চ, দৃষ্টি-আকর্ষণকারী তীক্ষ্ম ঝলক, কারণ উত্তম-পুরুষে লিখিত।" সেই কারণেই উপন্যাসটি বিবৃতিধর্মী হয়ে পড়ে। তথাপি কমিউনিসট আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বটি চমৎকারভাবে সমরেশবাবু উদ্ঘাটিত করেছেন। বিশেষত লছমন আর নাওয়ালের দু-পয়সা আর আট-ঘন্টার লড়াইয়ের দৃশ্যগুলি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

কমিউনিসট আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে সংসদীয় রাজনীতির চোরাবালিকে তিনি দেখিয়েছেন। সমরেশ বসু যে তীক্ষ্ম এবং তীব্র সমালোচনা করেছেন তার অনেকগুলিই সত্য। সুস্থ সমালোচনা কমিউনিসট পার্টির দিক থেকেও প্রত্যাশিত হওয়া উচিত। জানি না পার্টি কোন দিক থেকে এই উপন্যাসের বিচার করবে।

কিন্তু আমরা শিল্পকর্ম হিসেবে বিচার করতে গিয়ে একথা অবশ্যই বলব, নাওয়ালের কর্মের জন্যে পার্টি দায়ী হতে পারছে না। সমরেশ বসু যে হাঙলেকে পার্টির নেতা বলে উল্লেখ করেছেন তাকে বাস্তবে পাওয়া যেতে পারে কিন্তু এই চরিত্রটিকে শিল্পীর তুলিতে পাওয়া যায় না। হাঙলে তো ডিবচ, মদ্যপ, স্বার্থপর। লোহা-কাটা মজুর যদি তার সঙ্গে মিশে যায় তার জন্যে পার্টিকে দায়ী করা সম্ভব নয়। লোকেশদা, ভবনাথদা অত্যন্ত বাস্তব। পার্টিতে টিকেট পাওয়া নিয়ে মতভেদ থাকা আরও সম্ভব। কিন্তু দিল্লীর ঠান্ডাঘর যে পার্টির সদস্যের মাথা ঘুরিয়ে দেয়, তার জন্যে কোনো সংঘাত যদি রচিত না হয়, তবে চরিত্রটি শিল্পের দিক থেকে বিশ্বাস্য হয়ে উঠবে কী করে? নাওয়াল সেই কারণেই যেন অসংগতিপূর্ণ চরিত্র। তার মধ্যে পূর্বাপর সামঞ্জস্য নেই। এইরকম অধঃপতন এবং আত্মজিজ্ঞাসা খুবই সুলভ, কিন্তু একজন দলীয় কর্মী সংগ্রাম করতে-করতে ক্ষতবিক্ষত হবে, এবং ক্ষতই মানুষটিকে সত্যের পথে নিয়ে যাবে—এই তো এই চরিত্রটি থেকে প্রত্যাশিত ছিল। নাওয়ালকে সমরেশ দেখাতে চেয়েছেন পার্টির নীতির দলাদলির শিকার। ফলে চরিত্রটি মেরুদণ্ডহীন। দিল্লীর ঠাণ্ডাঘরে গিয়ে হিমশীতল হয়ে যায়।

সমরেশ অবশ্য আশাবাদী। তিনি এখনও বিশ্বাস করেন বিপ্লব কেউ ঠেকাতে পারবে না। সংসদীয় গণ-তন্ত্রকে উপেক্ষা করে আবার কিষাণ-মজদুরদের মধ্যেই খুঁজতে হবে বিপ্লবের ইশারা। দু কদম পিছিয়ে যাবার নির্দেশও সেইখানে।

৬

I am a poor mendicant. My earthly possessions consist of six spinning wheels, prison dishes, a can of goat's milk, six homespun loincloths and towels, and my reputation which cannot be worth much. Mahatma Gandhi, 1931.

However, universal adult franchise and parliamentary and state legislature can serve as instruments of the people in the struggle for democracy, C.P.I.(M), 1964.

The innate rationality of man is the only guarantee of a harmonious order, which will be a moral order, because morality is a rational function. M. N. Roy, New Humanism : A Manifesto, 1947.

'শেকলছেঁড়া হাতের খোঁজে' উপন্যাসের নায়ক আন্দো-লনের উৎস খুঁজতে অন্ধকারে পা বাড়াল মজদুর বস্তিতে। নাওয়াল যে রাজনীতির ইঙ্গিত দেয় সে রাজ-নীতির চরিত্র কেমন হতে পারে? ১৯৭৭ সাল থেকে কমিউনিসট পার্টি পশ্চিমবঙ্গে সংসদীয় রাজনীতি মেনেই ক্ষমতায় আসীন হয়েছে। জনসাধারণের চিত্তে যে আশা জেগেছিল ক্ষমতায় আসীন সরকার তা পূরণ করতে পারে নি। অন্যদিকে কিছু পার্টি কর্মীর মধ্যে কতকটা হতাশারও ভাব দেখা দিচ্ছে। কমিউনিসট পার্টির সংগঠনেও শিথিলতা লক্ষ করা যায়। রাজ্যব্যাপী ক্ষোভ বিস্তৃত হচ্ছে। অর্থনীতির জগতেও দুর্বলতা পরিস্ফুট। শিক্ষাজগতে বিশৃঙ্খলার দৃষ্টান্ত সংবাদপত্রে প্রত্যহ প্রকাশিত হচ্ছে। এসবের জন্যে সরকার এবং কমিউনিসট পার্টি তাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করছে। সরকারি অথবা পার্টির বক্তব্যে সাধা-রণ মানুষ আস্থা স্থাপন করতে পারছে না। জনসাধা-রণের চিত্তে দিনের পর দিন ক্ষোভ জমা হচ্ছে।

রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যেই কি এই হতাশার বীজ উপ্ত? অথবা কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের অবনমন এর জন্যে দায়ী? নাকি সংসদীয় রাজনীতিই এর জন্যে দায়ী? ভারতবর্ষের রাজনীতিতে গান্ধীবাদ প্রতিষ্ঠিত। মার্কস-বাদ সম্বন্ধেও বুদ্ধিজীবী ভারতবাসী সচেতন। কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য? সমরেশ ভারতীয় রাজনীতির এই অস্থিরতা লক্ষ করেছেন, একজন বুদ্ধিজীবী হিসাবে তাকে বিশ্লে-ষণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি লিখলেন তিনপুরুষ উপন্যাস।

'তিনপুরুষ' (শারদীয়া দেশ, ১৩৯২) উপন্যাসে একই পরিবারের তিনপুরুষের কাহিনী। সূর্যমোহন, তার পুত্র সৌরীন্দ্রনাথ, সৌরীন্দ্রনাথের পুত্র সুদীপ।

সমরেশ সৌরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি গোড়া থেকেই বিরূপ। জয়তীর সঙ্গে সুদীপের মেলামেশা তিনি পছন্দ করেন নি। তাঁর মনের সংকীর্ণতাই এতে প্রকাশ পেয়েছে। সাংবাদিকসুলভ এবং একটু ব্যঙ্গের খোঁচায় তিনি সৌরীন্দ্রের সিগারেটের বর্ণনা দেন। সর্বহারার নেতার আচরণ এবং আদর্শের বিরোধটি এখানে ফুটে ওঠে, "দেশী সিগারেট, রাজা মাপের সর্বাপেক্ষা দামী।' ফিলটারটিপড অবশ্যই।" কিংসাইজ দামি সিগারেট খেয়ে কৃষক-মজুরের দল করার অসংগতিটি ধরিয়ে দিতে চান সমরেশ। সুদীপের ঘরে রবীন্দ্রনাথ-টলস্টয়-গান্ধীর ছবির সঙ্গে লেনিনের ছবিও আছে। গান্ধীর প্রতি সৌরীন্দ্রের বিতৃষ্ণা। সুদীপের প্রতি বিরূপতার কারণ হল, দল-ত্যাগীর ঘরে লেনিনের ছবি। এটিকে সৌরীন্দ্রের হঠ-কারিতা বলেই মনে হয়েছে। এখানেও সৌরীন্দ্রের সংকীর্ণতাই লক্ষ্য। সৌরীন্দ্রের ঠোঁটে কাস্তের বক্রতা। এ উপমানও সমরেশ ভেবেচিন্তেই করেছেন। যে-কাস্তে ধানের অর্থাৎ সমৃদ্ধির এবং কৃষকের পবিত্র শ্রমের প্রতীক, সেই বস্তু এখন অপরকে সংহার করতে উদ্যত। এ এখন ধারালো অস্ত্র।

সুদীপের মা সুদীপকে সমর্থন করেন না। স্বামীর প্রতিই তাঁর আনুগত্য। এই আনুগত্য ন্যায়-অন্যায় বিবে-চনা করে না। তাঁর আনুগত্য হচ্ছে উৎসর্গ। সেখানেই মায়ের শক্তি। সুদীপ এও বোঝে যে, পার্টি থেকে বহিষ্কৃত তার শ্রদ্ধেয় সীতানাথ জেঠুও এই উৎসর্গের মধ্যেই শক্তিকে খুঁজে পেয়েছেন। আসলে সমরেশও মনে করেন, এই উৎসর্গিত প্রাণই বিশুদ্ধ, সৎ এবং পবিত্র। কালকূট এসে সমরেশের হাত চেপে ধরছে।

সূর্যমোহন-সৌরীন্দ্র-সুদীপ—এই তিনপুরুষই রাজনীতি করেছেন। সূর্যমোহন স্বাধীনতা-পূর্বের রাজনীতিচর্চায় দীক্ষা নিয়েছিলেন। গান্ধীবাদী। প্রাচীন মূল্যবোধে বিশ্বাসী। ভারতীয়তা তাঁর আচরণে আদর্শে। সৌরীন্দ্র কমিউনিসট। আন্তর্জাতিকতার ছোঁয়া তার আচরণে এবং আদর্শে। সে সন্তানকে সিগারেট অফার

করে। পুজোয়-আচ্চায় বিশ্বাসী নয়। সমরেশ প্রথমেই সূর্যমোহনের পক্ষ নিয়েছেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ নিখিলেশের পক্ষ নেন। এই পক্ষপাতিত্বের সংবাদ পাই সৌরীন্দ্রের সূর্যমোহনকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণামের মধ্যে। সূর্যমোহন যখন প্রতিবাদ করে বলেন, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কমিউনিসটের নীতি নয়, তখন সৌরীন্দ্র কিন্তু ভালো উত্তর দিতে পারে নি। বস্তুবাদী মানসিকতায় পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ভাববাদী চিন্তার দ্যোতক —এক ধরনের 'রিলিজিয়াস মানবিকতা'। গান্ধীবাদী সূর্যমোহনকে সৌরীন্দ্র সরাসরি ঈশ্বর, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল। তর্ক হয়েছে প্রচুর। কিন্তু কেউ কারও সমর্থন পায় নি। আমরা গান্ধীর মতামত জানতে পারলাম। সৌরীন্দ্ররও। এখানেও কোনো সংঘর্ষ ফুটে ওঠে নি। একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে যাচ্ছিল যখন গান্ধীর মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছেছিল কলকাতা শহরে। সূর্যমোহন এই শোকসংবাদে নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। গান্ধীর মৃত্যুর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই আমরা জানতে পারি, গান্ধী আর কংগ্রেসের দলভুক্ত হতে চাইছিলেন না। জওহরলাল কোনো এক সময়ে গান্ধীর শিষ্য ছিলেন হয়তো, কিন্তু জওহর এখন অন্য মানুষ। তিনিও প্রয়োজনে কমিউনিসটদের জেলে পোরেন। জওহরলাল মনে করেন অহিংসা দিয়ে দেশ চালানো যায় না। সূর্যমোহন তো এই মতবাদকে বিশ্বাস করতে পারেন না। তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে একা হয়ে গেলেন। সুদীপ যখন ঠাকুরদা সূর্যমোহনকে ফ্যাসিসট শব্দটি বলে সূর্যমোহন যেন সেই শব্দটি সেই প্রথম শুনলেন। এ কী করে হয়? গান্ধীজীর মৃত্যুর অনেক আগেই তো ফ্যাসিসটবিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধেছিল!

সমরেশের এইজাতীয় রাজনৈতিক উপন্যাসের রচনাশৈলী আমাদের গোরা উপন্যাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গোরা উপন্যাসে তর্ক-বিতর্ক প্রচুর। গোরার উগ্র হিন্দুয়ানি পরেশবাবু, সুচরিতা, পানুবাবু—সকলকে আঘাত করেছে। সে আঘাতে যে স্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হয়েছে তাই থেকেই মশালের দীপ্তি আর দাহ লক্ষিত হয়েছিল। সমরেশ তর্ককে যতটা না মানবিক বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত করেছেন তার চাইতে বেশি তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। লড়াইয়ের পদ্ধতিগত দিকের ভালোমন্দ দেখাবার চেষ্টা করেছেন। উপন্যাস রচনায় একে কী বলব? "হিসটরি অ্যাজ এ নভেল, দ্য নভেল অ্যাজ হিসটরি"? অর্থাৎ হাই জারনালিজম অর্থাৎ নন-ফিকশন নভেল? কিছুকাল থেকেই সমরেশ বসু ডকুমেনটারি নভেল লেখায় মনোযোগী হয়েছেন। তথ্যচিত্রের প্রতি সমরেশের টান লক্ষ করা যাবে 'টানাপোড়েন' উপন্যাসে। নিপুণভাবে তিনি তথ্য উপস্থাপন করেন। ডিটেলের কারুকার্য নয়নাভিরাম। 'টানাপোড়েনে' উৎপাদনের সঙ্গে জীবিকা ও জীবনের যোগাযোগ রচনা করে তথ্যকে তিনি নূতন মাত্রা দিতে পারেন। এমন-কি, ঔপন্যাসিকের যে বৈশিষ্ট্যে তথ্য সত্যে পৌঁছে যায় সে বৈশিষ্ট্যও ওই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। এই বৈশিষ্ট্য হল শিল্পীর চেতনা। তথ্যবিন্যাসে, তথ্যের স্বরূপে, বৃহত্তর পটভূমিকায় তথ্যের অবস্থানে সমরেশ এমন করণকৌশলের ব্যবহার করেন যা থেকে ঔপন্যাসিকের জীবনবোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে জীবনবোধের প্রতি আমরা বিরক্ত হতে পারি, আবার একমতেও পৌঁছুতে পারি। এখানেই বসুর উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু সাংবাদিকতাও এখন ভোল পালটেছে। আমাদের দেশে শিল্পযুগ না এলেও শিল্পযুগের লক্ষণ কিছু-কিছু বাইরে থেকে ধার করে আনা গেছে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও সে ব্যাপার লক্ষণীয় হয়ে উঠছে। ফীচারধর্মী সংবাদ পরিবেশন এখন একটা স্টাইল। সংবাদ সেখানে সাংবাদিকের ব্যক্তিত্বের স্পর্শে বিশিষ্ট। সংবাদ আর নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক ভাবনায় উপস্থাপিত নয়। সাংবাদিকের পক্ষপাত সেসব ফীচারে উচ্চকিত। বিশেষ একটা দৃষ্টিকোণ থেকে সে সংবাদ পরিবেশিত। কখনও-কখনও সংবাদের অন্তরালে রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক টানাপোড়েনকে ধরবার চেষ্টাও দেখা যায়। দলীয় রাজনীতির গোপন খবর উদ্ঘাটনে সেসব সংবাদের মূল্য অবশ্যই আছে। সামাজিক মূল্যনির্ধারণেও তার ভূমিকা নগণ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ যখন 'গোরা' উপন্যাস লেখেন তখন সংবাদপত্রের এই ভূমিকা ছিল না। ব্রাহ্মমত আর হিন্দুমত নিয়ে নানা তর্কবিতর্কের ইতিহাস তখনও লেখা হয়েছিল। কিন্তু এখনকার ফীচারধর্মী লেখার সঙ্গে তার তুলনা চলে না। রবীন্দ্রনাথ যখন মতামতের ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করেছেন কিংবা মতামতের গভীরে ডুব দিয়েছেন, তখন পাঠক সে বিষয়ে কৌতূহলী হয়েছেন। তখন তো সংবাদপত্রের এমন দাপট ছিল না।

সমরেশ বসু একালের লেখক। এই সময়ে উপন্যাসের ভাঙচুর অনেক হয়েছে—বিশেষ করে শৈলীর দিক থেকে। সেজন্যে সতর্কতার প্রয়োজন বেশি ছিল।

আসলে সমরেশ বসু উপন্যাসের নর্মটাকে ভাঙতে চাইছেন। কিছু সাংবাদিক যেমন উপন্যাসের ক্ষেত্রটির দিকে আগ্রহে এগিয়ে আসছেন, কিন্তু ঔপন্যাসিকও সেইরকম সাংবাদিকের ক্ষেত্রে বিচরণ করতে চাইছেন। এখন আমরা যদি ভারতের সংবাদপত্রগুলির প্রবণতার দিকে লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাব, আজ নিউজ ম্যাগাজিনের আদর বেড়েই চলেছে। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতীর দিন ফুরিয়েছিল। নূতন উদ্যমে সাময়িকপত্রে গল্প-কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধ লেখা চলছিল। বলা বাহুল্য, প্রবন্ধের সংখ্যা কমে আসছিল। গল্প-উপন্যাসে নূতন রীতি দেখা দিয়েছিল। অ্যানটি-স্টোরি, অ্যানটি-হিরো, অ্যানটি-পোয়েট্রির সূচনা তখনই দেখা দিয়েছিল। হাঙরি জেনারেশন সবকিছুকে ভাঙতে চাইছিল। ধীরোদাত্ত নায়কের দিন ফুরিয়ে গেল, দেখা দিল হতাশ নায়কের। এখন আবার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সংবাদের প্রতি তীব্র আগ্রহ। টিভি, সিনেমার পর্ব এখন। চোখকে তৃপ্ত করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। আর, এককথায় বলতে গেলে, নলেজ বুম এই সময়েই। চাঁদে পাড়ি জমানো থেকে শুক্রগ্রহে মানুষ পাঠানোর তোড়জোড় চলছে। উপন্যাস এমনই একটা শিল্প যাকে তানপ্রধান ছন্দের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। একে টানলে দীর্ঘ করা যায়। প্রয়োজনে সংকোচনও সম্ভব। এর উপর কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদির ভার চাপালেও এ সহ্য করে, আবার নির্ভার হতেও এর দ্বিধা নেই। অতএব আধুনিক কালের সংবাদখোর পাঠকের জন্যে উপন্যাসিকেরা সংবাদের জোগান দিতে চাইলেন। সমরেশের 'তিনপুরুষ' উপন্যাস সংবাদ ছাড়া আর কী? ফীচার তো বটেই। গান্ধীবাদের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে কমিউনিসট মতবাদকে। গান্ধীজীর অহিংসনীতির শক্তি কোথায়, তার ব্যাখ্যা আছে উপন্যাসে। গান্ধীজীর ধ্যানধারণার শোচনীয় পরিণতিও সূর্যমোহনের জীবনীর মধ্যে পাওয়া যায়। মাঝে-মাঝেই সৌরীন্দ্রের সঙ্গে সূর্যমোহনের তর্কবিতর্কগুলি আমাদের কোনো রাজনৈতিক বাতাবরণে ঠেলে দেয়। মার্কস, লেনিন তো আছেনই, এমন-কি হেগেলও বাদ যান নি। এইসব মনীষীর চিন্তাধারার কিছু সংবাদ সমরেশ উপন্যাসে তুলে আনেন। সৌরীন্দ্রের বিবাহ উপলক্ষে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান হবে কি হবে না, এই নিয়ে সূর্যমোহন তাত্ত্বিক আলোচনায় নেমে পড়েন। প্রসঙ্গ চলে যায় নাস্তিকতা আর আস্তিকতায়। কমিউনিসট সৌরীন্দ্র বলেছিল, "নাস্তিকের দৃষ্টি কোনোরকম অপার্থিব অসত্য অবৈজ্ঞানিক আবর্জনা দিয়ে ঢাকা নয়। এক্ষেত্রে নাস্তিকতা একটা বিশেষ তত্ত্বাশ্রয়ী। একটা বিশেষ তত্ত্বে বিশ্বাসী। যে-তত্ত্ব থেকে তার আদর্শ আর সংগ্রামের নীতি আর পথগুলো আবিষ্কার করা হয়েছে।" ধর্ম যে আফিম, একথা কমিউনিসটরা বিশ্বাস করে। সমরেশ এই বিশ্বাসের ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন সূর্যমোহনের প্রতিবাদী সুরে, "ফরাসী দার্শনিক পিয়ের বেইলের কথা তুমি আমার থেকে বেশি জানো নিশ্চয়। নাস্তিকতাবাদী সমাজের সূত্রপাত তিনিই করেছিলেন। মার্কস আর এঙ্গেলস সাহেব জানতেন, পিয়ের বেইলের তত্ত্বের মধ্যে বস্তুবাদের সন্ধান পাওয়া গেছলো। এই ফরাসী দার্শনিক বিশ্বাস করতেন কেবল নাস্তিকদের নিয়েই একটা সমাজ চলতে পারে। তারাই যোগ্য শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারে।" দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে লাভ নেই। গোটা উপন্যাসটিতে এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। পিতা-পুত্রের মতাকীর্ণ বিষয় প্রবন্ধের। গোরা যখন হিন্দুধর্মের সার সংকলন করে, তখনও কিন্তু তার মধ্যে হৃদয় নেচে ওঠার ব্যাপার থাকে। গোরা যে শ্যাস্ত্রব্যাখ্যা করছে না, বরং শাস্ত্র তার সত্তাকে বিধৃত করে আছে বলেই জীবন আর তত্ত্ব সেখানে এক এবং অভিন্ন। কিন্তু সমরেশ বসুর এই উপন্যাসে তত্ত্ব জীবনের সঙ্গে মিশে যায় নি। এ এক ধরনের সাংবাদিকের দায়িত্বপালন করা হয়েছে। মাঝে-মাঝে বক্তব্য বক্তৃতার আকার ধারণ করেছে, কিন্তু বক্তার স্বর আমাদের মর্মে পৌঁছচ্ছে না। পৌঁছচ্ছে যে না, তার কারণ বক্তাকে বক্তৃতার উপযোগী করে তোলা হয় নি। উপন্যাসটিতে জটিলতা ফুটে উঠতে পারত সেখানে, যেখানে সূর্যমোহন শাস্ত্রীয় বিবাহ প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্রের মতামত চেয়েছিলেন। আসলে সৌরীন্দ্রের কাছে এটা একটা কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দিতে যাচ্ছিল—নিজের বিবাহমত এবং একেবারে নিজেরই বিবাহ ব্যাপারে। সূর্যমোহন খোলাখুলি বলেছিলেন, 'তুমি আমার ছেলে বটে। কিন্তু আজ বাবা ছেলে ছাড়াও তোমার আমার মধ্যে আর একটা পরিচয় ঘটেছে। আমি গান্ধীবাদী। তুমি কমিউনিসট।

তোমার মা-দিদিদের কাছে আমরা বাবা আর নেই। তোমার আমার মতবাদ আর আদর্শের চেয়ে ও'দের কাছে আমাদের সেই পরিচয়টাই আসল।" বলা বাহুল্য, সৌরীন্দ্র মা-দিদিদের মতেই সায় দিয়েছিল। সংঘর্ষ এড়ানো গেল, কিন্তু চরিত্রটি নষ্ট হল। সমরেশ সূর্যমোহনকে যখন চিহ্নিত করেন তখন নিজের মতবাদে অনড় থাকাটাকেই চরিত্রের দৃঢ়তার লক্ষণ বলেন। বিবাহের ঠিক পরে-পরেই সূর্যমোহন মৌনব্রত অবলম্বন করলেন। বাড়ির সকলের অনুরোধ, যুক্তি উপেক্ষা করলেন। গান্ধীবাদীর চারিত্রিক দৃঢ়তা নিশ্চয়ই ফুটে উঠল কিন্তু পারিবারিক আবেগ-অনুভূতির বা বন্ধনের মধ্যে যে স্নেহপ্রেম সহজরূপে উপস্থিত থাকে তা উপেক্ষিত হল। আজকাল সংবাদপত্রে ফীচারধর্মী লেখায় এরকম দৃষ্টান্ত বহু দেওয়া হচ্ছে যেখানে আমরা দেখি সংস্কার এবং প্রগতি সহাবস্থান করছে অনায়াসে। কখনও-কখনও প্রগতিকে বিশুদ্ধ করার জন্য হাতের আংটি, কনুইয়ের মাদুলি কোমরের সুতোয় লুকিয়ে ফেলতে হয়। সৌরীন্দ্রও এইরকম। এই চরিত্র ক্ষমতা পেলে যে সুযোগসুবিধেগুলি নেবে না তা কী করে বলব। সৌরীন্দ্র নিয়েছেও তাই। মন্ত্রী হয়ে সে গাড়ি ছাড়া চলে না, পুত্রকে ব্যাঙ্কের চাকরিতে ঢুকিয়ে দেয়, পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সাহায্যে এবং শেষ পর্যন্ত ভুয়া কারখানার অস্তিত্ব দেখিয়ে পুত্রকে দু-কোটি টাকার ঋণ সংগ্রহে সহায়তা করে। সমরেশের তথ্যের সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করব না, কেননা এটা ঘটছে। তবে কঠোর সমালোচনার যুক্তি আছে। কিন্তু এখানে তো তিনিও কমিটেড—তিনিও যেন একটা রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে কথা বলেছেন। 'জাগরী'র নীলু সম্বন্ধে গোপাল হালদারের আপত্তি ছিল সে অ্যানাটসোস্যাল, স্বার্থপর। সেই কারণে তাকে কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতিনিধি বলা যায় না। আমরা বলি, সৌরীন্দ্রও (যতই সমরেশ বসু তাকে পার্টির সদস্য বলুন না কেন) অ্যানটিসোস্যাল। অ্যানটিসোস্যালের মাথায় সমরেশ বড়ো বেশি আদর্শের বোঝা চাপাতে চাইছেন। সূর্যমোহনের বাড়িতে বনমালীর (গৃহদেবতা) সেবার ব্যবস্থা ছিল। সৌরীন্দ্রের স্ত্রী প্রণতি যথাবিহিত বনমালীর সেবায় ভক্তিমতী ছিল। সৌরীন্দ্রও কোনোদিন সে সেবার প্রসাদ গ্রহণ করেছে কিনা, সে-সম্বন্ধে একটু সংশয় রেখে দিয়েছেন সমরেশ। এই সংশয়ও কি সেই সংস্কারের টান! নচেৎ এম. এল. এ. ফ্লোরে মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রতিবারে পুজো দেওয়ার বিবৃতি আসে কী করে? আসলে সৌরীন্দ্র কি এখন পরিবর্তিত হল? এই প্রসঙ্গে সমরেশ সৌরীন্দ্রের সঙ্গে সূর্যমোহনের ধর্ম, অধ্যাত্মবাদ ইত্যাদি নিয়ে তর্কের বিবরণ দিয়েছেন। গান্ধীজীর অহিংসা, অস্পৃশ্যতাবর্জন এবং রামমাহাত্ম্যের মধ্যে মানবকল্যাণের লক্ষ্যই যে প্রধান, সেকথাও সূর্যমোহন বুঝিয়ে দিয়েছেন। তুলনামূলকভাবে সৌরীন্দ্রের যুক্তিগুলি দুর্বল শোনায়। এও যেন লেখকের ইচ্ছাকৃত ব্যাপার। সবচাইতে আশ্চর্য মনে হয়, সূর্যমোহন যখন গান্ধী এবং লেনিনকে একই পর্যায়ের বিপ্লবী নেতা বলে উচ্চারণ করেন। বস্তুত তিনপুরুষ গ্রন্থের এইটিই থীম। আমরা দেখি, সুদীপ শেষ পর্যন্ত সান্ত্বনা পেয়েছে গান্ধীজীর এবং লেনিনের চিন্তার সাদৃশ্যে। সমরেশ এই কথাই বলতে চান, গান্ধীজীর দরিদ্রনারায়ণ এবং লেনিনের প্রলেতারিয়েত—একই কথা। দরিদ্রনারায়ণ এবং প্রলেতারিয়েতের সেবার জন্যে অক্লান্ত, অতন্দ্র বিপ্লবী নেতা উভয়েই। উভয়ের চিন্তাধারার মধ্যে সাদৃশ্যও খুঁজে পাওয়া যায়। অবশ্যই পাওয়া যায়। এমন কি গীতা থেকে এমন সব বাণী উদ্ধার করা যেতে পারে যার সঙ্গে লেনিনের আদর্শের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়! সুদীপ এই ভাবনাতেই ভাবিত। সে ইনজিনীয়ার। বাবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ; দীক্ষিতও বটে। সৌরীন্দ্র যেমন বাবার সঙ্গে আপোস করে না, তেমনি সুদীপও সৌরীন্দ্রের সঙ্গে আপোস করতে পারে নি। ভাইয়ের চাকরি এবং ঋণ পাওয়া দুটোই তার কাছে বিসদৃশ মনে হয়েছে। নীতিভ্রষ্টতার চূড়ান্ত রূপ তার কাছে ধরা পড়েছে।

একটা কথা আছে : পার্টি ইন পাওয়ার ইজ পার্টি ইন ক্রাইসিস। সমরেশ উপন্যাসটিতে একটি পার্টির দুটি দিকের প্রতি লক্ষ রেখেছেন। যে-কোনো রাজনৈতিক পার্টির একটা তাত্ত্বিক আদর্শ থাকে। অন্যদিকে সেই তত্ত্বের বাস্তব রূপায়ণের আর-একটি দিক থাকে। যতদিন পর্যন্ত দেশ পরাধীন ছিল, ততদিন দেশকে স্বাধীন করাটাই প্রধান সমস্যা ছিল। কিন্তু স্বাধীনেও দলের ভিত্তি ছিল একটি আদর্শ যাকে আমরা তত্ত্ব বলতে পারি। কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় এল তখন দেখা দিল

কংগ্রেসের আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ। এই রূপায়ণের সময় বারবার এই তত্ত্ব পরীক্ষিত হতে লাগল। কংগ্রেসের আদর্শ গান্ধীজীর আদর্শ। সবটা না হলেও তার ভিত্তি গান্ধীজীর চিন্তাধারাতেই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু দেখা গেল, গান্ধীজীর আদর্শ রক্ষিত হল না। তখন পার্টির কিছু কর্মী এই আদর্শভ্রষ্টতাকে মানতে পারলেন না। তাঁরা দূরে সরে গেলেন। কমিউনিস্ট পার্টি যখন ক্ষমতায় এল তখন সেখানেও তত্ত্ব ও বাস্তব রূপায়ণের মধ্যে সংকট উপস্থিত হল। সমকালীন রাজনীতির চেহারাটা আজ খুবই স্পষ্ট। একটি চূড়ান্ত অস্থিরতার মধ্য দিয়ে দেশ এগিয়ে চলেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই অস্থিরতা খুবই প্রকট। ইউরোপ-আমেরিকাতেও মাফিয়া, চোরাচালান, বর্ণবৈষম্য, ধনী-দরিদ্রের অসাম্য, আণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা সমগ্র আন্তর্জাতিক রাজনীতিকেই ঘোলাটে করে তুলেছে। পশ্চিমবঙ্গও তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। পার্টির কর্মীদের মধ্যে নীতিভ্রষ্টতা এবং এক ধরনের রাজনীতিক হঠকারিতা প্রবেশ করেছে। এ-রাজ্যে কংগ্রেসেরও সেইরকম কোনো আদর্শবাদী ভূমিকা নেই। গান্ধীজীর মৃত্যু ঘটেছে এখানে। সমরেশ কমিউনিস্ট এবং কংগ্রেসের আদর্শকে মেলাতে চাইছেন। অর্থাৎ মানবকল্যাণের পথে লেনিন আর গান্ধীর মন্ত্রে তিনি আস্থা স্থাপন করতে চান। সুদীপের অবতারণা সেই কারণে। সুদীপ নবযুগের দূত। সুদীপের প্রসঙ্গ দিয়েই উপন্যাসের সূচনা। সুদীপের প্রেমিকা জয়িতা। জয়িতা কমিউনিস্ট। সুদীপও। তফাত—জয়িতা বর্তমান কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শে বিশ্বাসী। ক্ষমতাসীন সি. পি. এমের রাজনৈতিক কর্মে জয়িতার পুরোমাত্রায় সায় রয়েছে। বিভিন্ন অফিসে, কলে-কারখানায় সি. পি. এম-সমর্থক বেকারদের ঢুকিয়ে পার্টিকে মজবুত করার প্ল্যানে জয়িতা উৎসাহী। সেখানে যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রশ্ন অবান্তর। সৌরীন্দ্রের পুত্র যুবুর ব্যাঙ্কে চাকরি পাওয়া এবং পরে ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে সুদীপ যখন প্রশ্ন করে, জয়িতা বিশ্বস্ত সদস্য হিসেবে তার উত্তর দেয়। এমন-কি সমরেশ জয়িতার ধর্ষিতে হওয়ার পর এক সময়ে সি. পি. এম. সদস্যদের সহায়তায় মস্তানদের হত্যা করার কাহিনীটিও বিবৃত করেছেন। এখানে আমাদের সংশয় জাগে লেখকের বিবরণে। আসলে জয়িতার এই কীর্তি জেনেও সুদীপ জয়িতাকে ভালোবাসতে চেয়েছে। জয়িতা প্রতিশোধ নেবার সময় কিন্তু ক্ষমা বা গান্ধীর অহিংস নীতির দ্বারা চালিত হয় নি। সুদীপের ভালোবাসায় তখন কোনো আপত্তি দেখতে পাই না। সুদীপ বারে-বারে কমিউনিস্ট মতাদর্শকে সমর্থন করেছে, কিন্তু এই আদর্শের প্রয়োগ দেখে সে তার মত পরিবর্তন করতে থাকে। সে জানে তাকে কেউ গ্রহণ করবে না। এমন-কি সাঁতানাথ জেঠুও না। সাঁতানাথ সাচ্চা কমিউনিস্ট। এখন পার্টি থেকে বহিষ্কৃত। কিন্তু তিনি গান্ধীবাদের সঙ্গে লেনিনের মতের সমন্বয় দেখতে পান নি। বস্তুত, এই রকম সি. পি. এম. বহিষ্কৃত সদস্যেরও অভাব নেই। সমরেশ এখানে ঠিক জায়গায় ঘা দিয়েছেন। সুদীপ অবশ্য 'মেলাবেন তিনি মেলাবেন' এই আশ্বাসে একা হয়ে যায়। এই উপন্যাসে প্রধানত কমিউনিস্ট আদর্শ এবং গান্ধীর আদর্শ বিশ্লেষিত।

ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অবশ্যই বলতে হবে, লেখক সুদীপকেই জিতিয়ে দিতে চান। এবং সূর্যমোহনকেও। সৌরীন্দ্রের প্রতি তাঁর বিরূপতা খুব স্পষ্ট। সৌরীন্দ্রের রাজা-মাপের সিগারেট, গাড়ি ছাড়া চলতে না পারা, অসৎ উপায়ে বিত্ত সংগ্রহ করার বর্ণনা মধ্যবিত্ত মানসে সৌরীন্দ্রের প্রতি ঘৃণা জাগাবে। আবার সূর্যমোহনের স্মিতহাস্য, কৌতুকবোধ এবং সুখে-দুঃখে বিগতস্পৃহ চরিত্রটি সমরেশের সহানুভূতি পেয়ে যায়। সতীনাথ জেঠু আমাদের মন কেড়ে নেন। তাঁর আত্মভোলা চরিত্রটি শৈকত ছেড়ে'র ভবনাথকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

আগেও বলেছি, আবার বলছি—সমরেশ চরিত্র গড়ার দিকে মনোযোগী নন এই উপন্যাসে। তিনি আমাদের সামনে একটি আয়না রেখেছেন। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি তাতে প্রতিফলিত। উপন্যাস এখানে সবকিছুকে পরিহার করে একেবারে রাজনৈতিক মতবাদটিকেই মুখ্য করে তুলেছে। সুদীপের পরিণতি কিন্তু নকশাল রাজনীতির দিকে ইঙ্গিত করে, কেননা সে একজন প্রকৃত কমিউনিস্ট (লেখক তাই বলতে চেয়েছেন। পার্টির তরফে কেউ-কেউ বলতে পারেন, সুদীপের চিন্তা একান্তই এলিট মধ্যবিত্তের চিন্তা। সুদীপ মোটা টাকা মাইনে পায় নিশ্চয়ই, কোমপানির গাড়ি ব্যবহার করে। পার্কসও নিশ্চয়ই আছে। এবং সকল প্রকার পার্টির

প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ থেকে সে দূরে। সে শুধু চিন্তা করে এবং প্রেমের ক্ষেত্রে সে হেরে যায়, ছোটোভাই তারই প্রেমিককে বিবাহ করে) হিসেবে সে সংশোধনবাদী কমিউনিসট নীতিকে সমালোচনা করেছে এই বলে যে, বিপ্লবাত্মক পন্থা পরিত্যাগ করে কমিউনিসট পার্টি সুবিধাবাদী রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হওয়া উচিত ছিল বৈপ্লবিক পন্থা গ্রহণ। অথচ পরিবর্তে সুদীপ গ্রহণ করতে চাইছে গান্ধী-লেনিনের সমন্বিত আদর্শ। অবশ্য সমরেশ পথটা খোলা রেখেছেন। সীতানাথ জেঠু সুদীপের মতকে মানে নি। এখানে সমরেশের দ্বিধা। এই দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব উপন্যাসটিতে বিস্তৃত হয়েছে।

ফেব্রুয়ারি সংখ্যার প্রবন্ধ

ভবতোষ দত্ত

পশ্চিমবঙ্গে যৌথ বিনিয়োগ

(বামফ্রন্ট সরকারের বর্তমান বিতর্কিত শিল্পনীতি)

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

জাতীয় কংগ্রেসে গান্ধীর আবাহন ও বিসর্জন

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতি

পোকামাকড়ের ঘরবসতি

সেলিনা হোসেন

সাফিয়ার দিনগুলো দুঃসহ হয়ে উঠেছে। শুকুর ঠিকমতো ঘরে ফেরে না, ফিরলেও সুস্থ আচরণ করে না। সংসারে টাকাপয়সা দেয় না। উপরন্তু, ও যা-কিছু রোজগার করে তাতে থাবা বসায়, এমন-কি জয়গুনের ছোট্ট খুতিটা হাতড়াতে বলে সাফিয়াকে। জয়গুনের শরীর খারাপ, ঠিকমতো কাজে যেতে পারে না বলে রোজগারও কম। দিশেহারা হয়ে যায় সাফিয়া। কখনো একটি সন্তানের আকাঙ্ক্ষায় বেদনা তীব্র হয়ে ওঠে। বুঝতে পারে যে ওর সন্তান হবে না। ও থাকতে বুড়ো বয়সে ওর মার একটা অবলম্বন আছে। ওর নিজের কী হবে? শুকুর তো এখনই থেকেও নেই। প্রথম-প্রথম কতদিন আদিখ্যেতার জোয়ারে টইটুম্বুর ছিল, এখন সবটাই ভাটি, ক্রমাগত জল নেমেই যাচ্ছে। শুকিয়ে উঠছে বুকের তল। মালেক পিটুনি খাওয়ার পর একদিন দেখতে গিয়েছিল, ওকে একদম অন্য মানুষ মনে হয়েছিল। ওর জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। সাফিয়া শূন্য দৃষ্টিতে আকাশ দেখে। জয়গুন পা ছড়িয়ে বসে ছাতু ভিজিয়ে খাচ্ছে। রাতে-রাতে জ্বর হয়, মুখে কোনো রুচি নেই, জয়গুন দ্রুত বুড়িয়ে যাচ্ছে। ইদানীং একটা কথাই বলে—আমি মরে গেলে তোর কী হবে? সাফিয়া মার প্রশ্নের উত্তর দেয় না। ও নিজেও জানে না যে ওর কী হবে। এত অনিশ্চিত জীবনযাপন যে বেশি ভাবতে ইচ্ছে করে না। মনে হয়, একটা বিশালাকার গহ্বরের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে, যে-কোনো সময় ঝুপ করে পড়ে যাবে। ছাতু খেয়ে জয়গুন বলে, চ মালকরে দেখি আই।

—ক্যা?

—পোলাডা ক্যান যে আছে! পিটুনি খাই এক্কেবারে কাহিল হই গিয়ে।

সাফিয়া চুপ করে থাকে। মালেকের সামনে গিয়ে ও দাঁড়াতে পারে না। সেই উদ্‌ভ্রান্ত শূন্য দৃষ্টি ওর সহ্য হয় না। ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে।

—ন যাবি?

জয়গুন ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকায়।

—তুঁই য, মা। আঁর ভালা ন লাগে।

—শরীল খারাপ লাগের?

—না অ্যাত্তে, ন যাইয়াম।

—থাক, ইতে আঁইও ন যাইয়াম।

জয়গুন আবার বসে পড়ে। সাফিয়া মাকে দেখে।

মা কি বুঝতে পারে যে এখন মালেকের জন্যে ওর বুকে কান্নার ঢেউ? মা ওর কথা বিশ্বাস করবে না। সাফিয়া অন্যদিকে মুখ ফেরায়। যেন সংসারের কোনো-কিছুতে এখন ওর আর ভালোমন্দবোধ নেই।

তখন চুলতে-চুলতে শুকুর ঢোকে, ক্রোধে উত্তেজিত, মুখে খিস্তি-খেউড়। জয়গুন দ্রুত সাফিয়াকে বলে, আই মালকর কাছত যাই। শুকুর উঠোনে এসে দাঁড়াবার আগেই বেরিয়ে যায় ও।

সাফিয়ার ভয় করে। এ যেন অন্য শুকুর—ওর স্বামী নয়, মানুষও নয়, শুধুই মাতাল এবং জুয়াড়ি একটা। ও সোজা সাফিয়ার সামনে এসে দাঁড়ায়।

—টেঁয়া দ!

—টেঁয়া? সাফিয়া চোখ কপালে তোলে।

—ঢঙ, টেঁয়া ন চিনে খানকি-মাগি! শুকুর পা দিয়ে সাফিয়াকে খোঁচা দেয়। ও উঠে দাঁড়ায়।

—টেঁয়া দ! বহুত টেঁয়া দরকার!

—টেঁয়া নাই।

—নাই?

শুকুর ঠাস করে ওর গালে চড় মেরে দুপদুপিয়ে ঘরে ঢোকে। বিছানা বালিশ তছনছ করে, সম্ভাব্য জায়গা হাতড়িয়ে টাকা খুঁজে হয়রান হয়ে যায়। রাগে বেহুঁশ অবস্থা। দিনভর জুয়ায় হেরে ওর এখন জেদ চেপে গেছে, বন্ধুদের কাছে মুখ থাকে না। সবাই মিলে টিটকারি দিচ্ছে ওকে। তাই টাকা চাই। শুকুর জিতে দেখিয়ে দেবে যে ও খালি হারেই না, জিততেও পারে। ওর জীবনে জেতার ভাগ বেশি। আজ রাতেই ও পরাজয়ের গ্লানি কাটিয়ে উঠবে। কিন্তু না, কোথাও টাকা নেই। ঘরের চালের ফাঁকগুলোও দেখে। সব শূন্য। সাফিয়া অপমানে, লজ্জায় হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গালে চিনচিনে জ্বালা, কাঁদতেও পারে না। টাকা না পেয়ে শুকুর লাফিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়ায়।

—টেঁয়া ন দিবি?

সাফিয়া উত্তর দেয় না।

—বুড়ি শয়তানডা গিয়ে কডে?

—আঁর মাবে গালি ন দিবা।

—ইশ, তোঁয়ার মা য্যান ফেরেশতা।

শুকুর মুখ খিঁচিয়ে উঠে সাফিয়ার চুলের মুঠি ধরে। দমাদম কিল চড় লাগায়। অসুরের শক্তি যেন, বাধা দিতে পারে না ও। শেষে ওকে বারান্দায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে খোপ থেকে কয়েকটা হাঁস ধরে নিয়ে যায়। বাজারে বিক্রি করে টাকা জোগাড় করবে। সাফিয়া দ্রুত নিজেকে সামলে নেয়। কান্না নয়, যন্ত্রণা নয়, এক মুমূর্ষু স্থবিরতা ওকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আজকের ঘটনা ও মাকে বুঝতে দেবে না। মা বড়ো কষ্ট পায়। ও নিশি-পাওয়া মানুষের মতো ভাত রাঁধতে বসে। অনেকক্ষণ পর জয়গুন ফিরলে আগ বাড়িয়ে মালেকের কথা জিজ্ঞেস করে।

—ক্যান দেখিলা?

—ভালা ন। পোলাডা যে কয়দিনে ভালা হয় কনে জানে?

—সমিতির কী খবর?

—বেগুনে তো ঠান্ডা হই গিয়ে। কনে আর কী করিব?

জয়গুন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সাফিয়া চুলোর জ্বাল বাড়িয়ে দেয়। আগুন দাউদাউ জ্বলে। এতক্ষণে ওর চোখে জল আসতে চায়। ও বারবার নিজেকে সামলায়।

—পোলাডা উঠি বসিত ন পারে। অনেকক্ষণ পর জয়গুন যেন নিজেকে বলে।

—এত পিটুনির পর বাঁচি যে গিয়ে ইবাই তো বেশি।

—ঠিক কথা।

জয়গুন সাগ্রহে সাড়া দেয়।

—তোর মুক্তাবেচা টেঁয়া ন আছে, সাফু?

—আঁরা দালান উঠাইয়াম, মা।

—দালান ন লাগিব। টেঁয়া দ, দি আস্যি। পোলা-ডারে ভালা করি ওষুধ-পানি খাওয়াক।

—কী কও, মা?

—ঠিকই কই রে।

জয়গুন কাছে এসে সাফিয়ার হাত চেপে ধরে। তুই মানা ন করিস, মা রে। এই জাইলাপাড়ার ভালার লাগি হিতার বাঁচি থাকন দরকার। জয়গুন কেঁদে ফেলে।

—টেঁয়ার লাগি হিতারে ডাকতার দেহাইতে ন পারে। টেঁয়া থাইলে নোয়াব হিতারে কক্সবাজার লই যাইব।

সাফিয়া চুপ করে থাকে। শুকুর ওর এক স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিয়েছে, এখন মা ওর আর-এক স্বপ্নের ওপর হাত দিয়েছে। ওর জীবনের কোনো স্বপ্নই কি বাস্তবায়িত হবে না? জয়গুন চোখ মুছে সাফিয়ার কাঁধে হাত রাখে।

—চুপ করি থাইলি যে?

—না মা, আঁই ন দিয়ম।

জয়গুন রেগে ওঠে।

—সোনা থুই পেতলের লগে ঘর করি কলিজা তোর ছোড হই গিয়ে।

—মা? সাফিয়া আর্তনাদ করে ওঠে।

—ঠিকই কই। জয়গুন সমানে উত্তর দেয়।

—চুরির খবর পোলাডা জানিত পারিও তোরে একডা কথা ন জিগায়।

সাফিয়া নিরুত্তর। বুকের ভেতর তীব্র জ্বালা। মা কখনো ওকে এমন করে আঘাত করে নি। আজ মাও ওর বিপক্ষে। ওর সব আশ্রয় কি ভেঙে যাচ্ছে?

—তোরডা ন দিস হিতার হিস্যা হিতাদে দি দে। হিতা বাঁচি উড়ুক।

জয়গুন কেমন হিংস্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। যেন সাফিয়ার টাকা ছিনিয়ে নেওয়াই এখন জীবনপণ লক্ষ্য। ও হঠাৎ করে নিশ্চুপ হয়ে যায়, শীতল হয়ে আসে বুক। মালেক বেঁচে থাকলে ওর কি কোনো সুখ-দুখ বাড়বে? ও এখন শুকুরের ভয়াবহ হাতের মঠোয়। তবুও পক্ষ-পাতিত্ব মালেকের দিকেই ভারি হয় কেন? মা এতটা নিষ্ঠুর না হলেই পারত! ঠিক আছে, ওর স্বপ্নের বিনি-ময়ে মালেক ভালো হোক, সুস্থ হোক। সাফিয়া নিঃশব্দে উঠে গিয়ে টাকা নিয়ে আসে। কিছুক্ষণ আগেও শুকুর সবকিছু তোলপাড় করেও টাকাগুলো খুঁজে পায় নি। ও মার দিকে খুন্তিটা বাড়িয়ে ধরে।

—ব্যাক দিলি? জয়গুনের বিস্মিত দৃষ্টি। সাফিয়া ঘাড় কাত করে।

—চ, দুইজন গি দি আস্যি।

—না, তুই য।

—থাক, বেয়ানে যাইয়াম। রাইত বাইড়ো।

—না, এখন য।

সাফিয়া জেদ করে। তখন সন্ধ্যা উতরে গেছে। খুব একটা রাত নয়। জয়গুন বুকের কাছে খুন্তি আঁকড়ে ধরে বেরিয়ে আসে। মরার আগে একটা ভালো কাজ করতে পারছে—এই আনন্দ এবং প্রশান্তিতে বুক টই-টুম্বুর। সাফিয়ার কতদিনের সঞ্চয় এই হাজার চারেক টাকা! জয়গুন একবারও পেছন ফিরে তাকায় না। যেন পাখা গজিয়েছে, উড়তে-উড়তে চলে যাচ্ছে সাগর পেরিয়ে। টাকার খুন্তি মালেকের হাতে গুঁজে দেয়। ওর ক্ষীণ দুর্বল কণ্ঠ, নিষ্প্রভ দৃষ্টি কোনো ভাষাই প্রকাশ করতে পারে না।

—কাইলই কক্সবাজার য। তুই ভালা হই উড়ো, বাজান। তোঁয়ারে এই টেঁয়া ধার দি, যাতে করো শোধ দিও।

জয়গুন মালেকের মাথায় হাত রেখে দোয়া পড়ে। ওর মা পাশে বসে আছে, শ্রবণশক্তি যেন বধির হয়ে যাচ্ছে। জয়গুন তার ছেলের জন্যে বুক-উজাড়-করা ভালোবাসা দিচ্ছে। কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে।

মালেক দুর্বল কণ্ঠে আপত্তি করে, চাচী, আপনের কত কষ্টের টেঁয়া।

—ইবা কথা থক, বাজান। টেঁয়া দি কইরগাম কী যদি তুই ভালা ন হও? এই দুখ লই কবরে যাইত ন পাইরগাম।

—চাচী, আঁই অ্যাত্তে ভালা হইয়াম।

—তুই টেঁয়া ন নিলে আঁই নাফে ঝাঁপ দি মইরগাম।

মালেক চুপ করে থাকে। সকালে সালেক এসেছিল। ও গতকাল ছাড়া পেয়েছে। গণি মিয়ার টাকার জোরে ওর গায়ে আঁচড়টি লাগে নি। গায়ে নতুন জামা, পরনে নতুন লুঙ্গি। যেন নতুন জামাই। মালেকের রক্ত মাথায় উঠেছিল। বিয়ে আগে হয়ে গেলেও সালেক আচরণে বারবার নতুন জামাই হয়। এভাবেই ও জীবন কাটাবে। ওর কোনো কিছুতে বাধে না। মালেকের চিকিৎসার জন্যে টাকা দিতে চেয়েছিল, ও রাখে নি। ওর মা-ই রাগারাগি করেছে বেশি। এখন ওর মা কৃতজ্ঞচিত্তে জয়গুনের টাকা নিচ্ছে। জয়গুনকে কত ভালো-ভালো কথা শোনাচ্ছে। মালেক ভালো হলে সব টাকা শোধ করে দেবে, এই আশ্বাসও দিচ্ছে। এমন করেই কি কারো প্রতি ঘৃণা বাড়ে, কারো প্রতি ভালোবাসা জন্মায়? মালেক চোখ বোঁজে। সালেক আর কোনোদিন এখানে ফিরবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে গেছে। মালেকের মা তাতে একটুও বিচলিত হয় নি। মালেক বলেছিল, হিতারে ডাক দ, মা? হিতা তো চলি যায়?

—যক, হিতার নান পোলা প্যাডত ধরি মনত হইলে আঁর শরম করের।

কী তীব্র ঘৃণা ছিল সে কণ্ঠে। এখন সেই কণ্ঠ কেমন নরম, বিনীত। জয়গুনকে আপন বোনের চাইতেও বেশি বলে উল্লেখ করছে। মালেক কোনো কথাই বলতে পারে না।

—আঁই অন যাই, বাবা?

ও মাথা নাড়ে। জয়গুন চলে গেলে মালেকের মা বালিশের খোলের ভেতর টাকাগুলো ঢুকিয়ে রাখে।

তখন বেশ রাত হয়েছে। সাফিয়া ঘরে বাতি জ্বালে নি। জয়গুন চলে যাবার পর ও ওঠে নি। যেভাবে বসে ছিল সেভাবেই বসে আছে। বড়ো বেশি নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে। মনে হয় কাঁদলে ভালো লাগবে, কিন্তু কান্না আসে না, বুক চেপে থাকে। ও ঘরের খুঁটি দুহাতে বেড় দিয়ে কপাল ঠেকিয়ে রাখে। তখন ছুটতে-ছুটতে মকবুল আসে, উত্তেজিত এবং আতঙ্কিত।

—শুকুর ভাই নাই, ভাবি!

সাফিয়া একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, কথা বলে না। হঠাৎ করে ও 'নাই' মানে বুঝতে পারে না। মকবুলের ওপর রাগ হয়।

—শুকুর ভাই খুন হই গিয়ে, ভাবি!

—খুন?

—হ। জুয়াখেলায় মারামারি, তারপর হাতাহাতি, শ্যাষে মুসা চাক্কু মারি দিল শুকুর ভাইর প্যাডে। গোঁ-গোঁ করি শুকুর ভাই শ্যাষ।

মকবুল হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। সাফিয়া নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে, যেন ব্যাপারটায় ওর কিছু এসে যায় না। এইসব সাতপাঁচের মধ্যে ও নেই।

—আঁই আপনেরে নিতে আসি, লন যাই।

—না।

—কী কন? একটু বাদে পুলিশ লাশ লই যাইত পারে।

—যক।

—আপনে কি পাথর হই গিয়েন, না?

মকবুল থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শুকুরের জন্যে ওর খুব একটা মায়া নেই, সাফিয়ার সামনে কান্না জুড়েছিল। এখন সাফিয়ার নির্বিকারত্বে বিব্রত বোধ করে। পরক্ষণে সামলে নিয়ে বলে, থক আপনের যনের কাম নাই। মানুষে ভরি গিয়ে বাজার। আপনে যাই আর কী করিবেন? আঁই যাই দেখ্যি।

সাফিয়া তবু কিছু বলে না। মকবুল ইতস্তত করে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। তখন জয়গুন ঢোকে। মকবুল দ্রুত কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

—শুকুর ভাই খুন হইয়ে।

—খুন! জয়গুন আর্তনাদ করে ওঠে। ও বাবাগো, আঁর মাইয়াডার কী হইব গো!

সাফিয়া দ্রুত মার কাছে এসে দাঁড়ায়।

—মা, চুপ কর। একডা কথা ন কইবা। সাফিয়ার তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হকচকিয়ে যায় জয়গুন।

—মকবুল ভাই, আপনে যন।

কী নির্মম শাসনের কণ্ঠ! সাফিয়া কি আসলে পাথর হয়ে গেল? মকবুল কথা বাড়ানোর সাহস পায় না। গেট পেরিয়ে বেরিয়ে যায়। সাফিয়া যত্নে ঝাঁপ বন্ধ করে। বড়ো করে একটা শ্বাস নেয়, যেন মুক্তির আনন্দে এককলক নির্মল বাতাস। জয়গুন তখনো উঠোনে দাঁড়িয়ে। কিছুই বুঝতে পারে না, সাফিয়াকে কী বললে সান্ত্বনা পাবে, কিংবা ওর সান্ত্বনার দরকার আছে কি না, তা জয়গুনের মাথায় ঢোকে না। কেবল মনে হয় আজ ওর বড়ো আনন্দের দিন।

সাফিয়া যেন শীতল হয়ে গেছে। ওর সুখ-দুঃখের কোনো বোধ অবশিষ্ট নেই। ওর জীবনে শুকুরের আগমন এবং বিদায় একই ভঙ্গিতে। হয়তো ভালোই হয়েছে। গ্লানির বেদনা আর সইতে পারছিল না। এত সহজে শুকুরের কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে, তা কি ভাবতে পেরেছিল? যে বন্দুক হয়ে এসেছিল, সেই একইভাবে ভেসে গেল। টান কোথাও নেই। জীবন এমনই সহজ হয়ে গেছে ওর কাছে। জয়গুন ওর কাঁধে হাত রাখে। সাফিয়া তাকায় না।

—অন আঁরা কী কইরগ্যাম?

—কিছু ন কইরগ্যাম। পুলিশরে কইয়ম হিতারা য্যাত্তে লাশ মাডি দি দ্যায়। আঁরা লাশ ন চাই।

—কামডা ঠিক ন হইব!

—ক্যা?

—মানুষে কী কইব?

—মানুষের কথা অ্যাতো হুনিলে তুই এক বেলাও ভাত খাইত ন পারিবা, মা।

জয়গুন চুপ করে থাকে। সাফিয়া বড়ো দ্রুত অন্য-রকম হয়ে গেছে। মালেকের দিকে তাকালে মনে হয়—হেরে গিয়ে ও জ্বলে উঠছে, ওর চোখ কথা বলে। সাফিয়াও কি তেমন শক্তি অর্জন করেছে? চোখে জলের বদলে আগুন। ঝেড়ে ফেলছে থকথকে বাড়তি আবেগ, অকারণ উচ্ছ্বাস, নাকি কান্না? এভাবেই কি জেলেপাড়া এগুবে? রাত বাড়ে, দুজনে চুপচাপ বসে থাকে। আরো তিন-চার জন উৎসাহী লোক এসে খুনের খবর দিয়ে গেছে। সাফিয়ার অখণ্ড নীরবতায় সুবিধা করতে না পেরে ফিরে গেছে।

—মা, তুই ঘুম য।

—তুই?

—আঁর ঘুম ন আস্যে।

—থক, আঁইও বই থাক্যি।

জয়গুন ছটফট করে। সাফিয়া একবারও মালেকের কথা জিজ্ঞেস করে নি। টাকা দিয়ে আসার গল্পটা করবে বলে সারা পথ জয়গুন মনে-মনে কত কথা যে সাজিয়ে-ছিল, সেগুলো এখন বুকের ভেতর তোলপাড় করে।

—মা, তোয়ার খিদা ন লাগে?

—লাইগ্যে।

—ভাত খ।

—তুই ন খাবি? ইবা করিলে আঁইও ন খাইয়াম।

—চ খাই। তুই একেবারে পোলাপানের মতো কর।

চৌকাঠের ওপর রাখা পেতলের কুপি নিভু-নিভু। তেল ফুরিয়েছে। জয়গুন শিশি থেকে তেল ঢেলে কুপি উশকে দেয়। দুজনে খেতে বসে। সাফিয়া ঠিকমতো খেতে পারে না, বারবার পানি খায়। ভাত নাড়াচাড়া করে। খিদের সময় জয়গুনের টালবাহানা নেই, ঠেসে খেয়ে তারপর অন্য কথা। থাওয়া-দাওয়া সেরে কুপি নিভিয়ে শুয়ে পড়ে দুজনে। বিছানায় কারো ঘুম আসে না। বাইরে গাছের পাতা ঝরে, মনে হয় কারা যেন ফিস-ফিসিয়ে কথা বলছে। মনে হয় ভয়ানক আকৃতির শুকুর ছুটে আসছে, সারা গায়ে ছুরির দাগ, শরীর বেয়ে রক্ত ঝরছে। ভয় লাগে, বুক কাঁপে। একসময় সাফিয়া জয়-গুনকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মুখ গোঁজে। উষ্ণ নিরাপদ আশ্রয়ে নিশ্চিত বোধ করে। ওর চোখে জল আসে, বারবার জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে আসছে, মা ওকে আশ্রয় দিচ্ছে, সাহস জোগাচ্ছে। তা ছাড়া ওর তো বুঝতে কষ্ট হয় না যে মা ওর কথা ভেবেই তো মালেকের দিকে ভালোবাসার হাত প্রসারিত করে। যদিও মুখে কোনোদিনই স্বীকার করে না।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

গ্রাহকদের প্রতি

যাঁদের গ্রাহক-চাঁদার মেয়াদ ১৯৮৫-র ডিসেম্বর মাসে শেষ হয়েছে তাঁরা অনুগ্রহ করে ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নতুন কিস্তির চাঁদা পাঠিয়ে দিলে আমরা অনুগৃহীত হব।

'তমোহন্ত্রী পূর্ণচন্দ্র' ওকাকুরা তেনশিন

তাপস মুখোপাধ্যায়

এক

জাপানবাসীরা ওকাকুরা কাকুজোকে শ্রদ্ধাবশত তেনশিন বলে ডাকতেন। তেনশিন শব্দের ব্যঞ্জনা 'স্বর্গীয় হৃদয় যার এমন মানুষ'। জাপানে তাঁকে তেনশিন নামেই উল্লেখ করা হয়। জাপানি শিল্পশাস্ত্রী ওকাকুরা কাকুজোর নাম বাঙলাদেশের মানুষের কাছে অপরিচিত নয়। কারণ দু-দুবার ভারতভ্রমণের সূত্রে জাপান আর ভারতের তথা বাঙলাদেশের বহু শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। ওকাকুরার সঙ্গে যাঁদের নিবিড় পরিচয় হয়েছিল—তাঁদের মধ্যে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা, অবনীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির মতো ব্যক্তিরাও ছিলেন। বাঙলাদেশের শিল্পকলাচর্চার উৎসাহদাতা এবং বিপ্লব-আন্দোলনের প্রেরণাদাতা হিসাবে ওকাকুরা কাকুজোর নাম চিরস্মরণীয়। ওকাকুরার বিখ্যাত উক্তির মধ্যে ছিল 'এশিয়া ইজ ওয়ান' এবং 'ভিকটরি ফ্রম উইদিন্, অর মাইটি ডেথ উইদাউট'। ওকাকুরার জীবনবৃত্তের মধ্যে তাঁর শিল্পভাবনা ও অন্যান্য ভাবনার হদিশ পাওয়া যায়।

ওকাকুরা তেনশিন-এর মৃত্যু উপলক্ষে এক শ্রদ্ধাঞ্জলিতে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> "আচার্য ওকাকুরার যখন প্রথম পরিচয় লাভ করি তখন আমি সারাজীবনের কাজটুকু সবেমাত্র হাতে তুলিয়া লইয়াছি, আর সেই মহাপুরুষ তখন শিল্পজগতে তাঁর হয়তর কাজ সার্থকতার সমাপ্তির মাঝে সম্পূর্ণ করিয়া দিয়া জীবনে দীর্ঘ অবসর লাভ করিয়াছেন এবং ভারত-মাতার শান্তিময় ক্রোড়ে বসিয়া 'এশিয়া ইজ ওয়ান' এই মহাসত্যের—এই বিরাট প্রেমের বেদধ্বনি প্রচার করিতেছেন।"

য়ুরোপীয় শোষণে বিপর্যস্ত জাপানের অভ্যুদয় ভারতের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধার সঞ্চার করেছিল। জাপানি শক্তির যথার্থ প্রমাণ পাওয়া গেল রুশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৫-৫)। সেই দেশের মানুষ ওকাকুরা তেনশিন প্রথমবার ভারতে আসেন এই যুদ্ধের দু বছর আগে। ওকাকুরার জাপান থেকে ভারতভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল স্বামী বিবেকানন্দকে প্রস্তাবিত ধর্মমহাসভার জন্য জাপানে নিয়ে যাওয়া। ওকাকুরা তেনশিনের জীবনী-রচয়িত্রী ইয়াসুকো হোরিওকা অবশ্য জানিয়েছেন যে ওকাকুরা ১৯০১ সালের নভেম্বর থেকে ১৯০২ সালের

অকটোবর পর্যন্ত ভারতে ছিলেন। হোরিওকা লিখেছেন,

> "ওকাকুরা কলকাতার কাছে এক হিন্দুমন্দিরে গিয়েছিলেন এবং তিনি বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি একজন হিন্দু সন্ন্যাসী পণ্ডিত ছিলেন এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর শিষ্য একজন ইংরেজ মহিলা নিবেদিতা ওকাকুরার প্রথম ইংরেজি গ্রন্থ 'আইডিয়ালস অব দি ইস্ট'-এর ভূমিকা লিখেছিলেন।

তাঁর বিশেষ পরিচয় হয়েছিল ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে, বিশেষত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে, এবং তিনি তাঁদের বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন। ভারতীয় খাদ্য এবং আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিতির পর তিনি হাতির পিঠে চেপে হিমালয়ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তাঁর নিশ্চিত ধারণা ছিল, সমস্ত এশীয় সভ্যতার উৎস একই সূত্র থেকে। তাঁর কাছে শিল্প ছিল একটা ক্রমবিকাশ আবার জাতীয় সংস্কৃতির প্রকাশ। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা 'ভগিনী নিবেদিতা' গ্রন্থে লিখেছেন, "১৯০১-এর শেষভাগে জাপানের এক বৌদ্ধমঠের অধ্যক্ষ আচার্যপাদ ওডা ও মিঃ ওকাকুরা ভারতে আগমন করেন। মিস ম্যাকলাউডের সহিত ইঁহাদের জাপানে পরিচয় হয়। অদূর ভবিষ্যতে জাপানে সম্ভাবিত ধর্মমহাসভায় উপস্থিত হইবার জন্য মিঃ ওডা স্বামীজীকে আমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিলেন। শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ স্বামীজীর জাপানযাত্রা ঘটিয়া উঠে নাই।" (পৃ ১৬-১৭) কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আলোচনায় মিঃ ওডা এবং ওকাকুরা উভয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ওকাকুরার সঙ্গে স্বামীজী বুদ্ধগয়া দর্শন করেন। নিবেদিতার সঙ্গে পরিচয়ও এইসূত্রে হয়েছিল। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা ঠিকই ধরেছেন,

> "ওকাকুরা শিল্পী, ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সর্বোপরি, সমগ্র এশিয়ার মধ্যে এক অখণ্ড ভাবগত ঐক্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান। এই সকল কারণেই নিবেদিতার সহিত তাঁহার মনের সংযোগ ঘটে।" (ভগিনী নিবেদিতা পৃ ২১৭)।

ওকাকুরা সম্পর্কে স্বামীজী বিশেষ উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। ওকাকুরার সঙ্গে বিবেকানন্দের পরিচয়ের যোগসূত্র রচনা করেছিলেন মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড। কারণ ওকাকুরার পত্রে ওকাকুরার বিষয়ে দুটি গ্রন্থে মিস ম্যাকলাউডের জাপানে যাওয়া এবং ওকাকুরার কাছে শিল্পশিক্ষার পাঠ গ্রহণ করার কথা বলেছেন। শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' (৫ম খণ্ড) গ্রন্থে উপরোক্ত তথ্যটুকু জানিয়েছেন। ওকাকুরার প্রস্তাবিত ভারতভ্রমণের বিষয়ে মিস ম্যাকলাউডের কাছ থেকে খবর পেয়ে স্বামীজী বিশেষ আনন্দিত হন। ইয়াসুকো হোরিওকার লেখা থেকে জানা যায়, ওকাকুরা কলকাতায় উপস্থিত হয়েছিলেন ১৯০২ সালের জানুয়ারি মাসে। ওকাকুরার সঙ্গে ছিলেন জাপানি যুবক হোরি। হোরির সঙ্গে স্বামীজী 'মহাস্ফূর্তি'তে ছেলেখেলা করতেন।' হোরি অল্পবয়সে ভারতে মারা যান। স্বামীজী এবং ওকাকুরার ভ্রমণবৃত্তান্ত নরেশচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিকথায় চমৎকার পাওয়া যায়। ওকাকুরার সঙ্গে বুদ্ধগয়া ভ্রমণে যাবার সম্মতি জানিয়ে বিবেকানন্দ তাঁকে লেখেন—'তথাগত যেখানে বোধিলাভ করেছেন সেখানে, আর যেখানে তিনি মানবের জন্য প্রথম বাণী প্রচার করেন সেখানে (বারাণসী) আপনার সঙ্গে তীর্থযাত্রা করতে পারলে গভীর আনন্দ লাভ করব।' (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৫ম খণ্ড পৃ ৪৬৩)। বুদ্ধগয়া ভ্রমণের পর কাশী ভ্রমণের মজাদার ছবি কাশীপ্রসাদ ঘোষের লেখনীতে ফুটে উঠেছে : "ওকাকুরাকে স্বামীজী কালাপেড়ে ধুতি, সিলকের পাগড়ী ইত্যাদি পরিয়ে সাজালেন। লোকে দেখে মনে করল নেপালের রাজবংশীয় কেউ এসেছেন। বিশ্বনাথ দর্শন করতে পাঠালেন। ওকাকুরার সঙ্গে পনর-কুড়িজন গেলেন।" (শঙ্করীপ্রসাদ বসু, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ পৃ ৪৬৪)।

স্বামী বিবেকানন্দ আর ওকাকুরার সম্পর্ক যে খুবই কাছের ছিল তার একটি প্রমাণ ওকাকুরা সম্পর্কে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা চিঠিতে 'খুড়ো' সম্বোধনের মধ্যে পাওয়া যায়। মহেন্দ্রনাথ দত্ত 'অক্রুর খুড়ার' ভগ্নাংশ কেবল ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাকার জন্য নয়, এর পৌরাণিক কাহিনীসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, 'অক্রুর যেমন মথুরা হইতে কৃষ্ণকে লইতে আসিয়াছিলেন, সেইরূপ ওকাকুরা মহাশয়ও জাপান হইতে স্বামীজীকে লইতে আসিয়াছেন ; সেই কারণে আমরা তাহাকে অক্রুর খুড়া বলিয়া ডাকি।' নিবেদিতা জাপান না যাওয়ার কারণ হিসাবে শুধু স্বাস্থ্যগত কারণ নয়, অন্য কিছু অনুমান করে মিস ম্যাকলাউডকে চিঠিতে তা জানিয়েছিলেন। একদিন নৌকাড়ুবিতে ওকাকুরার প্রাণসংশয় যে হয়েছিল —বিবেকানন্দ সারা বুলকে এক চিঠিতে সেই সংবাদ

জানিয়েছেন। পুনরায় ওকাকুরা, হোরি, ওডা বুদ্ধগয়া গিয়েছিলেন। শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর সুবিশাল গবেষণা-গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্যে জানিয়েছেন যে এরপর ওকাকুরা নিবেদিতার সঙ্গে মায়াবতী গিয়েছিলেন। হয়তো এই মায়াবতী গমনের নেপথ্যে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। রাজনীতির সঙ্গে নিবেদিতার জড়িয়ে পড়া বিবেকানন্দের পছন্দ ছিল না। তবু প্রকাশ্যে কিছু না বললেও বিবেকানন্দ সারা বুলকে চিঠিতে জানিয়েছেন, ওকাকুরার সঙ্গে তাঁর দেখা হলে তাঁর অভিপ্রায় তিনি জানতে পারবেন। সিসটার ক্রিস্টিনকে লেখা চিঠিতে এই সংবাদ পাওয়া যায় যে ওকাকুরার কলকাতায় থাকা কয়েক সপ্তাহ থেকে বেড়ে কয়েক মাস হয়। তারপর সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ভারতভ্রমণের উদ্দেশ্যে ওকাকুরা বেরিয়ে যান। ভগিনী নিবেদিতার চিঠিতে তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের হদিশ পাওয়া যায়। বিবেকানন্দ-ওকাকুরার মিলনে বিবেকানন্দ যেন তাঁর হারানো ভাইকে ফিরে পেয়েছিলেন। কিন্তু উভয়ের পথ যে আলাদা। তাই স্বামীজী ওকাকুরাকে তাঁদের সঙ্ঘে যোগদানের আমন্ত্রণ জানালেও ওকাকুরা জানালেন যে 'এই পৃথিবীর লেনদেন তাঁর শেষ হয় নি।' তাই কাছে এলেও রূপরসের বাসনায় আন্দোলিত ওকাকুরাকে ব্যর্থপ্রেমের যন্ত্রণা সহ্য করে ভারতে আসতে হয়েছিল। শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন একটি ঘটনা—'ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৩৬) রোমা রোলাঁকে জানান "বিবেকানন্দ তাঁকে (ওকাকুরাকে) বলেছিলেন, এখানে আমার সঙ্গে আপনার কিছুই করণীয় নেই। এখানে তো সর্বস্বত্যাগ। রবীন্দ্রনাথের সন্ধানে যান। তিনি এখনো জীবনের মধ্যে আছেন।' ওকাকুরা রবীন্দ্রনাথের সন্ধানে গিয়েছিলেন।" (দিনপঞ্জী) এখানেই পথ আলাদা হল। ধর্মের প্রশস্ত ভূমিতে দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দ ওকাকুরাকে আহ্বান করে-ছিলেন। কিন্তু ওকাকুরা বিবেকানন্দের এই আহ্বানে সাড়া দিতে পারেন নি। স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেছেন : "বালকটিকে আমি ভালবাসি। অমন ভালোত্ব ও মহত্ত্ব আমি দেখি নি।" নিবেদিতা মনে করেছেন, "এ হল ওকাকুরার প্রতি তাঁর আশীর্বাদ।" রূপ ও রসের তাড়নায় আন্দোলিত ওকাকুরার জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করলে ওকাকুরার জীবনের মহৎ দিকগুলিই আকৃষ্ট করে। ওকাকুরার ঘটনাবহুল জীবনের দিকে চোখ ফেরালে এই

কথারই সত্যতা প্রমাণিত হবে। ঠাকুরবাড়ির কন্যার প্রেমে পড়েছিলেন—শঙ্করীপ্রসাদ বসুর অনুমানের খবর ঠিক নয়। তবে প্রিয়ম্বদা দেবীর প্রতি ওকাকুরা আকৃষ্ট হয়ে-ছিলেন। পুরোনো 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি'তে' এই বিষয়ে আগ্রহী পাঠক অনুসন্ধান করতে পারেন।

দুই

স্বদেশের শিল্পসংস্কৃতির জগতে কৃতকীর্তি ওকাকুরা টেনশিনকে এক শোকনিবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা জানিয়ে-ছিলেন এই উক্তিতে : 'জাপানের কালরাত্রির অন্ধকার-পটে...তমোহন্ত্রী পূর্ণচন্দ্র।' ওকাকুরা কাকুজোর জন্ম হয়েছিল ১৮৬২ সালের ২৬ ডিসেম্বর। জনাকীর্ণ ব্যস্ত শহর ইয়োকোহামাতে তাঁর জন্ম হয়েছিল এমন একটা সময়ে যখন জাপান আত্মপ্রচেষ্টার পথে পা বাড়িয়েছে। ওকাকুরার জন্ম তাঁর পরিবারে বিরাট আনন্দের সঞ্চার করেছিল। কারণ প্রথম সন্তান খুবই রুগ্ণ থাকায় স্বাস্থ্যবান এই দ্বিতীয় পুত্রের জন্মে আনন্দিত ওকাকুরার পিতা বাড়িতেই এক বিরাট আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। কাকুজোর পিতা একজন সামুরাই ছিলেন। ওকাকুরার পিতার প্রথমা স্ত্রী অল্পবয়সে মারা গিয়েছিলেন। ওকাকুরার পিতার ব্যাবসার পরিধি ইতি-মধ্যে বাড়তে শুরু করে দিয়েছিল এবং পারিবারিক প্রয়োজনেই ওকাকুরার পিতাকে দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করতে হয়েছিল। এই দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভেই ওকাকুরা কাকুজোর জন্ম হয়। ওকাকুরার আট বছর বয়সে তাঁর মা মারা যান। তাঁর বয়স নয় হলে তাঁকে ইংরেজি শেখার জন্য একটি বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। এই সময় তাঁর বাবা তৃতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। কাকুজোর সৎমা আসার আগেই তাঁকে একটি বৌদ্ধমন্দিরে পুরোহিতদের কাছ থেকে চীনা ধ্রুপদী সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য পাঠানো হয়। পাশাপাশি ইয়োকোহামার স্কুলে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাও চলে। ১৮৭৩ সালে সিলক স্টোর বন্ধ করে দেওয়ায় ওকাকুরার বাবা টোকিয়ো শহরে একটি সরাইখানা খোলেন। বৌদ্ধ মন্দিরে পাঠরত কাকুজোকে ডেকে পাঠানো হল তাঁর পরিবারে যোগদানের জন্য। কাকুজোর ছাত্রজীবন টোকিয়োর নতুন বাড়িতে ভালোই চলেছিল। এর কিছুদিন পর তিনি টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের

বিদেশী ভাষা শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান করেন। এই সময় কাকুজো বৃত্তিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৭ সালে বিদেশীভাষাশিক্ষণকেন্দ্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি বিভাগে (আইন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিকিৎসাবিদ্যা) বিভিন্ন দেশ থেকে প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের নিয়ে আসা হত। কাকুজো আর্নস্ট ফেনোলোসার দর্শনপঠনশিক্ষাক্রমে ছাত্র হিসাবে যোগদান করেছিলেন। ফেনোলোসা ছিলেন হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। কাকুজো ইংরেজি সাহিত্য পাঠ করেন উইলিয়ম হর্নের কাছে। তিনি রাজনীতি, অর্থ-নীতি, জাপানি ও চীনা সাহিত্য অধ্যয়ন করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন একটি রেস্তোরাঁয় ছাত্ররা সাহিত্য নিয়ে বিতর্কে যোগ দিত। কাকুজোকে দেখা গেছে ভিকতর উগোর 'লে মিজারেবল' নিয়ে যুক্তিজাল বিস্তার করতে নিজ মতামতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। প্রথানুগ বিদ্যাচর্চার পাশাপাশি কাকুজো সেইকো ওকাকুরার কাছে (এক মহিলা চিত্রশিল্পী) চিত্রবিদ্যা চর্চা করেন। কিন্তু চিত্রবিদ্যায় রস না পেয়ে তিনি এক কবিগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হন। সেই গোষ্ঠীর নাম সি সু সা (পোয়েট্রি ওয়াইন গ্রুপ)। এই সময় 'কানসী'তে কবিতা লেখা খুবই জনপ্রিয় ছিল। প্রতি সন্ধ্যাতে এক বাঁশবাগানে মিলিত হয়ে এই গোষ্ঠীভুক্ত কবিরা কবিতা ও মদ্যপানের মিলিত আসর বসাতেন। কাকুজো এইসব আসরে নিত্য যোগ দিতেন।

ইয়াসুকো হোরিওকা জানিয়েছেন, কাকুজো নিজেও অনেক 'কানসী' কবিতা রচনা করেছিলেন। পনেরো বছর বয়সে লেখা প্রথম কবিতাটি চিত্রবিদ্যার শিক্ষয়িত্রী সেইকো ওকাকুরাকে উৎসর্গ করে লেখা। কাকুজো নিজে একটি বাদ্যযন্ত্রের চর্চা করেছিলেন যার নাম 'কোটো'। বাদ্যযন্ত্রটিতে তেরোটি তার ছিল। পুত্রের সংগীতচর্চায় শঙ্কিত পিতা তাঁর বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন করলেন। সতেরো বছরের কাকুজোর সঙ্গে পনেরো বছরের মোটো-কোর পরিণয় হল। বিয়ের পরও কাকুজো তাঁর পড়াশুনো চালিয়ে গিয়েছিলেন। এই সময় কাকুজো তাঁর পাঠক্রমের জন্য একটি গবেষণাপত্র তৈরি করছিলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর দাম্পত্যকলহ হবার পর তাঁর স্ত্রী গবেষণাপত্রের পাণ্ডুলিপিটি আগুনে ফেলে দিলে তা ভস্মীভূত হয়। পরে তিনি 'শিল্পতত্ত্ব' বিষয়ে গবেষণাপত্র লিখে স্নাতক হন। ফেনোলোসার সঙ্গে ইতিমধ্যে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। ছাত্রজীবনে এবং তার পরে ফেনো-লোসার সঙ্গে জাপানি শিল্প বিশেষত ধর্মমন্দিরগুলির শিল্পসংগ্রহ এবং অন্যান্য পুরাতন শিল্পসামগ্রী নিয়ে কাজ করেন। ১৮৮৫ সালে অধ্যাপক ফেনোলোসার উৎসাহে 'কানগা কাই' নামে একটি সংঘ গঠন করে তিনি ওই উদ্যোগের নেতৃত্ব দেন। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে সরকারি শিল্পবিদ্যালয় 'বিজুৎসু গাক্কোন' শিল্প-বিভাগের প্রধান হিসাবে ওকাকুরা যোগদান করেন। ১৮৯৩ সালে চীন ভ্রমণে যান। টেনশিন চরিত্রে ছিল 'অনমনীয়তা ও সহজাত কর্তৃশক্তির সঙ্গে নাটকীয়তার সমন্বয়।' টেনশিনের বাক্তিত্বের গুণে প্রতিষ্ঠা সহজেই এসেছিল। এলিসি গিগ্লি ওকাকুরার জীবনী লেখার সূত্রে মন্তব্য করেছেন :

> "এই দ্বৈত ব্যক্তিত্ব তাঁর জীবনের প্রধান ঐকাসূত্রটিকে চানে সাহায্য করেছিল। তা চূড়ান্তরূপ পেল, যখনই তা একটি সূত্রে সংহতরূপ পেল। সংক্ষেপে বলতে গেলে প্রাচীন ভাবনাকে আয়ত্ত করা এবং তাকে নতুন ভাষার পরিবেশনের ক্ষমতা তাঁর ছিল। এইভাবে তিনি দুই সভ্যতার সংযোগকারী হয়েছিলেন।"

হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১১ সালে তাঁকে 'মাসটার অব আর্টস' উপাধি প্রদানের সময় ওকাকুরার চরিত্রে ঐতিহ্য ও সাধনার মর্যাদাদানের প্রয়াস লক্ষ্য করে বলেছিলেন :

> "ওকাকুরা কাকুজো প্রাচ্যদেশীয় গবেষণার ক্ষেত্রে অনন্য ছিলেন। তাঁর গভীরতার সঙ্গে অন্য কারো তুলনা করা চলে না। পাশ্চাত্য থেকে যেটুকু গ্রহণযোগ্য, ঠিক সেই-টুকুই গ্রহণের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। জাপানের ধ্রুপদী ঐতিহ্যকে গভীরভাবে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে চর্চা করতে ও রক্ষা করতে তিনি কঠোরভাবে অনুশীলনের পক্ষপাতী ছিলেন।"

ওকাকুরা কাকুজোর চরিত্রের মধ্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষের উপস্থিতি আছে। উত্তরকালে তাই তাঁকে বিশ্ব-মানবের দুয়ারে এশিয়ার জয়গাথাকে তুলে ধরতে উদ্বোধিত করেছিল।

১৮৮৬ সালে চব্বিশ-বছর-বয়সী কাকুজো দুই সন্তানের জনক। তিনি অধ্যাপক ফেনোলোসার সঙ্গে ইউরোপ-আমেরিকা ভ্রমণে যান। এইসময় আমেরিকায়

জাপানি রাষ্ট্রদূত রুইচি কুকি তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বললেন। ওকাকুরা রাজি হন। একথা সত্য যে ওকাকুরার সঙ্গে এই ভদ্রমহিলার মানসিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৮৮ সালের অকটোবর মাসে রাজদেশে 'সরকারি শিল্পবিদ্যালয়' খোলা হয়। যদিও প্রথম শিল্পবিদ্যালয় খোলা হয়েছিল ১৮৭৬ সালে, তবু পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় ছাত্ররা সেই বিদ্যালয় ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কাকুজো তাঁর 'আইডিয়ালস অব দি ঈস্ট' গ্রন্থে প্রথম শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে লিখেছেন। দ্বিতীয় শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পেয়ে ওকাকুরা ফেনোল্লোসা, হোগাই এবং অন্যান্যদের সহযোগিতায় এবং অধ্যাপক হামাও-এর নির্দেশনায় তাকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। হোগাই-এর মধ্যে ওকাকুরা বিশিষ্ট শিল্প-প্রতিভা আবিষ্কার করেছিলেন। হোগাই-এর বাড়িতে ওকাকুরা, ফেনোল্লোসা নিয়মিত যেতেন এবং সখ্যসূত্রে তাঁরা আবদ্ধ হয়েছিলেন। হোগাই অল্পবয়সে মারা যান। এরপর গাহো নামে একজন শিল্পী এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হন। ইতিমধ্যে ফেনোল্লোসা আমেরিকাতে ফিরে গিয়েছিলেন। তিনশ পঞ্চাশ জন আবেদনকারীর মধ্য থেকে ওকাকুরা মাত্র পঞ্চাশ জনকে এই বিদ্যালয় ভরতির জন্য নির্বাচিত করেন। নতুন পোশাক ছাত্রদের জন্য নির্বাচন করলেন ওকাকুরা। শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হল না। শিক্ষকরা অনেকেই এই পোশাক পছন্দ না করলেও ওকাকুরা নিজে এই পোশাক পরে আসতেন। ১৮৯০ সালে তিনি এই বিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন। ছাত্রদের কাছে ওকাকুরার বাণী ছিল :

"...tried to reconstruct the national art on a new basis whose Keynote should be 'Life true to self".

কাকুজোর কর্মতৎপরতা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য ছিল। ছাত্রদের নববর্ষ উদ্‌যাপনে যেমন তিনি তাদের সঙ্গী, আবার বিদেশী অভ্যাগতদের আপ্যায়নেও তিনি অগ্রণী। প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে সাকী (মদ) সহযোগে আলোচনার আসর বসত। এরই ফলে বাড়ির ভাঁড়ার মাঝে-মাঝে শূন্যের কোঠায় পৌঁছে যেত। ওকাকুরা 'কোক্কা' (জাতীয় ফুল) নামে একটি জাপানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। কাকুজো এবং তাঁর বন্ধুরা নিয়মিত এই পত্রিকার লেখক ছিলেন। কাকুজো জাপানি শিল্পকলা বিষয়ে বক্তৃতা শুরু করেন। তাঁর বিশেষ দুঃখ ছিল যে কেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জাপানি শিল্পকলার ইতিহাস লেখা হয় নি? তিনি লিখেছিলেন,

"লোকেরা বলে, ইতিহাসের অর্থ 'যা ঘটে গিয়েছে'—তারই ইতিবৃত্ত অর্থাৎ 'মৃতবস্তু'। এই কথা ভ্রান্ত। ইতিহাস টিকে আছে এবং কাজ করে আমাদের মধ্যেই। অতীত কেঁদে মরে এবং হেসে ওঠে আমাদেরই চোখের জল আর হাসিকে সম্বল করে।"

কাকুজো শিল্পরহস্য ব্যাখ্যা করে আরো বলেছেন, "শিল্প এক অবিচ্ছন্ন প্রবাহ। এই প্রবাহ চিরন্তন—এর কোন শেষ নেই। এই প্রবাহ বিকাশশীল এবং তা শল্যবিদের ছুরিকে অগ্রাহ্য করে অগ্রসর হয়।"

১৮৯৩ সালে কাকুজো তাঁর প্রাতুষ্পুত্র হায়াজাকির সঙ্গে চীনভ্রমণে যান। কাকুজো দেশে ফিরে আসেন ওই বছরেই এবং জাপানের বিভিন্ন স্থানে তাঁর কাজের সূত্রে ঘুরে বেড়ান। এই সময় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে প্রেমের যে নিঃশব্দ আনাগোনা চলছিল তা ক্রমশ প্রকাশ হয়। তাঁর সেই সন্তানসম্ভবা প্রণয়িনীর প্রেমে ওকাকুরা হয়েছিলেন মগ্ন। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে এই অবৈধ প্রেমের জগৎ থেকে দূরে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। ওকাকুরা এই সময় মদ্যপান এবং বিশৃঙ্খল জীবনের মধ্যে ডুবে ছিলেন। পরে সেই প্রণয়িনীকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হলে ওকাকুরা পারিবারিক জীবনে পুনরায় সুস্থিত হন। এই ঘটনার সুযোগ নেয় ওকাকুরার বিরোধী গোষ্ঠী। তারা ওকাকুরার নামে অপবাদ রটায়। কাকুজো পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাঁর বন্ধুদেরও পদচ্যুত করা হয়। ১৮৯৮ সালের মারচ মাসে তাঁকে টোকিও শিল্পবিদ্যালয়ের সভাপতির পদ থেকে অপসারণ করা হয়। নিঃসঙ্গ কাকুজো তখন কপর্দকহীন। তাঁর সঙ্গে আরো সতেরোজনের অবস্থা একই রকম ছিল। তাই তাদের মুখ চেয়ে কাকুজো নতুন কিছু করার কথা ভাবলেন। এই অবস্থায় তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য 'নিপ্পোন বিজুৎসু ইন' প্রতিষ্ঠা করেন। একজন গবেষক ওকাকুরা তেনশিন প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"তাঁর (ওকাকুরার) মতে আধুনিক কোনো শিল্পীর লক্ষ্য হওয়া উচিত আত্মসচেতনভাবে নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখা, কোনো প্রথা বা প্রভাবের বশীভূত না হওয়া এবং নিজের কাজের পক্ষে সহায়ক সুযোগগুলির উপরে কর্তৃত্ব অর্জন।" (অবনীন্দ্রনন্দনতত্ত্ব—সত্যজিৎ চৌধুরী)।

নিজের উত্তরাধিকারের স্বরূপ সন্ধানের মধ্যেই এবং অতীতে অর্জিত কীর্তির স্তর অতিক্রম করে নিজের প্রতিভার বিকাশ করা—ছাত্র আর শিষ্যদের প্রতি এই ছিল ওকাকুরার উপদেশ। ওকাকুরার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে যে কয়েকজন ছাত্র জাপানি শিল্পকলার নবজাগরণে সাহায্য করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন তাইকান (১৮৬৮-১৯৫৮) যিনি অবনীন্দ্রনাথের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন, হিশিদা (১৮৭৪-১৯১১)। এঁরা দুজন ছাড়াও শিমোমুরা কানজান, কিমুরা বুজান, সেইগো কোগেৎসুও বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন। ওকাকুরা চেয়েছিলেন, তাঁর ছাত্ররা পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে যেমন আয়ত্ত করে নেবেন, তেমনি দেশীয় চরিত্রও বর্জিত হবে না। ওকাকুরা বলেছেন, 'সব উদ্যোগের আড়ালে থাকবে অবিচল, আত্মস্থ শিল্পী ব্যক্তি, তিনিই এই যুদ্ধে সার্বভৌম সেনাপতি।' তবু ওকাকুরা নিজে তৃপ্তি পান নি 'নিপ্পোন বিজুৎসু ইন'-এ। তিনি নিজেই সরে দাঁড়ালেন এবং ভারতভ্রমণের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলেন। ১৯০৩ সালের গ্রীষ্মকাল ওকাকুরা ইজুরা নামে সমুদ্রতীরে কাটালেন। সারাদিন পাহাড়ের নীচে বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, পাইনগাছ আর সাদা বালিতে চিকচিক করা জায়গাটা পছন্দ হতেই কিনে নিলেন। ১৯০৪ থেকে ১০ই ফেব্রুয়ারি আমেরিকার সিয়াটোল শহরে পৌঁছলেন। সঙ্গী দুজন শিষ্য—টাইকান, সুনেসো। সিয়াটোল থেকে ট্রেনে চেপে নিউইয়র্ক। তাঁর সঙ্গীরা যখন নিউইয়র্কের প্রদর্শনীর আয়োজনে ব্যস্ত, তখন ওকাকুরা বোসটনে পৌঁছলেন সেখানকার চীনা আর জাপানি বিভাগে সংগ্রহশালার পরামর্শদাতার পদ গ্রহণের জন্য। ওকাকুরার হিতাকাঙ্ক্ষীদের অন্যতম ছিলেন মিসেস ইসাবেলা স্টুয়ার্ট গার্ডনার। নিউইয়র্কের প্রদর্শনী বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হল। কিন্তু ওকাকুরা বোসটনেই থেকে গেলেন। ইসাবেলা গার্ডনারের বাড়ির দেওয়ালে চাঁদের সৌন্দর্যে মোহিত ওকাকুরা চমৎকার একটি কবিতা লিখেছিলেন,

"The stars have dissolved
To make a crystal night
Fragnance floats
unseen by flowers ;
Echoes waft
Half answered by darkness.

ওকাকুরা কাকুজো ১৯০৪ সালে সেনট লুইস বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাদানের পূর্বে তাঁর পরিচিতি দেওয়া হয়েছিল শিল্পসমালোচক, পরামর্শদাতা এবং 'আইডিয়ালস অব দি ঈস্ট' গ্রন্থের প্রণেতা। ওকাকুরার বক্তৃতার বিষয় ছিল 'চিত্রকলায় আধুনিক সমস্যাবলী'। এই সময়েই ওকাকুরার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'দি আওয়েকনিং অব জাপান' (নভেমবর, ১৯০৪) নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। জাপানের ইজুরাতে থাকার সময় তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, পশ্চিম থেকে শিক্ষণীয় যেমন অনেক কিছু আছে, তেমনি তার পাশাপাশি এশিয়া মহাদেশই সমস্ত প্রেরণার উৎস। ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউরোপভ্রমণ শেষে তিনি জাপানে ফিরে আসেন। ইজুরার সমুদ্রতীরে বসে ওকাকুরা তাঁর আমেরিকান বন্ধুদের কাছে যে জাপানের চাপানের আসরের মধ্যে উৎসবের পবিত্রতা আছে তা বোঝানোর জন্য একটি বই লিখতে শুরু করেন। অনতিবিলম্বে ১৯০৬ সালে 'দি বুক টী' প্রকাশিত হয়েছিল। এই বিষয়ে ওকাকুরা লিখেছেন,

"but scarecely any attention has been drawn to Tea-ism, which represents so much of our art of life."

এই কথাটিই রবীন্দ্রনাথ 'জাপান-যাত্রী' গ্রন্থে লিখেছেন—

'সেদিন একজন ধনী জাপানি তাঁর বাড়িতে চা পান অনুষ্ঠানে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তোমরা ওকাকুরার 'বুক অব টী' পড়েছ, তাতে এই অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। সেদিন এই অনুষ্ঠান দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, জাপানের পক্ষে এটা ধর্মানুষ্ঠানের তুল্য। এ ওদের একটা জাতীয় সাধনা। ওরা কোন আইডিয়ালকে লক্ষ্য করছে, এর থেকে তা বেশ বোঝা যায়।'

'দি বুক টী' (১৯০৬) গ্রন্থে কাকুজো এক বিখ্যাত চা-শিল্পী রিকিউর জীবনের এক মর্মান্তিক অধ্যায়ের কথা লিখেছেন—যে কাহিনী যুগের পর যুগ জাপানিদের জীবনে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে এসেছে।

১৯০৬ সালে ওকাকুরা দ্বিতীয় বার চীনযাত্রা করেন।

১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বোসটনে কিউরেটরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বোসটনে তাঁর থাকার মেয়াদ এবারে বেশি দিনের হয় নি। ১৯০৮ সালে তিনি ইউরোপ আর চীন ভ্রমণ করে জাপানে ফিরে আসেন। এই বছরেই তাঁর প্রিয় বন্ধু গাহো মারা যান। অবসর সময়ে কাকুজো জাপানের কিছু রূপকথার গল্পকে অনুবাদ করেন। এই গল্পগুলির মধ্যে ইয়োসিংসুনের গল্প জাপানিদের কাছে খুবই প্রিয় ছিল। এ ছাড়াও বীরত্বমূলক আরো কিছু গল্প কাকুজো অনুবাদ করেন। ১৯১১ সালে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কাকুজোকে 'মাসটার অব আর্টস' ডিগ্রী প্রদান করে। কাকুজোর শরীর ইতিমধ্যে ভেঙে পড়ছিল। এই অবস্থায় তিনি জাপানে ফিরে আসেন। ১৯১২ সালের অগস্ট মাসে ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করেন। কলকাতায় সেপটেম্বর মাসের প্রথম দিকে পৌঁছান। ১২ই অকটোবর বোমবাই থেকে বোসটনের উদ্দেশে যাত্রা করেন। এরই মধ্যে কাকুজো আর-একটি জাপানি লোক-কাহিনী অনুবাদ করেন। কাহিনীটির নাম 'সাদা শিয়াল'। ১৯১৩ সালের ২রা সেপটেম্বর ওকাকুরা কাকুজো বাহান্ন বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তাঁর জীবনাবসান হয়। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর বোসটন মিউজিয়মের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল—কিপলিঙের সেই উক্তি—'পূর্ব পূর্বই, পশ্চিম পশ্চিমই। এই দুটৌদরিক কোনভাবেই মিলবে না। কিন্তু তারা মিলেছিল ওকাকুরা কাকুজোর মধ্যে।'

তিন

ওকাকুরা কাকুজো সম্পর্কে বর্তমান নিবন্ধের গোড়াতে বলে হয়েছে বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী এবং বিপ্লব-আন্দোলনের নেতৃবর্গের সঙ্গে ওকাকুরার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ওকাকুরার দুবার ভারতভ্রমণে বিপ্লবী-মহল উৎসাহিত হয়েছিলেন, পাশাপাশি বঙ্গীয় চিত্রকলার জগতেও সাড়া পড়েছিল। ওকাকুরাকে দেখে অবনীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল—

"বেঁটেখাটো মানুষটি, সুন্দর চেহারা, টানা চোখ, ধ্যাননিবিষ্ট গম্ভীর মূর্তি। বসে থাকতেন ঠিক যেন এক মহাপুরুষ। রাজভাব প্রকাশ পেত তাঁর চেহারায়।"

অবনীন্দ্রনাথের এই দেখার মধ্যেও সম্ভ্রমবোধের দৃষ্টান্ত। ঘনিষ্ঠভাবে প্রথম দেখার সময় মেলামেশা না হলেও তিনি নিশ্চয়ই তাঁর মতামত সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ওকাকুরার 'আইডিয়ালস অব দি ঈস্ট' (১৯০৩) প্রকাশিত হয়েছিল সুদূর ইংল্যানডে এবং ভারতে সেই বই পৌঁছবার পর জনমানসে যে গভীর প্রভাব পড়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় :

...'আমেরিকায় কিছুকাল অবস্থিত ও ইংরেজী শিক্ষিত একজন বিশিষ্ট লেখক, আর্টসমালোচক ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ওকাকুরা এসেছিলেন। তিনি একজন আদর্শ সামুরাই জাপানী চেহারার, ধরণধারণে, পোশাক-পরিচ্ছদে, সর্বদিকে চৌকস, জাতীয়তায় ভরা, এসিয়ার ঐক্যবদ্ধে অনুপ্রাণিত, এসিয়ার প্রতি অংশকে শ্যাম, জাভাদ্বীপ এবং ভারতবর্ষ থেকে আরম্ভ করে পারস্য পর্যন্ত প্রতি খণ্ডটিকে দেশাত্মবোধে কানায় কানায় ভরে দেওয়ায় 'আগ্রহবান।...তাঁর বইয়ের অন্তর্গত ভাব ও বাণী বাঙলা থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত মুখে মুখে প্রচার হতে থাকল, লাজপৎ রায় প্রমুখ দেশভক্তের লেখনীতে লেখনীতে প্রতিফলিত হতে লাগল।" ('জীবনের ঝরাপাতা', সরলাদেবী পৃ ১৫০)।

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে জাপানি শিল্পী ওকাকুরা উঠেছিলেন। ক্লীক রোর হেম মল্লিকের সঙ্গে ওকাকুরার ভাব ছিল। ওকাকুরার জাপানে ফিরে যাওয়ার সময় হেম মল্লিকের এক পুত্র তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে' লিখেছেন— "...এই পুস্তকে ওকাকুরা বলিয়াছেন যে, এশিয়া মহাদেশের কৃষ্টি এক। এই অধ্যাপকটি একটি আজগুবী গল্প প্রচার করিলেন যে, এশিয়ার সমস্ত স্বাধীন দেশগুলি এই ভূখণ্ডে ইউরোপীয় আধিপত্য বিনষ্ট করিবার জন্য সংঘটিত হইয়াছে, 'ভারত কেবলই ঘুমায়ে রয়।"

'আজগুবী গল্পের রচয়িতা' ওকাকুরা সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সন্দেহ প্রকাশ করেছেন,

"With the publication of the book, a furrore went amongst the intellectuals of India. It was alleged that he was the bearer of Pan Asiatic Mission to unite the Asian countries against oriental Imperialism."

ওকাকুরার জীবনী আর চিঠিপত্র এবং জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাস তথা অভিপ্রায় সম্পর্কে বিশদ

পড়াশুনা করে উপরোক্ত অভিমতের সপক্ষে সায় দেওয়া সম্ভব নয়। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতো সরলা দেবী ওকাকুরার কার্যকলাপে জাপানিদের ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যবাদীর নগ্ন রূপ আশঙ্কা করেছেন। তবে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে না। ওকাকুরার বাণী ছিল :

1. Asia is one.
2. Asiatic races form a single mighty web.
3. The task of Asia today, then, becomes that of protecting and restoring Asiatic modes. But to do this she must herself first recognise and develop consciousness of these modes. For the shadows of the past are the promise of the future. No tree can be greater than the power that is in the seed. Life lies ever in the return to self."
4. Victory from within, or mighty death without."

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম' গ্রন্থে অনুশীলন সমিতির উৎপত্তির ইতিহাস প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র বসুর বিবৃতি থেকে জানা যায় যে বাংলাদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা জাপানি অধ্যাপক ওকাকুরাকে সাদরে ডেকে আনেন "কিন্তু কোন সমিতি ইঁহারা গঠন করেন নাই। পি. মিত্র এবং হেম মল্লিক অনুশীলন সমিতির ছেলেদের ওকাকুরার সঙ্গে মিশিতে দেন নাই।" (পৃ ১৮২) এর কারণ অজ্ঞাত। যে হেম মল্লিকের ওকাকুরা অতিথি তাঁর সঙ্গে মিশতে না দেওয়ার অর্থ কী? তবে 'আত্মোন্নতি সমিতির ইতিহাস'-এ ইন্দ্রনাথ নন্দীর বিবৃতিতে যা বলা হয়েছে তা ঠিক নয় :

"জাপানী ওকাকুরা 'আইডিয়ালস অব দি ঈস্ট' পুস্তকের প্রতিপাদ্য তথাগুলি মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে ভগিনী নিবেদিতাকে দেন। তাহাতে নিবেদিতা উক্ত পুস্তক লিখেন। ফলতঃ ইহাই নিবেদিতার লিখিত পুস্তক। ওকাকুরা ইংরেজী কম জানিতেন।"

(ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম গ্রন্থে উদ্ধৃত পৃ ২০৭)।

যিনি ছাত্রজীবনে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করেছেন, চাকুরিসূত্রে আমেরিকাতে কাটিয়েছেন, তিনি ইংরেজি ভাষায় প্রজ্ঞাতীত দক্ষতা অর্জন না করলেও তাঁর ক্ষমতাকে ন্যূন করে দেখা বোধহয় ঠিক নয়। নিবেদিতা বইটি লিখে দিয়েছেন—এই তথ্যটি ভুল। ওকাকুরা দ্বিতীয়বার কলকাতায় এসে লক্ষ করেছিলেন—

"দশ বছর আগে যখন আমি এসেছিলাম তখন তোমাদের আজকালকার আর্ট বলে কিছুই দেখি নি। এবারে দেখছি তোমাদের আর্ট হবার দিকে যাচ্ছে। আবার যদি দশ বছর বাদে আসি তখন হয়তো দেখব হয়েছে কিছু।"

(জোড়াসাঁকোর ধারে)।

অবনীন্দ্রনাথ নতুন ধারার তত্ত্বধারক ছিলেন, তেমনি এর প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উৎসাহদাতা ছিলেন ওকাকুরা। ওকাকুরার কাছ থেকে এঁদের উপকৃত হবার সংবাদ জানিয়ে হিদোতাকি শিমোমুরা লিখেছেন :

"শিল্পকর্ম ও সমালোচনায় প্রাজ্ঞ তেনশিন যখন ঠাকুরদের সঙ্গে থাকতেন, তখন শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীরা, যেমন গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল বসু মাঝে-মাঝে তাঁর কাছে এসে বসতেন। স্বভাবতই তেনশিনের সঙ্গে এঁদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং এঁদের তিনি প্রভাবিত করেন।" (হিদোতাকি শিমোমুরা সম্পাদিত 'তেনশিন এবং তাঁর চিঠিপত্র' 'অবনীন্দ্রনন্দনতত্ত্ব—সত্যজিৎ চৌধুরী থেকে উদ্ধৃত)

অন্তরঙ্গ সম্পর্কের আরো একটি সংবাদ শিমোমুরার লেখাতে পাওয়া যায়। অবনীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথকে বিশেষ উপহারদানের ইচ্ছার বিষয়ে তেনশিন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু নাগাও উজানকে এই অকটোবর, ১৯১২ সালে

"এখানে দুই ভাই আছেন, যাঁরা ভালো শিল্পী। বড়জনের নাম স্বর্গের ইন্দ্র [তেন তাইশাকু ; তেন স্বর্গ, তাইশাকু=ইন্দ্র], ছোটজনের নাম ধরণীর ইন্দ্র [চি তাইশাকু, চি=ধরণী]। আমি তাঁদের সাঁচ উপহার দিতে চাই। রঙের উপর দুই-তৃতীয়াংশ খোদাই করিয়ে তৈরি করিয়ো। রবটি যেন সুন্দর হয়। কিছু নকশার অলংকরণ থাকতে পারে।' (এখানে তেনশিন সাঁচের আকার এঁকে দিয়েছেন)।

(অবনীন্দ্র নন্দনতত্ত্ব—পৃ ১৯২)

শিমোমুরার লেখার মধ্যে ওকাকুরার উদার মনের ছবি স্পষ্টত ধরা পড়েছে।

চার

বর্তমান প্রবন্ধের শুরুতে বলা হয়েছে যে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ওকাকুরার সম্পর্ক গভীর সখ্যসূত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কাকুজো সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখাতে ও তাঁর স্বজনদের স্মৃতিচারণে তার পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ও কোষাধ্যক্ষ, জীবনবীমা ব্যবসায়ের অন্যতম পথিকৃৎ, রবীন্দ্রসংগীতের ইংরেজিতে নির্ভরযোগ্য অনুবাদক, সজ্জন, প্রশান্ত কিন্তু দৃঢ় চরিত্রের মানুষ ছিলেন। ওকাকুরার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল ওই বিপ্লব-আন্দোলনের মাধ্যমেই। ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন :

> "১৯নং বাড়ির আর একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব জাপানী বন্ধুদের আগমন। তার মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন ওকাকুরা কাকুজো—স্বনামধন্য জ্ঞানী ও শিল্পী, তিনি ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনে একজন বিশিষ্ট নৈপথ্য নেতা ছিলেন এবং সেই সূত্রে সুরেনের সঙ্গে যে আলাপ হয়, সেটা ক্রমে অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়। সুরেনকে তিনি খুবই ভালবাসতেন এবং আমাদের ওখানে প্রায়ই আসতেন। বেশি কথার মানুষ ছিলেন না, কিন্তু বৈদগ্ধ্যে ও ভদ্রব্যবহারে পরিপক্ক। ওকাকুরা স্বদেশের অনেক বিশিষ্ট জিনিস আমাদের উপহার দিয়েছিলেন তার মধ্যে সামুরাই বীর সম্প্রদায়ের একটি কিংখাপে মোড়া তলোয়ার প্রধান।"

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী সংজ্ঞা দেবী তাঁর স্মৃতিকথাতে ওকাকুরার সঙ্গে আলাপের কথা লিখেছেন। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ওকাকুরার গভীর রাজনৈতিক যোগাযোগের কথাও সুবিদিত। সুরেন্দ্রনাথের দৌহিত্র অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, রমেশচন্দ্র মজুমদার ও চারুচন্দ্র দত্তের লেখা থেকে উদাহরণ দিয়ে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে ওকাকুরার উৎসাহদানের কথা লিখেছেন। চারুচন্দ্র দত্ত তাঁর 'পুরানো কথা'তে লিখেছেন :

> "...আমাদের মধ্যে ছিলেন একজন জগদ্বিখ্যাত সাহিত্যিক, একজন নামজাদা বৈজ্ঞানিক, একজন জাহাজঘাটার মালিক (আমার পিতৃস্থানীয় হেম মল্লিক মহাশয়) এবং বিশ্ববিশ্রুত জাপানি শিল্পী ও ভাবুক ওকাকুরা কাকুজো। সুরেন ঠাকুর ও আমি ছিলাম কনিষ্ঠতম বিদ্রোহী।"

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও অন্তরঙ্গতার কথা নিজেও লিখেছেন। কাকুজোর উপরে লেখা একটি প্রবন্ধে নিবেদিতার বাড়িতে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ওকাকুরার দেখা হয়েছিল। সামান্য কথাবার্তার পর বিদায় নেবার আগে নিবেদিতা পাশের একটি ঘরে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখা করে যেতে বললেন। সুরেন্দ্রনাথ পাশের ঘরে গিয়ে ওকাকুরাকে বসে থাকতে দেখলেন। তিনি তাঁর সঙ্গে নিভৃতে কথা বলার জন্য একটু আগে পাশের ঘরে উঠে এসেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন,

> "What are you thinking of doing for your country? Came his first abrupt question".

আকস্মিক প্রশ্নে হতচকিত সুরেন্দ্রনাথকে নিবেদিতা সাহস দিলেন। ওকাকুরা তেজস্বী কণ্ঠে দেশের জন্য কিছু করার কথা বললেন। ওকাকুরার সঙ্গে বুদ্ধগয়া ভ্রমণ করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। সেখানে একটি কলোনি স্থাপন এবং বিশ্বের সব মানুষকে একত্রিত করার বাসনা ওকাকুরার এইরকম বাসনা হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের অনিচ্ছায় ওকাকুরার স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে গিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (অ্যাওয়েরনিং অব এশিয়া) গ্রন্থ রচনার সময় ওকাকুরার অদম্য মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কিভাবে শ্বেতাঙ্গরা পূর্বদেশের শিল্প ও সংস্কৃতিকে লুণ্ঠন করে ধ্বংস করছে তিনি পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে পড়ে শুনিয়েছিলেন। বইটি প্রকাশের পর সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন :

> "I am assailed with more than a suspicion that it was our awakening that the astute Okakura was really after."

নালন্দাভ্রমণে গিয়ে ওকাকুরার অসুস্থতা এবং তার থেকে মুক্তিলাভে ওকাকুরার মজাদার আগ্রহের পরিচয় সুরেন্দ্রনাথের লেখা থেকে পাওয়া যায়। মূল্যবান এই প্রবন্ধটি 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি'তে প্রকাশিত হয়েছিল। ওকাকুরা কাকুজো একজন বাঙালি শিল্পীকে তাঁর ছবির ত্রুটি কত সহজভাবে বুঝিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণে শোকাহত নিবেদিতাকে সান্ত্বনা দিতে ওকাকুরার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও উপস্থিত ছিলেন।

কিন্তু জাপানভ্রমণের বাসনা থাকলেও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যাওয়া হয় নি। দ্বিতীয় বার ভারতভ্রমণে এলেও ওকাকুরার মধ্যে সেই প্রাণবন্ত মানুষটিকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। অসুস্থ ওকাকুরার বিষণ্ণতা সুরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। ওকাকুরাকে অসুস্থতার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন,

> "He looks up at me with a mournful smile. Can't you understand?" is all he says."

এই শেষ দেখা। জাপান হারাল এক বিশিষ্ট সন্তান। ভারত হারাল এক মানবপ্রেমিক। বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বিপ্লবীজীবনের স্মৃতি'তে জানিয়েছেন :

> "অন্যদিকে এই সময় জাপানি অধ্যাপক ওকাকুরা কলিকাতায় আসেন। তিনিও শিক্ষিত আর অভিজাতদের মধ্যে ছড়াতেন ভারতমুক্তির মন্ত্র। ওকাকুরা ১৯০১ সালের শেষদিকে বেলুড় মঠে এসে ওঠেন।" (পৃ ১৬৫)

পাঁচ

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৯ সালের ১৫ই মে টোকিয়ো শহরে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে কয়েক বছর আগে যখন জাপানের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছিল, এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে যাঁর সংস্পর্শে তরুণ সমাজ বিশেষ উপকৃত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ওকাকুরার মধ্যে 'পূর্বদেশের কণ্ঠস্বর' শুনতে পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ওকাকুরার মধ্যে এমন একজন মানুষকে আবিষ্কার করেছিলেন যার কাজে কোন ফাঁকি ছিল না এবং যিনি পরিশ্রম করে সমস্ত অনুসন্ধান চালাতেন। ওকাকুরার কাজ ছিল উপাসনার মতো। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ওকাকুরার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল। নিষ্ঠাবান এই ব্যক্তিকে পেয়ে ভারতীয় জাতি উপকৃত হয়েছিল। তাঁর মানবিক বোধ ছিল তুলনাহীন। দেশের তরুণদের 'আত্মানং বিদ্ধি'তে অবিচল থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন ওকাকুরা। রবীন্দ্রনাথ ওকাকুরার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন 'অ্যাওয়েকনিং অব স্পিরিট ইন বেঙ্গল'।

বাংলাদেশ ও বাঙালীর বিপ্লব ও শিল্পচর্চার অর্গলমুক্তিতে এমনই এক স্বর্গীয় হৃদয়সম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন ছিল। পিয়ার্সনের স্মৃতিচারণে ওকাকুরার পরিবারে তাঁদের (রবীন্দ্রনাথের ও সঙ্গীদের) আতিথ্যগ্রহণের সুন্দর ছবি পাওয়া যায়। ওকাকুরার শিল্পসমালোচক হিসাবে কৃতিত্ব ও শিল্পভাবনা স্বতন্ত্রভাবে বিবেচ্য। তিনি 'প্যান এশিয়াটিক' তত্ত্ব উদ্ভাবনে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন—চট্টজলদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত হবে না। তার আগে এই বিরল গুণাবলী সম্পন্ন ওকাকুরা তেনশিনের জীবন থেকে আমাদের শিক্ষাগ্রহণ করার প্রয়োজন আছে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। The Life of Kakuzo—Yasuko Horioka
২। The Ideals of the East—Okakura Kakasu, Awakening of Japan, The Book of Tea).
৩. জাপানযাত্রী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৪। Freedom Struggle and Anushilan Samiti—Ed. by Buddhadev Bhattacharya.
৫। History of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission—Swami Gambhiranand.
৬. সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মশতবর্ষ গ্রন্থ—গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষ চৌধুরী সম্পাদিত।
৭. জোড়াসাঁকোর ধারে—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৮. ভারতের স্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।
৯. বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (৫ম খণ্ড)—শঙ্করীপ্রসাদ বসু।
১০. ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা।
১১. শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমালিকা (১ম খণ্ড)—স্বামী গম্ভীরানন্দ।
১২. অবনীন্দ্রনন্দনতত্ত্ব—সত্যজিৎ চৌধুরী।
১৩. বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়।
১৪. ভারতশিল্প ও আমার কথা—অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
১৫. জীবনের ঝরাপাতা—সরলা দেবী।
১৬. শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ—স্বামী নির্বেদানন্দ।

অলীক মানুষ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

পাঁচ

রাতের প্রথম যামে 'এশা'র নমাজের পর কিছুক্ষণ প্রবীণ মুসল্লিরা হুজুরের সান্নিধ্যে কাটিয়ে পুণ্য অর্জনের ফিকিরে থাকেন। প্রায় একমাস হয়ে গেল এখনও হুজুর বদিউজ্জামান স্ত্রীর রান্না খাওয়ার সুযোগই পাচ্ছেন না। মৌলাহাট অবস্থাপন্ন মানুষের গ্রাম। ভক্ত শিষ্যবৃন্দ হুজুরকে তাঁর বাড়ির খাওয়া খেতে না দেওয়ার জন্য যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বিরক্তি ধরে গেলেও বদিউজ্জামান বাধা দিতে পারেন না। এ রাতের খানা এসেছিল এক সম্পন্ন গৃহস্থ মনিরুলের বাড়ি থেকে। মসজিদ শুধুমাত্র ভজনালয়। সেখানে খাওয়াদাওয়ার বিধি নেই। মসজিদকে শয়নকক্ষ করাও বেশরিয়তি। তবে কিনা রোজার সময় দৈনন্দিন উপবাসভঙ্গকালে মসজিদের বারান্দায় বসে আহারগ্রহণ করা চলে। এদিকে মৌলানারা বুজুর্গ ব্যক্তি। তাছাড়া বদুপির নামে কিংবদন্তীসিদ্ধ পুরুষের কথাই আলাদা। তিনি নিভৃত মসজিদকক্ষে লন্ঠনের আলোয় খাওয়াদাওয়া সেরে বাইরে যখন প্রক্ষালন করতে এলেন, দেখলেন প্রধান কিছু ভক্ত বারান্দা ও খোলা চত্বরে বসে তাঁর সান্নিধ্যের প্রতীক্ষা করছে। এতক্ষণ চাপা স্বরে তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। হুজুরকে দেখে স্তব্ধ হল সসম্ভ্রমে। হুজুর অনুচ্চ স্বরে ঈশ্বরের প্রশস্তি উচ্চারণ করতে-করতে খোলা চত্বরে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাত্রিটি ছিল ঘন অন্ধকার। আকাশে জ্বল-জ্বল করছিল নক্ষত্রমণ্ডলী। বদিউজ্জামান অভ্যাসমতো সেই জ্যোতিষ্করাজ্য দর্শন করছিলেন। এইসব সময় কী এক প্রচণ্ড আবেগ তাঁকে পেয়ে বসে। মুহূর্মুহু বিস্ময়ে তিনি শিহরিত হন। ওই সেই জ্যোতির্ময় অনন্ত স্থান-কালের প্রান্তসীমা, যেখানে একদা এক রাতে পবিত্র-পুরুষ পয়গম্বর সুন্দরী নারীর মুখমণ্ডলবিশিষ্ট পক্ষি-রাজ অশ্ব 'বোররাখে'র পিঠে চেপে ঈশ্বরের আমন্ত্রণে 'উত্থিত' হয়েছিলেন! এক রোমাঞ্চকর বিস্ময় বদিউজ্জা-মানকে শিহরিত করে। ওই অনন্ত স্থান-কাল পেরিয়ে গেলে কোথায় সে পরম জ্যোতির্ময় সিংহাসন 'আরস', যাতে সমাসীন এই 'কুলমখলুকাত'—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলা-ধার, যিনি আল্লাহ্, যিনি তুচ্ছাতিতুচ্ছ এই বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন!

আর শিষ্যরা তাঁকে অন্ধকারে নক্ষত্রমুখী দেখে প্রতি

রাতেই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করেন কোনও-না-কোনও বিস্ময়-কর বার্তা শুনে পুণ্যসঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে। আজ তাঁরা দেখলেন, হুজুর একটু বেশি সময় ধরে আসমানে নজর রেখেছেন। তিনি নিশ্চয় কোনও 'মোজেজা' প্রত্যক্ষ কর-ছেন। তারাও সেটি দেখার জন্য সাগ্রহে আকাশদর্শনে উন্মুখ হল। সেই সময় বদিউজ্জামান হঠাৎ ডাকলেন, আনিসুর রহমান! মনিরুল! আপনারা আছেন কি?

বারান্দায় আলো নেই। বেঁটে একটি 'লানটিন' বা লন্ঠন জ্বলছিল মসজিদের ভিতর। আলো আঁধারি রহস্যময়তা মসজিদ চত্বরে। ডাক শুনে আনিসুর, মনি-রুল এবং বাকি প্রবীণেরা সাড়া দিলেন। বদিউজ্জামান মৃদু হেসে বললেন, হাওয়াবাতাস বন্ধ। আসুন, এখানে বসা যাক।

মসজিদ চত্বরে 'অজু' করার জন্য একটি অপ্রশস্ত চৌবাচ্চা আছে। সেটির পরিত্রাণ এবং জরাজীর্ণ দশা। তার পাড়ে হুজুরকে বসতে দেখে নিচের এবড়োখেবড়ো মেঝেয় শিষ্যরা বসে পড়লেন। মসজিদটি প্রাচীন। আজানের মিনারটি কবে ভেঙে পড়েছে। সম্প্রতি মসজিদের আমূল সংস্কারের ব্যবস্থা হয়েছে। শিগগির কাজ শুরু হয়ে যাবে। শিষ্যরা নিচে বসলে বদিউজ্জামান ব্যস্তভাবে বললেন এ কী! আপনারা নিচে বসছেন কেন? আমরা সবাই খোদার বান্দা। এখানে বসুন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁরা হুজুরের সঙ্গে ঈষৎ দূরত্ব রেখে চৌবাচ্চার নিচু পাড় ঘিরে বসলেন। তখন বদিউজ্জামান বললেন, একটা কথা বলা দরকার মনে করছি। কদিন থেকেই কানে আসছে, শফিউজ্জামানের ইংরাজি স্কুলে পড়া নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছে—

আনিসুর এখন মৌলাহাটে হুজুরের প্রধান শিষ্য। প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক। তিনি দ্রুত বললেন, তওবা! তওবা! এমন কথা কোন বেতমিজের জবান দিয়ে নিক-লেছে শুনলে তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে!

মনিরুল এবং অন্যেরাও একবাক্যে সায় দিলেন। বদিউজ্জামান একটু হাসলেন। বললেন, প্রশ্ন জাগতেই পারে। সত্যিই তো? আমরা ওহাবি ফরাজি। ইংরেজ আমাদের দুসমন। ইংরেজি হল কি না খ্রিস্তানি 'নাছারা'র (ন্যাজারেথের যিশু-অনুগামীদের) কুফরি এলেম।

আনিসুর কিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানেন। বললেন, হুজুর! আপনি কি দেওয়ানসাহেবকে বলেন নি, নচ্ছারা-দের টিট করতে হলে নাছারি বিদ্যা শেখা দরকার?

মনিরুল উষ্মা দেখিয়ে বলল, হ্যাঁ—কথাটা আমারও কানে এসেছে। আসলে দেওয়ানসাহেব যখনই আসেন, কাদু ওস্তাজিকে ঠাট্টা করে বলেন, 'আলেক-বে' শিখিয়ে কী হবে ওস্তাজি, বাংলা-ইংরেজি পাঠশালা করে মক্তব তুলে দিন। তাই বোধ করি কাদু ওস্তাজি রাগ করে বলেছেন, হুজুর মৌলানাকে গিয়ে বলুন না চৌধুরি-সাহেব। তাঁর ছেলে তো হরিণমারা স্কুলে ভরতি হয়েছে।

আরেক প্রধান শিষ্য বদরুদ্দিন লাফিয়ে উঠলেন। এক্ষুনি কাদু ওস্তাজিকে গাছাড়া করছি! ভারি আমার মক্তব খুলেছে! পেটের ধান্দা খালি। দয়া করে আমরা তাকে মক্তব খুলে দিয়েছি! নৈলে ভিখ মেঙে বেড়াত গাঁয়ে-গাঁয়ে।

বদিউজ্জামান ভর্ৎসনার সুরে বললেন, ছিঃ বদরুদ্দিন! কাদেরসাহেব মুসল্লি মানুষ। গোনাহের কাজ করবেন না!

অপর শিষ্য হাফিজ বললেন, বড়ো একগুঁয়ে মানুষ বটে। এখনও তওবা করে হুজুরের কাছে ফরাজি হলেন না। নামুপাড়ার লোকেরা যে ফরাজি হল না এখনও, কিংবা ধরুন আলাদা মসজিদে নমাজ পড়ছে, সেও ওস্তাজির সাহসে। নয় কি না বলুন আপনারা?

বিতর্ক এককথায় থামিয়ে বদিউজ্জামান বললেন, আজ রাতে আল্লার মেহেরবানিতে ঝড়-পানি হবে মনে হচ্ছে। ওই দেখুন, আসমানের কোনায় ঝিলিক দিচ্ছে। হাওয়া-বাতাস বন্ধ।

মৌলাহাটের এই মানুষগুলো সবাই কৃষিজীবী। সারা চৈতমাস গেছে। মাঝে-মাঝে একটু-আধটু ঝড় এসেছে। সবই ধুলো-ওড়ানো, গাছপালার ডাল মুচড়ে দেওয়া, পাতাছেঁড়া হিংস্র রাঢ়মাটির স্বভাবগ্রস্ত ঝড়। আকাশ ভয়ঙ্কর লাল করে দেওয়া সেইসব ঝড় মৌলা-হাটের প্রত্যাশায় মুঠোমুঠো ধুলো ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। গত জুম্মাবছরই তো কথা উঠেছিল মাঠে গিয়ে বৃষ্টির জন্য নমাজ পড়ার। হুজুর বলেছিলেন, সবুরে মেওয়া ফলে। আল্লার করুণা সময় হলেই দুনিয়াকে ভিজিয়ে দেবে। এ রাতে হুজুর আসলে আসমানে তাকিয়ে তাহলে সেই সংকেতই টের পেয়েছেন। লোকগুলো মুহূর্তে সবকিছু ভুলে দিগন্তের দিকে তাকাল। তারা

আবার শিহরিত হল নৈঋতে ঝিলিক দেখে। কেউকেউ মসজিদপ্রাঙ্গণঘেরা ভাঙা পাঁচিলের কাছে গিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে থাকল অস্ফুট উচ্চারণে। তারপর বদিউজ্জামান ঘোষণা করলেন, মেহেরবানি করে আপনারা বাড়ি যান। আমি এবার নফল (অতিরিক্ত) নমাজে বসব।

অনেক রাত পর্যন্ত বদিউজ্জামান নফল নমাজ পড়েন। তারপরও বহুক্ষণ লানটিনের আলোয় কোরান পাঠ করেন। অতি মৃদু সুরেলা সেই পাঠ। রাতের প্রকৃতির সব ধ্বনির সঙ্গে সেই ধ্বনি একাকার হয়ে ওঠে। প্রাঙ্গণের পাঁচিলের ওপর কিছু নিচু গাছ ও আগাছার ঝোপ রাতের হাওয়ায় শনশন কী এক অপার্থিব ধ্বনি তোলে। পেছনের তালগাছের বাগড়ায় সর-সর শব্দ হয়। রাতপাখি ডাকতে-ডাকতে ডানার শব্দ করে উড়ে যায়। মসজিদের শীর্ষে ঘুলঘুলি থেকে বুনো কবুতরগুলো ঘুমঘুম স্বরে হঠাৎ কখনও ডেকে ওঠে। বাদশাহি সড়কে দূরদেশের গাড়োয়ানের ঘুমজড়ানো গলার গান ভেসে আসে। আর সারবন্ধ গাড়ির চাকার টানা ঘসঘস শব্দ রাতের নিঝুমতায় চাপা ও গভীরতর হতে-হতে দূরে মিলিয়ে যায়। যাম ঘোষণা করে ব্রাহ্মণী নদীতীরে শেয়ালের পাল। এ সবই রাতের বিশ্বপ্রকৃতির শ্রুতি-ও শ্রুতিপারের এক ধারাবাহিক অর্কেস্ট্রা। আর তার মধ্যে বদিউজ্জামানের মৃদু কোরান-ধ্বনির কোনও ভিন্নতা থাকে না। পাঠ শেষ করে সেটা অনুভব করেন বদিউজ্জামান। কিছুক্ষণ বাইরে এসে দাঁড়ান। নক্ষত্রের দেশে দৃষ্টি প্রসারিত করেন। তারপর সেই বিস্ময়কর আবেগে আপ্লুত হয়ে অবশেষে ফিরে আসেন শয্যায়। তাঁর মনেও থাকে না স্ত্রীপুত্রপরিবারের কথা। খালি মনে হয় তাঁর জন্ম এ পৃথিবীতে কী এক ব্রতপালনে। অথচ এতদিন পরে হঠাৎ আজ রাতে তিনি বিচলিত বোধ করছিলেন।

তিনি শফির কথাই ভাবছিলেন কদিন থেকে। বড়ো ছেলে নূরুজ্জামান নিজের তাগিদেই সুদূর দেওবন্দ শরিফে এলেম অর্জনে গেলেও তাঁর মনে কোনও দ্বিধা বা বিষণ্ণতা জাগে নি। নূরুজ্জামান বাল্যকাল থেকে পিতার আদর্শের অনুরাগী। নিজের সঙ্গে তার পার্থক্য আজও খুঁজে পান না বদিউজ্জামান। অথচ শফিউজ্জামানকে বরাবর মনে হয় এক ভিন্ন ও অপরিচিত সত্তা। তার সঙ্গে নিজের কোনও মিল নেই। তাকে যে মক্তবে নয় পাঠশালায় ভরতি করে দিয়েছিলেন, শুধু এই গভীর গোপন কারণে—তা তো কাউকে বলা যাবে না।

আজ যখন সত্যিই মসজিদের পেছনের দেয়াল মধ্যরাতের কালবোশেখি এসে ধাক্কা দিল, কেন যেন শফির কথাই মনে পড়ে গেল তারও তীব্রভাবে। শয্যা থেকে উঠে বসলেন বদিউজ্জামান। নিবু-নিবু লন্ঠনের দম বাড়িয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে ঈশ্বরের ধ্যানে মন দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বারবার ওই কিশোর তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। আর তখন বাইরে প্রকৃতি উত্তাল। মসজিদের জানালা শুধু পূর্বদিকেই। তবু প্রমত্ত ঝড় ঘূরপাক খেতে-খেতে প্রাঙ্গণ পেরিয়ে উঠে বারান্দার জীর্ণ থামের পলেস্তারা খসিয়ে ভেতরে উঁকি দিচ্ছিল। তিনটি দরজা ও দুটি জানালা বন্ধ করে দিলেন। শুধু একটি দরজা খোলা রইল। সেখানে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের ওই উপদ্রবকে দেখার চেষ্টা করলেন বদিউজ্জামান।

বিস্ময়ের কথা, প্রাকৃতিক উপদ্রবের সময় অভ্যাসমতো আজ পবিত্র কোরানের 'সূরা ইয়াসিন' আবৃত্তির কথাও তাঁর মনে এল না। তাঁর শুধু মনে হচ্ছিল শফি এখন হরিণমারায় কেমন ঘরে আছে, কী করছে। নবাববাহাদুরের দেওয়ান আবদুল গনি চৌধুরি তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, শফি খুব ভালো জায়গায় আছে। খোন্দকার হাশমত আলি অবস্থাপন্ন মানুষ। বনেদি 'আশরাফ' (উচ্চবর্ণীয়) পরিবার। তাঁদের বাড়ি থেকে শফির পড়াশোনায় কোনও অসুবিধে হবে না। আর পিরসাহেবের ছেলেকে তাঁরা প্রচুর যত্ন-আত্যিও করবেন। তবু বদিউজ্জামান কেন যেন আশ্বস্ত হতে পারছিলেন না।

পারছিলেন না কতকটা সাইদা বেগমের কথা ভেবেও বটে। মেজো ছেলে মনিরুজ্জামান জন্মপ্রতিবন্ধী। বড়ো ছেলে ছোটোবেলা থেকেই বাইরে। তাই সাইদার কাছে শফির মূল্য অনেক বেশি। এক মুহূর্ত চোখের বাইরে রাখতে পারেন না। বদিউজ্জামানের সন্দেহ হয়েছিল, এবার যেন স্বামীর ওপর তীব্র অভিমানেই শফিকে চোখছাড়া হওয়ার দুঃখ সইতে মনকে তৈরি করেছেন। স্বামী যখন হুকুম দিয়েছেন (দরিয়াবানু আর চৌধুরিসাহেবের কথামতো) তখন তিনি তো অসহায়। বাধা দেবার সাধ্য কী তাঁর?

এই ঝড়ের রাতে বদিউজ্জামান এই কথাটা তীব্রভাবে টের পাচ্ছিলেন। আর সেই বিচলিত সময়ে অনিবার্যভাবে তাঁর মনে পড়ে গেল, প্রায় একমাস হতে চলল তিনি মসজিদবাসী। সেই একদিন নতুন বাসস্থান দেখে এসেছেন মাত্র। তারপর আর সাইদার সঙ্গে তাঁর দেখা নেই। এ কী করছেন তিনি? বদিউজ্জামান নিজেকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করলেন। তিনি কি তাহলে তাঁর 'সুফি' এবং 'মজনুন' (ঈশ্বর-প্রেমে উন্মাদ) ছোটোভাই ফরিদুজ্জামানেই পরিণত হলেন অবশেষে?

বালিকা সাইদাকে বিয়ে করেই বিপত্নীক মৌলানা প্রায় তিন বছর নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। সেই ঘটনাটি মাঝে-মাঝে মনে পড়ায় বিব্রত বোধ করতেন বদিউজ্জামান। এ রাতে সেই অপরাধবোধও তাঁকে আড়ষ্ট করে ফেলল। চৌকাঠ আঁকড়ে ধরে প্রাঙ্গণ থেকে আকাশব্যাপী তুমুল প্রাকৃতিক আলোড়ন দেখতে-দেখতে ক্রমশ একটা আতঙ্ক তাঁকে পেয়ে বসল, জনপদের প্রান্তে নির্জনে অবস্থিত এই জীর্ণ প্রাচীন মসজিদসুদ্ধ তাঁকে যেন 'গায়রত' (ধ্বংস) করে ফেলতেই আল্লাহ এই প্রলয় সৃষ্টি করেছেন। গর্জন করছে মুহুর্মুহু নক্ষত্রঢাকা প্রমত্ত মেঘ। ঝলসে উঠছে ফেরেশতাদের জ্যোতির্ময় খরসানের মতো ক্ষিপ্ত বিদ্যুৎরেখা। যে-কোনো মুহূর্তে মসজিদ বুঝি ওই মিনারের মতো ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। তিনি তো সর্বত্যাগী সাধকপুরুষ নন। তিনি ভ্রান্ত মতানুগামী সুফিও নন। তিনি ওহাবপন্থী ফরাজি মুসলিম। ইহলোকের সবরকম নৈতিক সুখ উপভোগ করাই তো যথার্থ ইসলাম। তিনি তাঁর নিরুদ্দিষ্ট সুফি ভাইয়ের মতো 'নারীবিদ্বেষী' তো নন। বরং পবিত্র কোরানে আল্লাহ বলেছেন, কৃষক যেমন শস্যক্ষেত্রের দিকে গমন করে, পুরুষ তার নারীর দিকে একই নিষ্ঠা ও প্রেমে অনুগমন করবে বলেই আদিমানব আদমের বুকের বাঁ পাঁজর থেকে নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ তিনি এ কী করছেন? কেন করছেন?...

আর সেই ঝড়ের রাতে সাইদাও তখন ভাবছিলেন শফির কথা। এমন সব রাতে একপাশে মনি অন্যপাশে শফি—আর মনি তো প্রাণীমাত্র; শফি তাঁকে আঁকড়ে ধরে ফিশফিশ করে শুধোত, আম্মা, এখন কোন ফেরেশতা ঝড় করছে, বলুন না! ও আম্মা, বলুন না কেন ঝড় হয়? পানি ঝরায় যে ফেরেশতা, তার নাম কী আম্মা? তারপর বাজ পড়লেই সে মায়ের বুকে মুখ গুঁজত। আর সাইদা বলতেন, আর শুধোবি ও কথা? ওই শোন, কোড়া পড়ল শয়তানের পিঠে। শয়তান তোর মুখ দিয়ে কথা বলাচ্ছে যে!

সেই শফি একা কার বাড়িতে শুয়ে আছে ভেবে চোখ ফেটে জল আসছিল সাইদার। ঝড়, মেঘের গর্জন যত ভয়ংকর হয়ে উঠছিল, তত তিনি নিজেকে দারুণ একা আর অসহায় বোধ করছিলেন। তারপর একসময় হঠাৎ তাঁর মাথার ভেতর একটা কথা এসে বাইরের ওই বিদ্যুতের মতোই একমুহূর্তের জন্য ঝলকে উঠল। নূরুকে, তারপর শফিকে তাঁর কাছ-ছাড়া করার পেছনে তাঁর স্বামীর কোনও চক্রান্ত নেই তো? তাঁকে কি এমনি করে একা করে ফেলতে চাইছেন মৌলানা কোনও গোপন উদ্দেশ্যে? মেজো ছেলে মনি তো সাইদার আশ্রয় হতে পারবে না কোনোদিনও। শাশুড়ি কামরুন্নিসা কবরের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন। মৌলানার ছোটো ভাই ফরিদুজ্জামানকে সাইদা দেখেন নি। শাশুড়ির কাছে তাঁর কথা শুনেছেন মাত্র। শাশুড়ি বেগম দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, বউবিবি! এই খান্দান যেন মাজনুন ফকিরেরই খান্দান। এরা আল্লা-আল্লা করেই দুনিয়াদারির মুখে ঝাঁটা মারতে ওস্তাদ। বদুকে একটু কাছে টেনে রেখো, মা! নৈলে আখেরে পস্তে কূল পাবে না। কামরুন্নিসা বলতেন, ফরিদ! আমার ফরিদ! তাকে যদি দেখতে বউবিবি! তোমার ছোটো বেটার চেয়ে খাপসুরত ছেলে ছিল সে। সেই ছেলে যোয়ান হয়ে মাথায় রাখল আওরতলোকের মতন লম্বা-লম্বা চুল। সারারাত গোরস্থানের ধারে গিয়ে বসে জিকির (জপধ্বনি) হাঁকত। আর সে কী গলা, সে কী গান! বুকে চিমটে ঠুকত আর মারফতি গান গাইত। তখন বদু একদিন জোর করে লোকজন নিয়ে গিয়ে তার চুল মুড়ো করে দিলে। চিমটে কেড়ে নিলে। সে বড়ো দুঃখের কথা বউবিবি! বদুকে কম ভেবো না! সোদর ভাইটাকে জুলুম করে শরিয়তে টানতে গেল। আর সোনার বাছা আমার পালিয়ে গেল কোথায়। আর তাকে জিন্দেগিভর দেখতে পেলাম না। বউবিবি, বদুকে আমি গোরে গিয়েও মাফ করতে পারব না।

ঝড়ের রাতে শাশুড়ির সেইসব কথা মনে এসে সাইদা চমকে উঠেছিলেন। তাহলে কি তাঁর স্বামীও সংসারত্যাগী মাজনুন হতে চলেছেন? কিন্তু পরক্ষণেই মনে

হল, এতকাল ধরে তাঁতে যতখানি বুঝেছেন, মৌলানা মাজনুনদের একেবারে উলটো। সাইদা অকুণ্ঠিতভাবে দ্রুত স্মরণ করলেন স্বামীর সঙ্গে রাত্রিযাপনের সেইসব তীব্র সুন্দর সময়গুলোকে। বরং তাঁর তো মনে হয়েছে, মৌলানা এসব গোপনীয় শারীরিক ব্যাপারে কি নির্লজ্জ আর প্রবল পুরুষ হয়ে ওঠেন! তাঁকে কদাচিৎ শয্যায় পাশে পান বলেই সাইদার মনে যেমন রাক্ষসীর ক্ষুধা জেগে ওঠে, মৌলানাকেও তেমনি মনে হয় ভয়ংকর ক্ষুধার দাউদাউ আগুন। আর সাইদার মনে হয় ওই প্রজ্বলনে নিজেকে ছাই করতে পারলেই পরম সুখ।

তাহলে কি মৌলানার কাছে এতদিনে তাঁর আকর্ষণ ফুরিয়ে গেছে? উনি কি ভেতর-ভেতর নিকাহের (বিয়ে) মতলব করেছেন? মৌলাহাটে আসার পর সাইদা লক্ষ করেছেন এখানকার মেয়েরা পরদানসীনা নয়। এদের মধ্যে স্বৈরিণী ও স্বাস্থ্যবতী সুন্দরীরাও বড়ো কম নেই। তার চেয়ে ভাবনার কথা, এখানকার পুরুষগুলোর হাবভাব কেমন যেন সন্দেহজনক। তারা ওঁকে আমরণ আটকে রাখার জন্য ব্যস্ত। তাহলে কি তারাই ওঁকে কৌশলে প্ররোচিত করছে কারুর সঙ্গে নিকাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে?

ভীষণ গর্জনে বজ্রপাত হল। থরথর করে কেঁপে উঠলেন সাইদা। প্রতিবন্ধী ছেলেকে আঁকড়ে ধরে অন্ধকার ঘরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। পাশের ঘরে পক্ষাঘাত-গ্রস্তা শাশুড়ি আছেন। কবে কখন তাঁর মৌলানাপুত্র এসে বউবিবির পাশে রাত্রিযাপন করবেন ভেবেই বারবার তিনি আলাদা শুয়ে থাকেন। মৌলাহাটে আসার পর কোনো-না-কোনো রাতে কোনো বয়স্কা মেয়ে, তারা বিধবা অথবা স্বামীপরিত্যক্তা, পির-জননীর পাশে শুয়ে পুণ্য সঞ্চয় করে। এ রাতে আয়মনি এসে শুয়েছে। একটু আগে সে বেরিয়ে এসে সাইদার ঘরের বন্ধ কপাটের ওধার থেকে জেনে গেছে, বিবিজির ডর লাগছে কি না। মেঘের গর্জন বাড়লে সাইদা আবার তার সাড়া পেয়ে বিরক্ত হলেন। বললেন, তোমার চোখে কি নিদ নাই, আয়মনি? চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারছ না?

আর সাইদা যখন ফুঁপিয়ে কাঁদছেন, তখনই বৃষ্টির শব্দ শোনা গেল বাইরে। প্রথমে দড়বড় করে ঘোড়সওয়ার-দলের ছুটে যাওয়ার মতো, তারপর হাওয়ার শনশনানির মতো ঝরঝর ধ্বনি। মেঘের ডাকে যেন ছন্দ এল। কিন্তু হাওয়া থামল না। তার একটু পরেই আবার আয়মনির ডাক শুনলেন সাইদা। সে কপাটে ধাক্কা দিচ্ছিল। এবার তার কণ্ঠস্বর চাপা। বিবিজি! ও বিবিজি! লম্ফ জেবলে শিগগির উঠুন দিকিনি! আমার লম্ফ বুতে গেল!

সাইদা দ্রুত চোখ মুছে উঠে বসলেন। শলাইকাঠি ঘষে লম্ফ জ্বাললেন। তাঁর বুক ধড়াস করে উঠেছে। শাশুড়ি-বেগমের কি মউত হতে চলেছে, তা না হলে আয়মনির গলার স্বর অমন কেন?

দরজা খুললেন কাঁপা-কাঁপা হাতে। অন্যহাতে লম্ফের শিখাও প্রবলভাবে কাঁপছে। সামনে আয়মনিকে এক পলকের জন্য দেখলেন। উঠোনে বিদ্যুতের ঝলসানিতে ঘন বৃষ্টিরেখা বাঁকা। আর আয়মনির মাথায় এমন ঘোমটা টানা যে তার চোখ ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছিল না। সে দ্রুত ছিটকে গেল। আর সামনে যাঁকে দেখলেন সাইদা, তাঁকে স্বপ্নের মূর্তি মনে হল। ভিজে শাদা পোশাকপরা ম্রিয়মাণ মূর্তিটিকে খর্বাকার বিভ্রম হল। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন সাইদা বেগম। আর সেই কুঁকড়েথাকা, বিষণ্ণ, ঝড়ের রাতের আগন্তুক জড়ানো গলায় কী উচ্চারণ করে সাইদাকে ঠেলে ঘরে ঢুকলেন। তখন সাইদা আচ্ছন্নতা থেকে জেগে উঠে বুঝলেন, এই কাকতাড়ুয়াবৎ মূর্তিটি তাঁর স্বামীরই।

পরাক্রমশীল এক 'দেও' (দৈত্য), এতকাল সাইদা যার সামনে অবচেতন ভয় আর সংস্কারলালিত ভক্তিতে বিনত থেকেছেন, এই ঝড়বৃষ্টির রাতে তাঁর দিকে নির্লিপ্ত চাহনিতে তাকিয়ে ছিলেন।

আর বদিউজ্জামান ওই নতুন চাহনি দেখে ঈষৎ বিস্মিতও হয়েছিলেন। কিন্তু যে অতর্কিত আবেগ এমন রাতে তাঁকে ঐশী আবহমণ্ডল থেকে মাটিতে নিক্ষেপ করে কাদামাটিতে গড়া নিছক আদম-সন্তানে পরিণত করেছে, সেই আবেগই তাঁকে একটু হাসি দান করল। মৃদু হাস্যে তিনি বললেন, কী হল সাইদা? দেখছ না আমি ভিজে গেছি? আমাকে শিগগির শুকনো কিছু 'লেবাস' (পোশাক) দাও। জাড় মালুম হচ্ছে।

একটিও কথা না বলে সাইদা ছোট্ট কাঠের সিন্দুকটি খুললেন। ভাঁজ করে রাখা শাদা একটি তহবন্দ (লুঙ্গি) আর দড়ির আলনা থেকে একটি তাঁতের নতুন গামছা এনে দিলেন। লম্ফটি সিন্দুকের ওপর রেখে তিনি দরজার কাছে গিয়ে বৃষ্টি দেখার ছলে আয়মনিকে খুঁজলেন। আয়মনি আবার তাঁর শাশুড়ির ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। দরজা বন্ধ। চাপা স্বরে কথা বলছে কামরুন্নিসার সঙ্গে, তাও কানে এল সাইদার।

বদিউজ্জামান দ্রুত পোশাক বদলে নিতে-নিতে আড়ষ্টস্বরে বললেন, আমার সেই কামিজটা? তখন সাইদা দরজা থেকে মুখ না ঘুরিয়ে আস্তে বললেন, সিন্দুকে আছে।

অমনি বদিউজ্জামান তাঁর কাছে এসে দরজা বন্ধ করে দুহাতে স্ত্রীর দুই কাঁধ ধরে তাঁকে ঘোরালেন নিজের দিকে। সাইদা একমুহূর্তের জন্য স্বামীর উজ্জ্বল গৌর বুকের কাঁচাপাকা রোমগুলির দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, আঃ! মনি আছে!

মনিরুজ্জামান অবশ্য গাঢ় ঘুমে কাঠ। রাতে জ্বালা-তন করে বলে দরিয়াবানুর পরামর্শে পাশের গ্রাম দুনি-তলার ভাদু কবরেজের বড়ি খাওয়ানো হয়। বড়িটিতে আফিম মেশানো। বদিউজ্জামান একথা জানেন না। তাই চকিতভাবে ঘুরে বিছানায় মেজো ছেলের দিকে তাকা-লেন। তারপর তার কুঁকড়ে পাশফিরে শুয়ে থাকা দেখে আবার স্ত্রীকে আকর্ষণ করলেন। তখন সাইদা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু তফাতে সরে গেলেন।

বিস্মিত, ব্যথিত বদিউজ্জামান চাপাস্বরে বললেন, তোমার কী হয়েছে সাইদা? তুমি এমন করছ কেন?

সাইদার নাসারন্ধ্র স্ফুরিত। লম্ফের আলো তত উজ্জ্বল নয়। আলো-অন্ধকারে তাঁর এই অদ্ভুত চেহারা বড়ো অবিশ্বাস্য লাগছিল বদিউজ্জামানের। তিনি স্বভাবে একরোখা, তেজী এবং আবেগপ্রবণ মানুষ। স্থির দৃষ্টে স্ত্রীকে দেখতে-দেখতে ভাবছিলেন, কী কথা এবার বলবেন? তিনি নির্জন মসজিদ থেকে এই দুর্যোগের রাতে এমন করে কেন ছুটে এসেছেন, সেকথা বলার জন্য ব্যাকুল। অথচ সাইদার হাবভাব দেখে তিনি এত অবাক যে মুখে কথা আসছে না। কষ্ট করে আবার একটু হাসলেন শুধু। আর সাইদা হিসহিস করে বলে উঠলেন, আমার কাছে আপনার কী দরকার? তারপরই দুহাতে মুখ ঢেকে ঘুরে দাঁড়ালেন। তাঁর পিঠের দিকটা কাঁপতে থাকল।

নাদান আওরত! বদিউজ্জামান ম্লান হেসে এগিয়ে তার কাঁধে হাত রাখলেন। তুমি কি জানো না, কোরান শরিফে আল্লাহ্ বলেছেন—

কান্নাজড়িত স্বরে সাইদা বললেন, চুপ করুন! ওসব বুলি মসজিদে শোনান গিয়ে। আমার কাছে নয়।

নাউজবিল্লাহ্! সাইদা! কী বলছ তুমি! এ যে গোনাহ্!

সাইদা বেগম ঘুরে দাঁড়ালেন। গোনাহ্! আর নিজের বিবির ভালোমন্দ না তাকিয়ে মাস-কাল ধরে মসজিদে পড়ে থাকাটা বুঝি নেকি (পুণ্য)? আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন সাইদা।...আমার বাছাদের দূর-দূরান্তে পাঠিয়ে আমার কোলছাড়া করে দেওয়া নেকি? আর ওই মনি—তার কী হাল, আর বিবিজি—যাঁর পেট থেকে পড়ে দুনিয়ার মুখ দেখেছেন—তিনি হরবখত কাঁদছেন, মউতের আগে বেটার হাতের পানি মুখে পাব না—এও বুঝি নেকির কাজ?

বদিউজ্জামান কাতরস্বরে বললেন, আমাকে ভুল বুঝো না সাইদা! এসো, তোমাকে শুয়ে-শুয়ে সব বাতলাব। এসো।

সাইদাকে টেনে এনে মেঝেয় পাতা বিছানায় বসালেন। তারপর একটু চমকে উঠে বললেন, এঘরে তক্তাপোশ নেই দেখছি! মহিউদ্দিনকে বলেছিলাম—

বাধা দিয়ে সাইদা বললেন, আমি ছপ্পরখাটে শোব। আর বিবিজি মেঝেয় শোবেন? তক্তাপোশ ওঘরে আছে।

স্ত্রীর মুখচুম্বনের চেষ্টা করতে গিয়ে বাধা পেলেন বদিউজ্জামান। শুকনো হাসলেন।...কিন্তু তুমি এমন বেরহম (নিষ্ঠুর) কেন হলে সাইদা? আমি তো হরবখত এত্তেকাফ নিয়ে মসজিদে হপ্তাভর থেকেছি। কখনও তো তুমি এমন করো নি!

হঠাৎ সাইদা মুখ নিচু করে বললেন, আপনি নিকাহ্ করবেন—আমি বুঝতে পেরেছি।

বদিউজ্জামান আবার হাসলেন—আড়ষ্ট, শুকনো হাসি।...আমার হুজুর পয়গম্বরসাহেব কতগুলো নিকাহ্ করেছিলেন তুমি তো জানো! কিন্তু আমি নাদান আদমি সাইদা! এই দেখো না, তোমার ওপরই কত অবিচার করি—আবার নিকাহের কথা কি আমার ভাবা সাজে? তবে তোমার ভাবা উচিত ছিল, এমন করে ঝড়পানির মধ্যে কেন ছুটে এলাম তোমার কাছে!

অস্ফুটস্বরে সাইদা বললেন, কেন?

একটু চুপ করে থাকার পর শ্বাস ছেড়ে বদিউজ্জামান বললেন, তুমি শফির কথা বলছিলে। হঠাৎ কেন কে জানে ঝড়টা ওঠার সংগে-সংগে শফির কথা মনে এসে গেল। আমার বুকটা কেমন করতে লাগল। সাইদা, অমনি হল শফিকে তুমি নজর-ছাড়া করতে পারো না! তাহলে কী অবস্থায় তোমার দিন কাটছে। কত কষ্ট তোমাকে সইতে হচ্ছে!

সাইদা কান্না চেপে বললেন, খোদার মেহেরবানি যে আপনি কথাটা ভেবেছেন!

ভেবেছি। ভেবেই মনে হয়েছে, আমি গোনার ভাগী হচ্ছি। তোমাকে বঞ্চনা করছি।

আপনি বুজুর্গ মানুষ। সাইদার বাঁকা ঠোঁট থেকে কথাটা ব্যংগমিশ্রিত হয়ে বেরিয়ে এল।

ছিঃ! তামাশা কোরো না সাইদা!

সাইদা একটু চুপ করে থাকলেন। বাইরে অঝোর বৃষ্টির শব্দ এখন। মাঝে-মাঝে মেঘ ডাকছে। পিঠে স্বামীর হাতের আদর অনুভব করছিলেন সাইদা। তবু আজ তাঁর দেহ যেন নিঃসাড়। অবিশ্বাস তাঁকে ঘিরে রেখেছে। কিছুক্ষণ পরে বললেন, তামাশা করছি না। আমি জানি জিনেরা এসে আপনার সংগে কথা বলে। আপনি বুজুর্গ না তো কী?

ওসব কথা থাক, সাইদা! রাত হয়েছে। শুয়ে পড়া যাক। ফজরের আগেই আমাকে মসজিদে যেতে হবে।

মসজিদে তো অনেকদিন থাকলেন। এবার বাড়ি ফিরবেন না?

বদিউজ্জামান কথাটা বলেই শুয়ে পড়েছিলেন। সাইদা শুলেন না। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করে লম্ফটা আনার জন্য উঠতে গেলেন। কিন্তু বদিউজ্জামান তাঁকে উঠতে দিলেন না। বললেন, আজ তোমাকে একটু দেখি। কতদিন তোমাকে দেখি নি, সাইদা!

আপনি কবে বাড়ি ফিরবেন, আগে বলুন?

সাইদা, সত্যি বলছি—হয়তো আমার এক্তিয়ারে আর কিছু নেই!

ভীষণ চমক খেয়ে সাইদা বললেন, কেন?

জানি না। বদিউজ্জামান আচ্ছন্ন কণ্ঠস্বরে বললেন। কী একটা ঘটছে, তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। খালি মনে হচ্ছে, ওই মসজিদে আমার জিন্দেগির একটা পরদা খুলে যাচ্ছে। যা কখনও বুঝি নি, তাসব বুঝতে পারছি।...নাঃ! আমার খামোশ থাকা উচিত।

এ ধরনের কথাবার্তা সাইদা কখনও স্বামীর মুখে শোনেন নি। তাঁর বুজুর্গপনা বা কেরামতির কথা সবই শাশুড়ির কথায় কিংবা অন্য লোকের কাছে পরোক্ষে আঁচ করেছেন মাত্র। তাই তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন সাইদা। তারপর কী এক হঠকারিতাবশে তিনি বলে উঠলেন, আমাকে নাদান আওরত ভেবে আপনি যা বললেন, আমি তা মানব না। আমি জানি আপনি কেন আমার কাছ-ছাড়া হয়ে আছেন এতদিন।

ছিঃ সাইদা! আবার ওই কথা! বলে বদিউজ্জামান নিজেই উঠে গিয়ে লম্ফটা নিবিয়ে দিয়ে এলেন। তারপর স্ত্রীকে আকর্ষণ করলেন। নিজের জৈবসত্তার তীব্রতা তাঁকে জরো-জরো করে ফেলছিল ক্রমশ।

কিন্তু সাইদা বাধা দিয়ে বললেন, আপনি যাই বলুন, নিকাহ্ করার মতলব হয়েছে, আমি জানি।

সাইদা! আল্লার দোহাই, তুমি চুপ করো!

সাইদা ক্রমশ প্রগলভা আর সাহসী হয়ে উঠছিলেন বদিউজ্জামানের পরিবর্তিত আচরণ আর ভাবভংগি দেখে। অন্ধকারে শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগে বললেন, মেয়েটি বুঝি কুঠো আবদুলের বউ?

কী বললে? বদিউজ্জামান মুহূর্তে নিঃসাড় হয়ে গেলেন। বাইরের মণ্ডলাকাশের বজ্র যেন তাঁরই মাথায় পড়ল।

হ্যাঁ—ওই মেয়েটার পেছনে যেভাবে লেগেছেন শুনতে পাই—

বদিউজ্জামান সরোষে অন্ধকারে স্ত্রীর গালে থাপ্পড় মারলেন। থাপ্পড়টা সাইদার মাথায় লাগল। তারপর বদিউজ্জামান শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সশব্দে দরজা খুলে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেলেন। খালি পায়েই ছুটে এসেছিলেন মসজিদ থেকে। এখন তাঁর পরনে শুধু তহ্বন্দ, খালি গা, খালি পা।

আর সাইদা তেমনি বসে আছেন। মাথা দুহাঁটুর ফাঁকে। খোলা দরজা। উঠোনে ঝরঝরিয়ে বৃষ্টি পড়ছে।

বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে। ঝড়ের ভীষণতা শান্ত হয়ে গেছে। শুধু মাঝে-মাঝে একদমক করে বিভ্রান্ত হাওয়ার ঝাপটানিতে গাছপালা দুলে উঠছে। সাইদার মনে হচ্ছিল বিশাল খোলামেলা প্রান্তরে বসে বৃষ্টিতে অসহায় ভিজছেন।

ভোরে যখন বৃষ্টি থেমেছে, আয়মনি পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে সাইদাবেগমের ঘরের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল। দরজা খোলা। আর নগ্ন মাটির মেঝেয় চুল এলিয়ে উপুড় হয়ে মাথা কোটার ভগ্নিপতে পড়ে আছেন বিবিসাহেবা।...

ভিন্ন গোত্রের নাট্যকার

নাট্যসংকলন—অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। রূপা অ্যানড কোম্পানি, কলিকাতা। ষাট টাকা।

যাঁরা নাটক দেখেন, তাঁরা অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নামের সঙ্গে অপরিচিত নন। তবে যাকে জনপ্রিয় নাট্যকার বলে, অজিত গঙ্গোপাধ্যায় তা ছিলেন না। 'প্রখ্যাত সব নাট্যসংস্থা' তাঁর নাটক মঞ্চস্থ করেছে, কিন্তু 'সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে' (চেখভের একাঙ্ক অবলম্বনে লেখা) বা 'থানা থেকে আসছি' (প্রিস্টলির নাটকের অনুসরণে লেখা) যতটা খ্যাতি অর্জন করেছে, 'নচিকেতা' বা 'মৃত্যু' ততটা প্রশংসা পায় নি। তাহলে কি বিদেশী নাটকের রূপান্তরেই অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের যা-কিছু কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে? 'শকুন্তলা রায়' বা 'আকাশ-বিহঙ্গী' কি হবে তাঁর একমাত্র পরিচয়? বিদেশী নাটকের রূপান্তর-সাধনে অল্প কয়েকজন সফল নাট্যকারের মধ্যে তিনি একজন। কিন্তু তিনি শুধু অনুবাদক নন (শেকসপীয়রের দুটি নাটকের অনুবাদ সত্ত্বেও), মন্মথ রায়ের ভাষায় "সমস্ত নাট্যজগৎ জানে বিদেশী নাটকের ব্যাসবাক্যে স্বদেশী বহুব্রীহি রচনায় অজিতের পারঙ্গমতার কথা।" আর মৌলিক নাটকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়, যেখানে অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নাট্যপ্রতিভার চূড়ান্ত পরিচয় মেলে। অথচ সমকালের অন্যান্য নাট্যকারের তুলনায় তাঁর পরিচিতি কম, মৃত্যুর দেড় বছরের মধ্যেই যেন তিনি অনেকটা বিস্মৃত।

অথচ ভুলে যাবার মতো নাট্যকার তিনি নন। তাঁর 'নাট্যসংকলন' প্রকাশ নানা দিক থেকে এক প্রশংসনীয় উদ্যম। অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের অধিকাংশ নাটক আর মঞ্চস্থ হয় না, গ্রন্থাকারেও অনেকগুলিই অপ্রকাশিত বা দুষ্প্রাপ্য। সে অবস্থায় পড়বার জন্য হলেও তাঁর নাটকগুলি হাতের কাছে পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। মনে হচ্ছে, প্রকাশক কয়েক খণ্ডে 'নাট্যসংকলন' প্রকাশের পরিকল্পনা করেছেন, দ্বিতীয় খণ্ডের সূচী থেকে এবং এই বইয়ের প্রচ্ছদ থেকে ধরে নেব। আপাতত 'নাট্যসংকলন'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত সংকলন'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল (আখ্যাপত্রে 'প্রথম খণ্ড' উল্লেখ নেই)। প্রকাশকের এই উদ্যমের জন্য তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, যদিও ছাপার

গ্রন্থসমালোচনা

ব্যাপারে আর-একটু যত্ন নিলে নাট্যকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হত (প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ছাপার ভুল বড়োই দৃষ্টিকটু)।

'নাট্যসংকলন' প্রথম খণ্ডে চারটি নাটক সংকলিত হয়েছে—নচিকেতা, পোস্টমাস্টারের বউ, মৃত্যু, রাজা তৃতীয় রিচার্ড। এর মধ্যে শেষ নাটকটি শেকসপীয়রের নাটকের অনুবাদ। 'হ্যামলেট' অনুবাদকালে তিনি যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তৃতীয় রিচার্ড অনুবাদের সময় নিশ্চয় সেসব আরও প্রবল হয়ে ওঠে। অনুবাদক হিসাবে অজিত গঙ্গোপাধ্যায় শেকসপীয়রকে আক্ষরিক অনুসরণ করতে চেয়েছেন। সেখানে তাঁর কৃতিত্ব যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি বাধাবিপত্তিও অপ্রতিরোধ্য। বিশেষত তৃতীয় রিচার্ড নাটকের অনুবাদে। তৃতীয় রিচার্ড সত্যকারের দুর্বৃত্ত চরিত্র, স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে-কোনো পাপকর্মে সক্ষম। অথচ তার প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও ব্যক্তিত্ব এমনই সম্মোহন সৃষ্টি করে যে ড. জনসনের আপত্তি সত্ত্বেও অধিকাংশ দর্শক ও পাঠক তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। রিচার্ডের প্রাথমিক জয় আসলে বুদ্ধিবৃত্তির জয়, তাঁর অন্তিম পরাজয় একান্ত বুদ্ধি-নির্ভরতার পরিণাম। তাই রিচার্ডের সংলাপের মধ্যে আছে অসামান্য বৈদগ্ধ্য, কখনো শুধুই চাতুর্য। নাটকের সূচনায় তার স্বগতোক্তির কথা মনে পড়বে, যেখানে প্রতিটি বিশেষণের মধ্যে লুকিয়ে আছে পাশবিক অথচ শিশুর মতো সরল সকৌতুক ভঙ্গি—গ্লোরিয়াস, ভিক্টোরিয়াস, ড্রেডফুল, ডিলাইটফুল। শেক্সপীয়ার যেখানে লেখেন, "আওয়ার ড্রেডফুল মার্চেস টু ডিলাইটফুল মেজারস।" সেখানে বাঙলায় লিখতে হয় "পরিবর্তে আজ কিন্তু প্রীতি-সম্মেলন,/ভীষণ আমাদের শ্রেণীবদ্ধ পদক্ষেপ।" একেই বলতে চেয়েছি আক্ষরিক-অনুবাদ-প্রয়াসের বিপজ্জনক পরিণতি। তবে অনেক জায়গায় অজিত গঙ্গোপাধ্যায় সফল, আশ্চর্যভাবে সফল।

অজিত গঙ্গোপাধ্যায় কবিতা লিখতেন কিনা জানি না, কিন্তু তাঁর নাটক অনেক সময়েই কাব্যনাট্যের মতো সংহত আবেগে কবিত্বের স্পর্শে কাহিনীর মধ্যে এক ধরনের সুদূরতা এনেছে। 'নচিকেতা'র গল্প উপনিষদ থেকে নেওয়া, গ্রীক নাটকের মতো কোরাসের ব্যবহারও ঘটেছে, আর শুধু কোরাসে নয়, নাট্যসংলাপের ভাষাও কাব্যধর্মী। কিন্তু অতীত কাহিনীকে একালের নাট্যকার নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। নাটকের সূচনাতেই নচিকেতার মুখে শোনা যায়—"আছে শুধু জীবন, আর এই পৃথিবী। মানুষের

পর মানুষ, আর তাদের কামনা। প্রকৃতিকে কর জয়, পৃথিবীকে কর কর্মমুখর, জীবনকে কর সুন্দর।" এই থেকে এসেছে মৃত্যুজিজ্ঞাসা—ব্যক্তির বিনাশ সম্ভব, কিন্তু মানুষের বিলয় নেই। তাই নচিকেতা বলতে পারে, "জীবনে আমার আরম্ভ সুচেতা, জীবনেই আমার শেষ। আমি মানুষ সুচেতা, আমার পরেও মানুষ আছে। তাই মৃত্যুকে আমি স্বীকার করি না সুচেতা, নায়কের ক্রোধ আমাকে স্পর্শ করে না।" কিন্তু এর সঙ্গে এসেছে শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব—আর্য ও অনার্য বিরোধ। আর্যরা অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়েও অনার্য হয়গ্রীবকে বিনষ্ট করতে পারে না, কারণ "আমাকে হত্যা কর মূর্খ, তবু বিপ্লবের মৃত্যু নেই।" তাহলে বিপ্লবই কি সেই অমৃত, যা মানুষকে অমরত্ব দিতে পারে? একদল মানুষ মৃত্যু-ভীত, তার মানে বিপ্লব-ভীত। অন্যদল মৃত্যুভয়কে জয় করেছে, কারণ "নচিকেতার পর মানুষ আছে মূঢ়, তাই জীবনের বিনাশ নেই।" 'দ্বন্দ্ব-মূলক বস্তুবাদ' এর মধ্যে আছে কিনা জানি না, কিন্তু নাট্যদ্বন্দ্ব বলতে আমরা যা বুঝি 'নচিকেতা'র মধ্যে তার সন্ধান মিলবে না। ফলে শেষ পর্যন্ত 'নচিকেতা'কে নাটক না বলে কাব্যনাট্য বলাই সংগত, এবং তখন তার মধ্যে মন্মথ রায় প্রত্যক্ষ করতে পারেন—"এ সামগান মার্কসীয় দর্শনের দৃশ্য-কাব্যিক রূপ—এঙ্গেলসের সুরে বাঁধা।" কিন্তু লক্ষণীয়, নাটক হিসাবে 'নচিকেতা'র সার্থকতা সম্বন্ধে মন্মথ রায় কিছু বলেন না।

'মৃত্যু' নামে রচনাটিকেও ঠিক নাটক বলা যায় কিনা সন্দেহ। তবে এমনও হতে পারে, 'নাটক' সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণার বদল হচ্ছে। 'নচিকেতা'র মতো এখানেও 'কণ্ঠস্বরে'র মধ্য দিয়ে কোরাসের ব্যবহার আছে—সূচনায়, মধ্যে ও শেষে। কিন্তু অঙ্ক-বিভাগ পরিহার করা হয়েছে, অতীতচারণার মধ্যে একটি দৃশ্যের সঙ্গে আর-একটি দৃশ্য মিলেমিশে গেছে। কিছুটা রূপক, অনেক সংকেত—আর সব মিলিয়ে কাছের দৃশ্য যেন অনেক দূরে স্থাপিত হয়। ফলে বাস্তব আর কল্পনার ভেদরেখা মাঝে-মাঝেই লুপ্ত হয়ে যায়। ষাট বছরের জন্মদিনে সংবর্ধনালাভের পর বিখ্যাত সাহিত্যিক অবনী রায় বাসের জন্য অপেক্ষারত, কিন্তু ভিড় বাস ছেড়ে দেন—অন্য বাসও যে মেলে তা নয়। যেন হঠাৎ উপলব্ধি করেন, "আরম্ভ থেকে চলছি সত্যি। কিন্তু রেখাপথে এগোচ্ছি, না বৃত্তপথে ঘুরছি, তা তো বলতে পারছি না। কিন্তু কেন? কেন বলতে পারছি না?...ষাট বছরের এই জায়গাটায় আসতে বহুভাবে জিজ্ঞাসা করেছি। কিন্তু উত্তর তো পাই নি! শুধু সংশয়, শুধুই যন্ত্রণা।" আসলে খ্যাতিযশের পিছনে ছুটতে-ছুটতে জীবনের মূল্যবোধগুলি হারিয়ে যায়—যা ছিলুম, যা হতে চেয়েছিলুম তা থাকতে পারি না। এর ফলে শুধু হাস্নুকে পাওয়া যায় না তাই নয়, নিজেকে হারাতে হয়, "হাস্নু—তুমি তো আমাকে আমার ভানের মুখোমুখি করে দিয়েছিলে। আমার সমস্ত অহংকার তার সম্পূর্ণ চেহারাটা নিয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছিল। সেদিন আমার সমস্ত ভান দূরে সরিয়ে নির্মল হয়ে, বিশুদ্ধ হয়ে শুধু যদি তোমাকেই ভালবাসতাম। কিন্তু কই—পারি নি তো! অহংকার আমাকে আয়ত্ত করে নিল, বিভিন্ন ভানের মধ্যে আটকেই রইলাম!" অবনী রায়ের মর্মান্তিক ট্র্যাজিডি আমাদের এক পরম জীবনসত্যের সম্মুখীন করে দেয়, যা মৃত্যুর মতো নির্মম, মৃত্যুর মতো অপ্রতিরোধ্য। অথচ মৃত্যুকে যেমন নচিকেতা স্বীকার করে না, নাট্যকারও যেন স্বীকার করেন না। অন্তিম 'কণ্ঠস্বর'-এর মধ্যে নাট্যকারের প্রক্ষেপই শুনতে পাই—"যদিও অধিকৃত সড়কে আজ মৃত্যুর অধিকার—/যদিও ওখানে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে—/তবুও তুমি সূর্যের মতই উত্তপ্ত—/নতুন-ওঠা ধানের শীষের মতই উজ্জ্বল সবুজ।"

প্রচলিত নাটকের আঙ্গিক ভেঙে নতুন নাটক সৃষ্টি করতে চেয়েছেন অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, তারই সবচেয়ে বিস্ময়কর নিদর্শন 'পোস্ট-মাস্টারের বউ'। আলাদা করে এখানে চরিত্রলিপি নেই, আছে নাট্যকারের কয়েকটি ইতস্তত মন্তব্য—"অনুপমা নামে একটি মেয়ের কাহিনী। তাকে কেন্দ্র করে তার আশেপাশে অনেক আসা-যাওয়া।...স্থান : আমাদের দেশের একটি মেয়ের মন। সে মেয়ের নাম অনুপমা। কাল : বর্তমান।" এখানেও অঙ্ক- বা দৃশ্য-বিভাগ নেই, কাহিনী আগাগোড়াই আত্মপ্রেক্ষণের মধ্য দিয়ে কিছুটা রূপকধর্মী, অনেকটা সংকেতময়। স্থানকালকে অস্বীকার করা যায় নি, তবে অদ্ভুত কৌশলে তাকে ব্যাপ্তি দেওয়া হয়েছে। অনুপমা নামে এক মধ্যবিত্ত অনূঢ়া কন্যার বিবাহ এবং তার বিপর্যয়কর পরিণাম নিয়ে গড়ে উঠেছে মূল গল্প। কিন্তু গল্প বলা হয়তো নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল না—তিনি ধরতে চেয়েছেন মধ্যবিত্তের শহর কলকাতা'কে, সেখানে দাঁতন-করা প্রৌঢ়ের দল, কলেজের ছাত্র, চায়ের দোকানের একজন, অন্যজন, আরেকজন, যেমন আছে, তেমনি আছে অনুপমার বাবা-মা-কাকা, আর পাত্র উমাশঙ্করের কাকা ও গৃহপুরোহিত বা বেশ কিছু আরও চরিত্র, যার মধ্যে হীরেশ সেন হয়তো কাহিনীর নায়কত্ব দাবি করতে পারে। মধ্যবিত্ত জীবনের ছলনা, অপরিচ্ছন্নতা, মিথ্যাচার থেকে অনুপমা বেরিয়ে আসতে চায়, কিন্তু সত্যিই কি বেরিয়ে আসা যায়? প্রায় ধুয়াপদের মতো শোনা যায়—'নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?' 'মহাদেবের জটা হইতে।' 'জটার ব্যাপারটা

কিন্তু ভুল নয়। বইয়ে পড়েছিলাম।' আর সেই সঙ্গে—'শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি/শরমের জালি।' তবে যোগবালিয়া গ্রামের পোস্টমাস্টারের বউ কি এসব থেকে মুক্তি পেয়েছে? কি বোঝা যায় না। অনুপমা আর স্বামীর ঘরে ফিরতে পারে না সত্য—কিন্তু তার ব্যর্থতা কি স্বপ্নকল্পনায় দূর করাও সম্ভব? শেষ পর্যন্ত—"মনে হচ্ছে—আপনার পৃথিবী বিষণ্ণ—" "বিষণ্ণ কিনা বলতে পারি না, তবে অপরিচ্ছন্ন।" "অপরিচ্ছন্ন পৃথিবীকে যেন কোন দিন প্রশ্রয় দেবেন না—" "একটু যদি দিই—তাহলে?" "পাশের পরিচ্ছন্ন পৃথিবী আপনার মনের মধ্যে আসার পথ হারিয়ে ফেলবে।" "কিন্তু প্রশ্রয় তো আমি দিচ্ছি। আমি...আমি তো সহ্য করে যাচ্ছি। অন্য জায়গায় গেলেও তো অন্য একজনকে সহ্য করতে হত...।" 'নচিকেতা' বা 'মৃত্তা'র মতো এখানে কোনো আশ্বাস নেই—ন্যাটকারের আঙ্গপ্রক্ষেপও ঘটে নি। এদিক থেকে প্রচলিত নাটকের আঙ্গিকে লেখা না হলেও 'পোস্ট-মাস্টারের বউ' নাট্য-সংকলনের শ্রেষ্ঠ নাটক।

তবে সেই সঙ্গে বোঝা যায় অজিত গঙ্গোপাধ্যায় কোনো দিন কেন জনপ্রিয় নাট্যকার হলেন না। তিনি 'নাট্যকারদের নাট্যকার' কি না জানি না—মঞ্চে তাঁর এই তিনটি নাটকের সাফল্য কতদূর তাও বলতে পারব না, কিন্তু তিনি এমন কিছু লিখেছেন যা নিছক 'আত্মসচেতন বুদ্ধিনির্ভরতা' নয়। অন্তত নাট্যসংকলনের অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলি পাঠককে প্রবলভাবে নাড়া দেয়; গভীর বিষাদে বা পরম প্রত্যয়ে ভরিয়ে দেয় পাঠকের মন। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাই 'অজিত গঙ্গোপাধ্যায়' এক অবিস্মরণীয় নাম, তাঁর নাটক বা নাট্যকল্প রচনাগুলি আমাদের জাতীয় সম্পদ।

অলোক রায়

আমাদের পূর্ব্ববঙ্গীয় সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার

উনিশ শতকে পূর্ববাংলার সভা-সমিতি। মুনতাসীর মাসুন। ডানা প্রকাশনী, ঢাকা-১২। ত্রিশ টাকা।

গত শতকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল, তা ছিল শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে। কিন্তু পূর্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ভূমিকা ছিল এই নবজাগরণে। হিন্দু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় সমাজসংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেদিন ছিল অগ্রণী, কিন্তু কিছুটা পিছিয়ে থাকা মুসলমান সম্প্রদায়ও সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন।

গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পূর্ববঙ্গে প্রতিষ্ঠিত সভা-সমিতির পর্যালোচনায় অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন উপরি-ধৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

এই সুলিখিত গ্রন্থে লেখক দেখিয়েছেন, সভা-সমিতি এবং সংবাদ-সাময়িকপত্রের উদ্ভব আর বিকাশ পূর্ববঙ্গের মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব আর বিকাশের সমান্তরালে হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের ইতিহাস। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাগরণের উপাদান হিসাবে লেখক এ দুটি উপাদানকে ধরেছেন এবং দেখিয়েছেন।

এখানেই প্রশ্ন উঠে, কেন্ সময়টিকে আমরা পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাগরণ এবং বিকাশের কাল হিসাবে ধরব? লেখক উত্তরে জানিয়েছেন, ১৮৭০-১৮৯০, এই বিশ বছর জাগরণ-বিকাশের কাল। কিন্তু কেন এই বিশ বছর?

লেখক তারও উত্তর দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, এ সময়ের মধ্যেই পূর্ববঙ্গে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই সভাসমিতি এবং সংবাদপত্রের বিকাশ হয়েছিল। পূর্ববঙ্গে শিক্ষিত মুসলমানদের বিকাশের পূর্ব-সীমা ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ, কারণ সরকারি শিক্ষানীতির পরিবর্তনের ফলে এই সময় থেকে বাঙলার মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ঘটতে থাকে, আর এই শিক্ষা আধুনিক সাহিত্যচর্চায় এবং সাময়িকপত্র প্রকাশে মুসলমানদের উন্মুখ করে। উত্তরসীমা ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ। তার কারণ, উনিশ শতকের শেষ দশকের সূচনায় সমগ্র বঙ্গে হিন্দু-মুসলমান-সম্প্রীতিতে ভাটা পড়ে। তা শেষ দশকে ফাটল হয়ে দেখা দেয়। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের পক্ষে আর বিপক্ষে আন্দোলন প্রমাণ করে সে ফাটল ধীরে-ধীরে বেড়েই যাচ্ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনে, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতির প্রয়োগে এই ফাটল বোধ হয় অনিবার্য ছিল।

পূর্ববঙ্গে ১৮৫৭ থেকে ১৯০৫-এর মধ্যে স্থাপিত সভাসমিতির বিবরণ এই গ্রন্থে আমরা পেলাম। পূর্বে স্থাপিত সাতটি আর পরে স্থাপিত তিন শ একাশিটি, একুনে তিন শ অষ্টাশিটি সভা-সমিতির তালিকা প্রণয়ন করেছেন লেখক। এই তালিকার দর্পণে আমরা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পূর্ববঙ্গের সামাজিক-সাংস্কৃতিক চেহারাটা দেখি। এই তালিকা কোথাও নেই। অশেষ শ্রম-স্বীকার করে লেখক তা প্রস্তুত করেছেন বিভিন্ন প্রশাসনিক প্রতিবেদন, প্রাতিষ্ঠানিক বিবরণ, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা, আত্মজীবনী থেকে উপাদান আহরণ করে লেখক তা সুবিন্যস্ত করেছেন। সভা-সমিতির নাম, কোন্ অঞ্চলে তার অবস্থান, স্থাপনের সময় এবং তাদের কার্যকলাপের বিবরণ এখানে পাই।

নানাদিক থেকেই একশ পৃষ্ঠার এই বইখানি গুরুত্বপূর্ণ।

সভাসমিতি নাগরিক সমাজের বৈশিষ্ট্য।

বর্তমান গ্রন্থে তার নানান বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষিত। লেখকের বিশ্লেষণ আর সিদ্ধান্ত আমাদের কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত করে। তালিকা-ধৃত সভা-সমিতিগুলি স্থাপিত হয়েছিল এইসব জেলায়—ঢাকা, ফরিদপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ-টাংগাইল, রাজশাহী, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, বরিশাল, যশোর, খুলনা, বগুড়া, রংপুর, পাবনা, সিলেট। বিভিন্ন শহরের ও সভাগুলির নামের তালিকায় চোখ বোলালে অনুধাবন করা যায়, পূর্ববঙ্গের নাগরিক সমাজের বিচিত্র কর্ম ও জ্ঞানান্বেষণ-প্রয়াস। যেসব পত্রিকা এসব সভার উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল লেখক তাদের কথাও বলেছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, সভা-সমিতি আর পত্রিকার পরিচালক-মণ্ডলীর সম্প্রদায়গত ও বৃত্তিগত পরিচয়দান। তা থেকে আমরা দেখতে পাই, 'হোয়াইট-কলার' বৃত্তিধারীদের এবং হিন্দু মুসলিম শিক্ষিতদের যৌথ প্রয়াস। অনেক ক্ষেত্রেই হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে কাজ করেছিল। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দেই ঢাকায় সম্পূর্ণভাবে মুসলমানদের উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল 'সমাজসম্মিলনী সভা', যার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমান-সম্প্রীতিবিধান। 'ত্রিপুরা হিতৈষিণী সভা' ও ময়মনসিংহের 'ইটনা ভিলেজ ইউনিয়ন'এর কর্মকর্তারা এসেছিলেন উভয় সম্প্রদায় থেকে। আর-একটি বৈশিষ্ট্য—এইসব সভা-সমিতি পশ্চিমবঙ্গের মতো এককেন্দ্রিক (কলকাতা-কেন্দ্রিক) ছিল না, তা ছড়িয়ে পড়েছিল সব জেলায়।

১৮৭০ থেকে ১৮৯০-এর মধ্যবর্তী সময়ের পূর্ববঙ্গের সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত, মননগত পরিচয় এখানে পাই। তা উপন্যাসের চেয়ে আকর্ষণীয়। সামাজিক, ধর্মীয়, সাহিত্যিক উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হয়েছিল এইসব সভা-সমিতি। রাজনৈতিক সমিতির সংখ্যা অতি অল্প, সামাজিক সমিতির সংখ্যাই প্রধান। স্বাঁকার্য, আমাদের ঈর্ষৎ-অচেনা অদ্ভুরবর্তী গত শতাব্দের পূর্ববঙ্গের সভা-সমিতির এই বিবরণ আমাদের সামনে খুলে দেয় এক বাতায়ন, যার মধ্য দিয়ে আমরা অন্তরঙ্গভাবে চিনে নিই আমাদের এই সমাজকে। লেখক একটি মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করেছেন, একথা অবশ্যস্বীকার্য।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

কবিতায় ভিন্ন স্বাদ ও ভ্রমণ

পুরাণকথন—তরুণ সান্যাল। সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা-৬। আট টাকা।

প্রতিদিন যাই—রবীন সুর। অরণি প্রকাশন, ভাটপাড়া, ২৪ পরগনা। সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

দুরকম কাগজে ছাপা, অজস্র ভাঙা টাইপ, কিছু ছাপার ভুল পেরিয়ে কবিতাগুলির গভীরে ঢুকে অবাক হয়ে যেতে হয়। একসময় 'মাটির নেহালা'র অনেক কবিতা মুখস্থ ছিল। এখনো স্মৃতির প্রতারণা এড়িয়ে কিছু-কিছু পঙ্‌ক্তি আমার সঙ্গী হয়ে থাকে। তরুণ সান্যাল কিন্তু আর সেই পেলব স্নিগ্ধ মায়াময়তার কবি নন। একবারে অন্যরকম এই 'পুরাণকথন'। শুধু আঙ্গিকে নয়, বিষয়বৈচিত্র্যে, ভাবনার অন্তর্লীন সংলগ্নতায় তিনি এখানে একজন নতুন কবি। হাতে নিলে গদ্যের বই মনে হতে পারে, কিন্তু সবগুলিই কবিতা এবং প্রথম পাঠের সঙ্গে-সঙ্গে যা শেষ হয়ে যায় না—পাঠককে ফিরে-পড়তে বাধ্য করে আর মেধাবী দুঃখ দিয়ে স্তব্ধ করে রাখে। একেবারে গদ্যে কবিতা লেখার রেওয়াজ রবীন্দ্রনাথ, অরুণ মিত্র প্রমুখের কাছে আমরা পেয়েছি—তাঁদের সাফল্য আমাদের মুগ্ধও করেছে, এবং হাল আমলের অনেকের মধ্যে আমরা সেই ঘরানার অনুশীলনও প্রত্যক্ষ করেছি। তরুণ সান্যাল প্রকরণের সেই পথটি বেছে নিলেও ভিন্ন স্বাদের এবং বিচিত্র বাঞ্জনার করেছে।

'অবশেষে বাঁধা সড়ক ছেড়ে' মাঠে নেমেছেন তিনি, আর 'মাঠে যখন নামাই গোল, তবে পেরোনো যাক এই তেপান্তর এ ব্রহ্মডাঙা'। স্বপ্ন ভেঙে আবার যেন স্বপ্নের ভেতর চলে যেতে চান কবি। 'ব্রহ্মডাঙা' তাঁর কাছে এক প্রিয় প্রতীক। তাই তিনি অন্য কবিতায় বলেন, "ব্রহ্মডাঙার হাহাকার ফাটিয়ে আকাশে মাথা তুলে ধরছে নতুন কারখানা জনপদ"। কিন্তু একই প্রতীক কখনো স্বস্তি কখনো বা অস্বির অস্বস্তি। তবে কি তা কবির স্বেচ্ছাকৃত স্বৈরাচার? অথবা পাঠক তার ব্যঞ্জনাবাহিত হয়ে অন্ধকারে দেখতে পান না "হলুদ বিদ্যুতের চমকে লাফিয়ে" যাওয়া চিতাকে কিংবা "দাদা-রসবতী"কে!

শ্রম এবং অজস্র গ্রন্থপ্রেম ছাড়া অনেক ব্যবহৃত অনুষঙ্গ অচেনা থেকে যেতে পারে—তবু মনে হয় তাতেও ক্ষতি নেই—কিছু চেনা রূপকল্পের হাত ধরে পঠনপাঠনহীন সাধারণ মানুষও বুঝি কবির আত্মাকে—হয়তো

বা "চোখের মধ্যে সেই চোখ'কে খুঁজে নিতে পারে। কেননা সাধারণ মানুষেরও কবির মতো "যে কোনো বড়ো ব্যাপারেই তার লোভ যেমন রমণী, যেমন ফুল, যেমন বিপ্লব।"

অর্থনীতির অধ্যাপক কবি 'পোলেটিক্যাল ইকনমির ক্লাস' নিতে-নিতে কালো বোর্ডের মধ্যে দেখতে পান "সসাগরা পৃথিবী, জনক-জননী" "বিশ্বজোড়া বাগান", "প্রকৃতি-পৃথিবীর" নানা শতাব্দীর নানা ইতিহাস, কর্মকান্ড, কবিতা ও শিল্প, 'শ্রমনির্ভর' সুদর্শন যন্ত্র। সাম্যবাদী কবি এখানে তাঁর কমরেডের সঙ্গে কথা বলেছেন। মূলত সেই কমরেড তিনি নিজেই। এই কমরেড কবিই "হৃদপিন্ডের আদলে যে মহাদেশ" সেই আফ্রিকার কিছু অস্ত্রোপচার করে যেতে চান। কারণ তিনি জানেন "আগুন শুধু দহনেরই প্রতীক" নয় "স্থায়ী শুদ্ধির শিকড়"।

কোথাও-কোথাও কবি খুব তির্যক। অপ্রতিহত ধারালো ব্যঙ্গ। আহত হয়েও মনে হয় কবি সমব্যথী মমত্ব-বোধে পাশাপাশি বসে উপশম দিতে চান। শুদ্ধ প্রত্যাশার হাত ধরে যেন "মৃত্যুর প্রণাম" কেড়ে নিতে চান। কোথাও-কোথাও বা হালকা রসবোধের মধ্যে যেন "আপ্লুত অভিমান", হয়তো বা হাহাকার—যেমন "যুবক কবি, তোমার যুবতী তবু তোমারই। আমাদের কাছে সে বড়োই বালিকা। অথচ ছটফটায় দীর্ঘ নিঃশ্বাসে তোমারই বয়স। একবার সেই রক্তমাংসে ফিরে গিয়ে ওরই পাশে ঘেঁষে বসার জন্যে।" কখনো বা নানা প্রশ্নের শেষে কবি সিদ্ধান্তপ্রয়াসী—"বন্ধুগণ আমার নখের মধ্যে এখনো শিরশির করে রক্ত, স্নায়ু লাফায়, এক হঠকারী প্রশ্ন তোলে মন, ভালো কমিউনিষ্ট ও ভালো পার্টি সভ্যের মধ্যে সত্যিই কি তফাৎ রয়ে যায়"। অবশ্য এই কবিতার শেষে তিনি বলেছেন, "কেবল পাল্লা খোলে আর বন্ধ হয়, সিদ্ধান্ত নেবার সময় কেবলই পিছিয়ে যায়।"

আসলে কাব্যগ্রন্থটিতে কবির বিভিন্ন মুড, বিচিত্র বিষয়বস্তু, নানা অভিজ্ঞতা, চেনা মানুষ সবই এসেছে। ফলে একটি বা দুটি মূল বিষয় খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন। প্রেম, নিসর্গ, ইতিহাস, পুরাণ, লোককথা, সংগ্রাম, জীবনযাপন—সবই ছড়িয়ে আছে নানাভাবে কোথাও বা সাবজেকটিভিটির মোহিনী আড়ালে, কোথাও বা বড়ো বেশি অবজেকটিভ হয়ে। 'পুরাণ-কথন' শুধু কবিতাগ্রন্থ নয়—একজন সৎ উল্লেখযোগ্য কবির অভিজ্ঞতার বহুবর্ণ দলিল। চারুখানের প্রচ্ছদ চমৎকার, অসাধারণ ব্যঞ্জনাময়।

ষাট দশকের অন্যতম বিশিষ্ট কবি রবীন সুর। 'প্রতিদিন যাই' কাব্যগ্রন্থে ভ্রমণপ্রয়াসী কবি মূলত ঘুরে বেড়িয়েছেন সারা বাঙলার এপ্রান্ত ওপ্রান্ত। উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম। দিল্লী আর ভুটানেও গেছেন। আমার মনে হয়, ভ্রমণবিষয়ক কবিতা লেখা দুরূহ। যা দেখেছি তাই লিখলে প্রতিবেদন হয়, কবিতা হয় না। কিন্তু কবি "সমস্ত অস্তিত্বের নুন" দিয়ে "ঘামকে আতর" বানিয়েছেন—'মরা-মরা' মন্ত্রে প্রাণায়াম' করেছেন। বলা বাহুল্য, কখনো কখনো আমাদের মুগ্ধও করেছেন।

এই কবিতাগুলিতে রোমানটিক লাবণ্যের স্নিগ্ধতা রয়েছে—কবি এখানে খুব একটা উচ্চকণ্ঠ নন যা রবীনের প্রায়স্বাভাবিক চরিত্র। কোথায় যেন এক আন্তরিক হাহাকার কাজ করেছে—

'আকাশের কোনো পার্টিশান নেই

পৌঁছাতে আর দেরি নেই—?

যেখানে সমস্ত রাত

বাঁশবাগানের মাথায় কাজলাদিদির

মুখ,

অন্ধবধূর বকুল গন্ধে ফাল্গুন

অথবা চৈত্র।

দেবুদা, করিমপুর কতোদূর?

কিংবা

'প্রেম প্রীতি ভালোবাসা শহর

খেদায়'।

'শুশ্রূষা' শব্দটির প্রতি কবির ভীষণ লোভ। আসলে আমরা সবাই তো শুধু ভুগছি। উপশম, নিরাময় প্রায় অচেনা হয়ে গেছে। সুতরাং আরোগ্যের জন্যে 'শুশ্রূষা'র প্রয়োজন। 'জলপাইগুড়ি : শীত ১৯৮১'-তে লিখেছেন—"মফঃস্বল শহরের কবিতা আমার/দারুণ শীতের লেপ/শব্দের কম্বল/গান হয়ে বেজে ওঠা স্বপ্নের **শুশ্রূষা**"। কিংবা 'উত্তরবঙ্গের চিঠি : খুঁটিমারি'তে "অথচ একদা অরণ্যের কাছাকাছি **শুশ্রূষা** রঙের রোদ ছিল/রুদ্রাক্ষের জলে" অথবা 'নিমন্ত্রণ' কবিতায় "প্রতিদিন যাই যাই ভ্রমণের গান/শরীরে ছড়িয়ে পড়ে **শুশ্রূষার** নরম আঙুলে"। তাহলে ভ্রমণই কবির কাছে পরম শুশ্রূষা।

কিছু-কিছু উপমা, বক্রোক্তি, রূপকল্প চমৎকার। দৃষ্টান্ত দেবার ইচ্ছেকে আটকে রাখা যায় না। "কালো শ্লেটের মত দিগন্তের আকাশ" তেজস্ক্রিয় নিঃশ্বাসের কূট কালীদহে/উড়ন্ত গানের মৃত্যু" "ঢেউখেলানো টিনের মত থাক থাক চা বাগান" "এই ছায়া-গন্ধ সোনাথালি কাঠকলের ঝিঁঝিঁ" "মায়ের আঁচল ছুঁয়ে দামাল ছেলেটি/তার বুড়ো আঙুলে দেখিয়ে/রোদকে ভেঙচি কেটে শুয়ে আছে জলের বিছানায়" ইত্যাদি।

কিন্তু কিছু সাদামাটা উচ্চারণ, বহু-ব্যবহৃত শব্দবন্ধের ব্যবহার অবশ্যই পীড়িত করে। মাঝে-মাঝেই রবীন সুরের বড়ো বেশি ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক—"উত্তরের হাওয়ায় তোমার চিঠি/প্রতিবছরের শীতে যেমন দূরের পাখিরা/অচেনা দেশের গন্ধমাখা ডানায়/আমাদের সমতল ভূমিকে জানিয়ে দেয়/শীত এসে গেছে বসন্তের আর দেরি নেই"। প্রথম দুটি পঙক্তিতে যে রহস্যময়তা তা কিন্তু ভেঙে খানখান হয়ে গেল পরের পঙক্তিগুলির বিশ্লেষণধর্মিতায়। বিশেষত পঞ্চম পঙক্তিটি শেলিকে বড়ো বেশি মনে করায়। রবীন এমনিতে একজন শব্দসচেতন শিল্পী কিন্তু এই কাব্যগ্রন্থে এমন কিছু-কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন যা অনেক সময়ই নতুনত্বের প্রতি ঝোঁকের ফল কিন্তু প্রায়শই ব্যঞ্জনাহীন।

তবু এই কাব্যগ্রন্থের সুবাদে পাঠকেরও অনেক অচেনা অনেক অদেখা জায়গা চেনাদেখা হয়ে যাবে—হয়তো ভবিষ্যতের ভ্রমণপ্রকল্প বানানোর সময় অবচেতনে কাজ করেও যাবে।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

আরব্য রজনীর দেশে—সুমিত্রা চট্টোপাধ্যায়। প্রত্যয়প্রকাশনী। কলিকাতা-৩১। আঠারো টাকা।

রূপকথার শঙ্খমালা, অরুণ-বরুণ-কিরণমালা, লালকমল আর নীলকমলের সঙ্গে আরব্য-রজনীর গল্পের চরিত্রগুলির খোঁজে এখনো বোধহয় আমাদের দেশের ছেলেবুড়ো নাওয়া-খাওয়া ছাড়তে পারে। ফলত হারুন-অর-রশিদের দেশ বাগদাদ আর সিন্দবাদ নাবিকের সমুদ্রযাত্রার বন্দর বসরার সন্ধান পেয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়াটা স্বাভাবিক—তারই পরিণতি এই ভ্রমণকাহিনী। লেখিকাকে ধন্যবাদ তাঁর ভালোলাগাটুকু একা-একা না উপলব্ধি করে তিনি পাঠকদের জন্য কলম ধরে তার ভাগ দেবার চেষ্টা করেছেন।

স্বামীর কর্মস্থল আরব্যরজনীর দেশে অর্থাৎ বাগদাদে গিয়েই ঘটনার মধ্য দিয়ে দুটি শব্দের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন—'আকু' আর 'মাকু'—অর্থাৎ চিচিং ফাঁক আর চিচিং বন্ধ—এককথায় আছে আর নেই। এই শব্দ দুটিই লেখার মূল সুর। এ আমলের সঙ্গে রূপকথার আমলেরও হারুনের অবিশ্বাস্য ধনসম্পদ, সেই আমল অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর বাগদাদের বাণিজ্য-সমৃদ্ধি, বিচিত্র নৌবহরের গল্প শুনিয়েছেন তিনি। যেমন হারুন-পত্নী জুবেদার সোনারুপোমণিমাণিক্যখচিত বাসন এবং তাঁর ছেলে মামুনের বিয়ের পর পত্নী-সহ সোনার মাদুরে দাঁড় করিয়ে হাজার মুক্তো ছড়ানো এবং অতিথিদের বহুমূল্য উপহার দেওয়ার গল্পে লেখিকা খুবই বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু প্রসঙ্গত মনে এসে পড়ে, তৃতীয় শতক থেকেই ভারতে আসা নানান বিদেশী পর্যটকদের বিস্মিত হতচকিত ভ্রমণকাহিনীগুলি, যেখানে লেখা বাঙলাদেশের সাধারণ ধনীদের বাড়িতেও মণিমুক্তাখচিত সোনারুপার বাসন ছাড়া কিছু ব্যবহৃত হত না, এবং বিদেশী অতিথিদের ভোজনের পর নানারকম সোনার পাত্র, মণিমুক্তাখচিত কোমরবন্ধ, স্বর্ণালঙ্কার এবং তাঁদের কর্মচারীদেরও ঐরকম রুপার জিনিস উপহার দেওয়া হত, এবং জনপ্রতি সাতজনের আহার না দিলে গৃহস্থের নিন্দা হত। এখন সময়টা উলটে গেছে। আরবদেশ পেট্রোলের কল্যাণে তার প্রাচীন ধনসম্পদ চতুর্গুণে ফিরে পেয়েছে আর সারা পৃথিবী থেকে তাদের আমদানিকরা জিনিসের শোভা দেখতে-দেখতে বিহ্বল বর্ণনা লেখেন এদেশীয়রা। আমাদের দুর্ভাগ্য, সিন্দবাদ বণিকের বাণিজ্য নিয়ে যে রোমাঞ্চকর গল্পগুলি বাগদাদের প্রাচীন বাণিজ্যিক ভূমিকার উপর গড়ে উঠেছিল,—বাঙলা বা ভারতের পৃথিবীময় বাণিজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তেমন গল্পের কাহিনীকার আমাদের দেশে জন্মালেন না—দৈবমুখীনতার রোষেই শেষ হল চাঁদ বা ধনপতি সদাগরের সপ্তডিঙা মধুকর।

নসটালজিয়া বাদ দিয়ে অন্য ছবিগুলির দিকে এবারে চাওয়া যাক। পুরাতনের ভিতের উপরে গড়া নতুন ইরাকের দ্বিমুখীন মানসিকতা সর্বত্র। আরবিভাষীদের মধ্যে মুসলমান ছাড়াও প্রচুর খ্রীষ্টান ইরাকি হয়েছে। শিক্ষিত বোরখাবিহীন পশ্চিমী-পোশাকপরা চাকুরিজীবী মেয়ের পাশে-পাশেই দেখা যায় গাভর্তি ভারি সোনার গয়না পরা মহিলারা প্রচুর ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘুরে-ঘুরে প্রয়োজনের দশগুণ ফল তরকারি জিনিসপত্র কিনে বেড়ান। পৃথিবীব্যাপী জ্বালানির কষ্টেও সেখানে কেরোসিনে ঘর মোছা, টয়লেট পরিষ্কার আর কাপড় কাচা হয়। চিঠি লেখার অনভ্যাসের দরুন চিঠি বিলি করতে তাদের কোনো তাড়া নেই—উপরন্তু মুঠো-মুঠো করে দুমড়ে মুচড়ে চিঠি তুলে খোলা প্ল্যাসটিকের বাকসে নেওয়া বেশ কিছু চিঠি হাওয়ায় পথে উড়িয়ে মেলভ্যান চলে যায়। প্রয়োজনীয় কথা ইরাকিরা টেলিফোনেই সেরে নেয়, তা যতদূরেই হোক। এলাহি খাবারের ব্যবস্থা থাকে সব নিমন্ত্রণে, কিন্তু খাদ্যপানীয়ের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন বাসনের ব্যবস্থা নেই, এক থালা, এক চামচ অথবা একই গ্লাস থেকে খাদ্যপানীয় গ্রহণ করতে না চাইলে গৃহস্বামী অপমানিত বোধ করবেন। এ রেওয়াজ আরবিভাষী সব দেশগুলিতেই। যৌথ-পরিবারপ্রথা অধিকাংশ লোকেরই প্রিয়।

লোকসংখ্যাবৃদ্ধিতে উৎসাহ দেবার জন্য বিয়েতে নববিবাহিত দম্পতিকে সরকার যৌতুক দেয় হাজার দীনার, ছেলেমেয়ে হলে আয় হিসাবে সন্তান-ভাতা এবং স্কুলের বইখাতা, টিফিন, পোশাক—সবকিছুরই খরচ দেয় সরকার। এর পাশাপাশি আছে অন্য গল্প

যেখানে পথে বিবদমান আসামিদের গুলি করে পুলিশ সঙ্গে-সঙ্গেই লাশ লোপাট করে দিচ্ছে, অথবা সাধারণ মানুষ তুচ্ছ ঝগড়াবিবাদে পরস্পরকে গুলি করে মেরে ফেলছে কিংবা পানাসক্ত চালক প্রায়শই খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে পথচারীর মৃত্যুর কারণ পচ্ছে। সব মৃত্যুরই মিটমাট হয় প্রচুর দীনারের মাধ্যমেই—এই ভয়াবহ মিটমাটের বর্ণনায় সুকুমার রায়ের "শিবঠাকুরের আপন দেশে/আইনকানুন সর্বনেশে" লাইন দুটি মনে পড়া অবধারিত।

আরব্যরজনীর দেশের সত্যিকারের বিস্ময় বোধহয় জমা হয়ে আছে চোর-ডাকাতের ভয় না থাকায়। সেখানে ব্যাঙ্কে সশস্ত্রপ্রহরীব্যতিরেকে সাজানো থাকে থাক-থাক দীনার ; সব জিনিসের দাম সরকার বেঁধে দেওয়ায় কখনো, এমনকি যুদ্ধের সময়েও, দাম এক পয়সা বাড়ে না, মাল ভিতরে মজুত অথচ বাইরে উধাও নয়, না থাকলে সত্যিই থাকে না। আসলে সবকিছুই আমদানি করে আনা হয় বলে কখন জিনিস 'মাকু' হবে কেউ বলতে পারে না, সেই ভয়েই লেখিকাও কিনে ফেলেন লাইন দিয়ে রঙিন টিভি, পঞ্চাশ কিলো আলু কিংবা পাঁচশো কিলো চাল! অজস্র বিদেশী পণ্যের জন্য এখানকার বিভিন্ন বাজারের বর্ণনা বারেবারেই এসেছে বইটিতে—এমনকি ইরাক-ইরান যুদ্ধ ঘোষণার খবর জানতে পেরে চাল-ডালের বদলে বিদেশী জামাকাপড় আর বাসন কিনে আনেন তিনি। আরবি শেখার উৎসাহে দেশীয় লোকেদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতায় হঠাৎ-নবাব ইরাকীদের ব্যক্তিগত জীবন, তাদের প্রথা, অতিথি-আপ্যায়ন আর ভারতীয় বান্ধবীদের বিচিত্রসমস্যাবহুল জীবন ভ্রমণকাহিনীতে উপন্যাসের আমেজ এনেছে। সহৃদয়, মিশুকে নারীপুরুষ এবং পুলিশ, ড্রাইভার বিদেশীকে সাহায্যের জন্য সদাই উদ্‌গ্রীব। কখনো বিস্ময় লাগে এই বদান্যতায় যেখানে আরোহিণীর ভাষা বুঝতে না পেরে বাস-ড্রাইভার একই জায়গায় বারবার যাতায়াত করে তাঁকে, নামতে সাহায্য করে—পুলিশ ড্রাইভারকে ধমক দিয়ে বিদেশীকে অর্ধেক ভাড়ায় গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাবার হুকুম দেয়, হোটেলওয়ালা কণ্টলাঘবের জন্য নিজে এসে নোংরা টয়লেট পরিষ্কার করতে আরম্ভ করে! এমনতর হাজার রহস্যময় বর্ণনা থাকলেও ভারতীয় প্রতিবেশীদের কোঁদল, পরচর্চা আর দীনার লোলুপতার গল্প নিমেষে সব রহস্যের বেলুন ফুটো করে দেয়।

গল্পের ফাঁকে-ফাঁকে কখনো এসেছে ওদেশের রাজনৈতিক বিবাদ, অর্থনৈতিক চিত্র আর যুদ্ধের বর্ণনা। তবে গল্পের পটভূমিকাতে যুদ্ধের ভয়াবহ বিভীষিকাময় চরিত্র তত ফুটে ওঠে নি ; বৎসরাধিক যুদ্ধের পরিবেশে তিনি ওদেশে থেকেছেন—তাই ঘুরে-ঘুরেই ভ্রমণকাহিনী আর বাজার করার মধ্যে ক্যাজুয়ালি এসেছে সাইরেনের আওয়াজ, গোলাগুলির শব্দ, আর টিভিতে আহত সৈন্যের ছবির বর্ণনা। যুদ্ধের বাজার দুর্মূল্য নয়, মাল সরবরাহ স্বাভাবিক, শুধু কেরোসিন-বাতি আর গ্যাসের কিছু অসুবিধা আমাদের নিত্য ব্ল্যাক-আউটের অভিজ্ঞতায় তত ভয়াবহ মনে হয় না। লেখিকার আতঙ্ক প্রবল হয়েছে বোমা পড়ার সময়ে ছেলেকে ফেলে বাইরে আটকা পড়ায়—তবু ওই ডামাডোলের মধ্যেও ইরাকী হোটেল-ম্যানেজারের আতিথ্য, বরাভয় এবং ছড়ানো জিনিস গুছিয়ে তাঁর হাতে ধরিয়ে দেবার পরে সাময়িক উত্তেজনা শান্ত হয়ে আসে, সে উত্তেজনা খেলা হয়ে যায় বাড়িতে পেঁাছে ছেলের নিরাপদ অবস্থিতিতে এবং পাঁচদিন ধরে ব্ল্যাক আউটের রাতে পেট্রলের ডিপোর আগুন দেখার মধ্যে। যুদ্ধের এমন নিকট, ভয়াল ও বিধ্বংসী রূপের পরিপ্রেক্ষিতেও ভারতীয় বান্ধবীর গৃহ-সমস্যা অনেক বেশি জায়গা নিয়েছে মনে হয়, তবে শেষে ভারতীয় ইনজিনিয়ারের মর্মান্তিক আত্মহত্যা এই যুদ্ধের পটভূমিকার শেষ ঘটনা হবার উপযুক্ত।

ডায়েরির মতো লেখা এই ভ্রমণ-কাহিনীর এই গদ্য ঝরঝরে। প্রথমে বিচিত্র আশংকাগুলি আরব্য-উপন্যাসের আমেজ আনতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু ঐতিহাসিক স্থানের আলোকচিত্রগুলির সম্ভার কাগজে অস্পষ্ট ছাপার জন্য পাঠকের কৌতূহলকে হতাশ করে। শুধু প্রচ্ছদচিত্রটিই উজ্জ্বল, কিন্তু ভিতরের ছাপা ও কাগজ বিষয়ে প্রকাশকের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন ছিল মনে হয়।

মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

আলোচনা

আসাম : আন্দোলনের পটভূমি ও নির্বাচনোত্তর প্রতিক্রিয়া

একটানা ছ বছর আন্দোলনের পর শেষ পর্যন্ত সরকার এবং আন্দোলনকারীদের মধ্যে একটা রফা হয়ে যাওয়ায় সম্প্রতি আসামে যে নির্বাচন হয়ে গেল, তা ভারতের ইতিহাসে বিগত দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী আন্দোলনটির মতোই একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। নানা দিক দিয়ে। ভোটদানের আগ্রহ অতীতের সমস্ত নজিরকেই বড়ো লাফে অতিক্রম করে গিয়েছে। উনিশ শ তিরাশির রক্তক্ষয়ী জবরদস্তি নির্বাচনের বিপরীতে এবারের নির্বাচনের শান্ত, সুশৃংখল, নিরুপদ্রব চেহারা সকল পক্ষকেই বিস্মিত করেছে। এর তাৎপর্য বুঝতে গেলে আমাদের দৃষ্টিকে শুধু দেশবিভাগজনিত সমস্যার উপরে নিবদ্ধ রাখলেই চলবে না, বিগত একশ বছরের ইতিহাসকেও সামনে রাখতে হবে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আসাম দখল করে প্রথমে একে বঙ্গ-প্রেসিডেন্সির একটি প্রশাসনিক বিভাগ করে রেখেছিল ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত। তার পরে, ছোটলাটশাসিত আলাদা প্রদেশ হিসেবে এর অবস্থান আবার বিলুপ্ত হয়েছিল যখন ১৯০৫-১৯১১ পর্বে আসামকে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে একই জোয়ালে জুড়ে আলাদা প্রদেশ তৈরি হল। সারা উনিশ শতক ধরেই আসামের অসমীয়া এবং উপজাতীয় জনসংখ্যা ছিল খুবই সীমিত, এবং প্রায় স্থাণু। অথচ মামুলি প্রশাসন এবং শোষণক্ষেত্র হিসেবে আসামকে তৈরি করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের প্রয়োজন ছিল জনবলের। তাই ভিন্ন প্রদেশ থেকে হাজারে-হাজারে শ্রমিক আমদানি করা হয়েছিল চা-বাগানে, তেল-কয়লার খনিতে, পরিবহণ-ব্যবস্থায় এবং প্রশাসনিক কাঠামোয়। শয়ে-শয়ে ভিন্ন প্রদেশ থেকে কেরানি, মুহুরি, উকিল, মোকতার, ডাকতার, ব্যবসায়ী এঁরাও এসেছিলেন।

শহরগুলোতে সাহেবদের দাপটের পরবর্তী স্তরে স্থানীয় অসমীয়াদের প্রাধান্য ছিল না, প্রাধান্য ছিল বাঙালিসহ অন্য-প্রদেশাগতদের। চাকরি এবং ছোটো-ছোটো ব্যাবসায় অসমীয়াদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আগন্তুক বাঙালিরা। তা ছাড়া, যেহেতু অসমীয়া এবং বাঙলা দুইই কাছাকাছি ভাষা, এবং একই লিপিতে লিখিত, সেজন্য অসমীয়াদের তখন থেকেই একটা ভয়

দেশে বিদেশে

বদ্ধমূল হয়েছিল যে, সংরক্ষণী মনোভাব গ্রহণ না করলে অসমীয়ারা নিজেদের ভাষা ছেড়ে হয়তো কালক্রমে বাঙলাভাষী হয়ে পড়বেন। এ ভয়ের ঐতিহাসিক কারণও ছিল। ব্রিটিশ শাসকরা আসাম দখল করেই ইংরেজি ভাষার ছত্রছায়ার তলে এখানে একটানা ছত্রিশ বছর অসমীয়া ভাষাকে ইস্কুল-আদালতের প্রাঙ্গণ থেকে নির্বাসিত করে তার জায়গায় বাঙলা ভাষাকে বাধ্যতামূলকভাবে চালু রেখেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল এই যে, অসমীয়া বাঙলার উপভাষামাত্র, এবং উপভাষাকে হটিয়ে বাঙলা চালালে লোকের বিশেষ অসুবিধা হবে না, অথচ প্রশাসনের খরচ কমবে, সুবিধে হবে। শেষ পর্যন্ত অসমীয়াকে স্বমর্যাদায় ফিরিয়ে আনতে শাসকরা বাধ্য হয়েছিলেন ১৮৭৩ সালে।

এইভাবে বাঙলাভাষী আর অসমীয়াভাষী শহুরে মধ্যবিত্তদের মধ্যে মনকষাকষি চলতে থাকার সময়, সমস্যা আরও জটিল হয়ে দাঁড়াল বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে প্রায় স্বাধীনতালাভের সময় পর্যন্ত। পূর্ববঙ্গ থেকে জমি-বুভুক্ষু কৃষকরা হাজারে-হাজারে এসে আসামের অনাবাদি জংলা মাটিতে বসতি গড়ে তুলতে লাগল। স্বাধীনতার আগেই আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার গ্রামাঞ্চলে এভাবে প্রায় পাঁচ লাখ পূর্ববঙ্গাগত বাঙালির উপনিবেশ গড়ে উঠল। এদের মধ্যে শতকরা দশ-পনেরো জনকে বাদ দিলে বাকি সবাই মুসলমান। এদের সমর্থনের উপর ভিত্তি করেই অভিবাসী (সেট্‌লার) নেতা মৌলানা আবদুল আবদুল হামিদ খান ভাসানির নেতৃত্বে আসামের মুসলিম লীগ একটি শক্তিশালী দলে পরিণত হয়ে আসামের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির আওয়াজ তুলেছিল।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসেবে অবস্থানের সময়েও, কখনোই অসমীয়াভাষীরা আসামের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিলেন না। জনবহুল দুটি বাঙলাভাষী জেলা শ্রীহট্ট এবং কাছাড়ের দৌলতে এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়ও বিপুলসংখ্যক অভিবাসী বাঙালির উপস্থিতির দরুন বাঙলাভাষীরা ছিলেন ১৯৩১-এ তৎকালীন প্রদেশের জনসংখ্যার শতকরা বিয়াল্লিশ ভাগ, এবং অসমীয়াভাষীরা শতকরা ত্রিশ ভাগের মতো। এইসব কারণে প্রাক্‌-স্বাধীনতা দশকটিতে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিল অত্যন্ত জটিল। তখনই কংগ্রেস এবং বামদলগুলির দাবি ছিল যে, শ্রীহট্টকে

আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে, এবং অন্য প্রদেশ থেকে জনাগমন বন্ধ করতে হবে। ১৯৩৮ সালকে 'বিভাজন বছর' (কাট-অফ ইয়ার) বলে গণ্য করে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা এই নীতি গ্রহণ করেছিল যে, ১৯৩৮-এর পয়লা জানুয়ারির আগে আসা কোনো অধিবাসীকে ভবিষ্যতে আর আসামের অনাবাদি জমির বন্দোবস্ত দেওয়া হবে না।

ইতিমধ্যে স্বাধীনতা এসে যাওয়ায় অনেকগুলো পরিবর্তন ঘটল। শ্রীহট্ট চলে গেল পূর্ব-পাকিস্তানে, এবং মুসলিম লীগ নিজেকে ভেঙে দিয়ে সমর্থকদের কংগ্রেসে যোগ দিতে বলল। অন্যদিকে তাঁদের বলা হল রক্ষণপুত্র উপত্যকায় অসমীয়া ভাষা গ্রহণ করে অসমীয়াভাষী সমাজে মিশে যাওয়ার জন্য। এঁরা দুটো উপদেশই পালন করলেন। এমনকি ১৯৬০ সালে অসমীয়াকে রাজ্যভাষা করার আন্দোলনে, এবং ১৯৭২-এ অসমীয়াকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মাধ্যম করার আন্দোলনেও তাঁরা পুরোপুরি শামিল ছিলেন। এইভাবে পূর্ববঙ্গাগত মুসলমান অভিবাসীদের অসমীয়াকরণ যখন চলতে থাকছে, তখন আরেকটি ব্যাপারও ঘটল—পূর্ববঙ্গ থেকে হাজারে-হাজারে অমুসলমান শরণার্থী এসে ভিড় করলেন আসামের গ্রামে, গঞ্জে, শহরে। এ পর্যন্ত এঁদের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে বেশ কয়েক লক্ষ। এ ছাড়া, নেপালিদের আগমনও অব্যাহত রয়েছে। এইরকমের নানা চাপে অসমীয়া জনমানস আবার নতুন করে নিজ বাসভূমে—রক্ষণপুত্র উপত্যকা তাঁদের ঐতিহাসিক বাসভূমি—পরবাসী হওয়ার সম্ভাবনায় বিহ্বল হল।

নতুন করে বলছি এইজন্য যে, শ্রীহট্ট বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, এবং অভিবাসীরা বিপুল সংখ্যায় অসমীয়া ভাষা মাতৃ-ভাষা বলে স্বীকার করে নেওয়ায়, ১৯৫১ থেকে শুরু করে পর-পর তিনটি আদমসুমারিতে অসমীয়াভাষীরা জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশে পরিণত হয়েছিলেন। এর অর্থ এই যে, ভারতের আর-দশটা রাজ্যের মতো আসাম রাজ্যও কার্যত হয়ে দাঁড়াল ভাষাভিত্তিক রাজ্য। কিন্তু ক্রমাগত জনাগমন হতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে অসমীয়ারা নিজরাজ্যে আবার সংখ্যালঘিষ্ঠ হবেন—এইরকম একটা ভয় স্থানীয় পত্র-পত্রিকার প্রচারের মাধ্যমে সত্তরের দশকে জনসাধারণকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তারপরের ইতিহাস আমরা জানি। আশঙ্কা, বিদেশী বিতাড়ণ আন্দোলন, কয়েক বছর ধরে একটানা হিংসার তাণ্ডব, রক্তাক্ত নির্বাচন, নেলীর হত্যাকাণ্ড, আসাম সমঝোতা, অবশেষে বর্তমান নির্বাচন।

বিধানসভায় **অগপ**-র নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে এই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হল আসামের প্রশাসনে অসমীয়া ভাষাগোষ্ঠীর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা-প্রয়োগের সুযোগ। যাঁরা বলেছিলেন—রাজনীতি বা ক্ষমতালাভ তাঁদের উদ্দেশ্য নয়, তাঁরাই এগিয়ে এসে গদিতে বসেছেন এই বলে যে একমাত্র প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগের ভিতর দিয়েই আসামকে বিদেশীমুক্ত করা সম্ভব। ক্ষমতাসীন সরকার যদি সাবধানে এগিয়ে যান এবং বিদেশী বিতাড়নের নামে কোনো ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি না করেন, তাহলে, যতদূর মনে হচ্ছে, সর্বস্তরের মানুষই এঁদের সপ্রে সহযোগিতা করবেন। কারণ তারুণ্যের কাছে মানুষের অনেক আশা।

তা ছাড়া, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঘোষিত নীতি, এমনকি 'আমসু'-র ঘোষিত নীতি অনুযায়ীও, ১৯৭১-পরবর্তী অগণতুকদের 'অবাঞ্ছিত বিদেশী' বলা হয়েছে। অর্থাৎ ভারতীয় নাগরিকদের হয়রানি না করে সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে যদি বেছে-বেছে শুধু প্রকৃত বিদেশীদেরই আসাম-ছাড়া করা হয়, তা হলে এমনকি 'সি-পি-এম এবং 'ঐকাবদ্ধ মাইনরিটি ফ্রন্ট' (ইউ-এম-এফ) এতে বাধা না দিতে প্রতিশ্রুত। যদি 'অগপ' সরকার আসামচুক্তির রূপায়ণের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করেন, এবং মানবিকতা বিসর্জন না দেন, তাহলে আসামের বাড়তি বোঝা অবশিষ্ট ভারতের ওপর ছড়িয়ে দেওয়ার একটা জাতীয় নীতি ঠিক করা খুবই সম্ভব।

তা যদি না হয়, তাহলে বিপদের কথা। নির্বাচনের ফলাফল যদি মানচিত্রে ফেলা যায় তবে দেখা যাবে যে, ভোটাভুটি প্রধানত ভাষাগত সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে হয়েছে। আসামের সতেরোটি জেলার মধ্যে পাঁচটি জেলায় 'অগপ' একটি আসনও পায় নি। রক্ষপুত্র উপত্যকার ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া এবং বরপেটা জেলাতেও 'অগপ'-র অবস্থান প্রান্তিক। যদি 'অগপ' সংখ্যালঘুদের মন জয় না করতে পারে, তাহলে ভাষার ভিত্তিতে আরেকবার আসামকে একাধিক রাজ্যে ভাগ করার দাবি প্রবল হয়ে উঠবে। এই দাবির স্বপক্ষে সংখ্যালঘুদের যে আন্দোলন গড়ে উঠবে, সে আন্দোলনের মডেল হবে অসমীয়াভাষীদের সাম্প্রতিক সফল আন্দোলন।

আপাতত সরকার এবং বিরোধী পক্ষ উভয়ের মতেই এই মুহূর্তে আসামের আশু কর্তব্য হল জনসাধারণের মধ্যে শান্তি এবং সম্প্রীতি বজায় রাখা। নির্বাচনের ঠিক পরেই কিছু উত্তেজনা এখানে ওখানে দেখা দিয়েছে। কয়েকজন হতাহতও হয়েছেন। কিন্তু আশা করা যাচ্ছে, বড়ো মাপের অঘটন কিছু ঘটবে না, এবং বর্তমান সরকার ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে থেকে সভ্য সরকারের ন্যূনতম কর্তব্যগুলো পালন করে যাবেন। 'অগপ'-র মন্ত্রিসভায় উগ্রপন্থীদের বাদ দিয়ে মধ্যপন্থীদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনাও তাৎপর্যপূর্ণ।

অমলেন্দু গুহ

কংগ্রেসের এক-শ বছর

১৮৮৫ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বোমবাই শহরে "ইনডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস"-এর প্রথম সম্মেলনে এ-ও-হিউম-এর প্রস্তাব অনুযায়ী সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হন ডব্লিউ সি বনার্জি। উদ্বোধনী বক্তৃতায় নব-নির্বাচিত সভাপতি এ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন যে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে ডেলিগেটরা সভায় যোগ দিতে এসেছেন, যার ফলে সম্মেলন প্রতিনিধিমূলক চরিত্র লাভ করেছে। তিনি বলেন, শিক্ষাদীক্ষায় এবং ধনসম্পদে জনসাধারণ যত উন্নতি করবে, রাজনৈতিক বিষয়ে তাদের দৃষ্টি তত খুলবে, এবং রাজনৈতিক অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষাও তাদের ততই বেড়ে যাবে।

রাজনৈতিক অগ্রগতি বলতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি অবশ্যই বুঝেছিলেন, দেশের শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের যথাযোগ্য এবং ন্যায়সংগত অংশগ্রহণ। সে কথা স্পষ্ট করে বলার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি অবশ্য এ বিষয়েও সন্দেহের কোনো অবকাশ রাখেন নি যে, ইউরোপেও শাসনব্যবস্থা-সংক্রান্ত এই ধারণাটি প্রচলিত, এবং এই ধারণা অনুযায়ী আমাদের দেশেও শাসনব্যবস্থা চলুক—এরকম ইচ্ছা কোনোক্রমেই ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্যের পরিপন্থী নয়।

কংগ্রেসের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের যে তালিকা কংগ্রেস সভাপতি সেই উদ্বোধনী ভাষণে পেশ করেন, তাতে অবশ্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে দাবি, বা আবেদনই, ছিল না, জাতিগঠনের বিষয়ে-ও কিছু কর্তব্যবোধের পরিচয় ছিল। তিনি বলেন, "জাতীয় ঐক্য সংগঠিত করতে হবে, জাতিগত, ধর্মীয় এবং প্রাদেশিকতাজাত সংকীর্ণতা নির্মূল করতে হবে।"

আজ, একশ বছর পরে, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সেই আনুগত্যস্বীকার অতীত ইতিহাসে পর্যবসিত, ইউরোপের দৃষ্টান্তের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু জনসাধারণকে দেশশাসনে যথার্থ অংশীদারের মর্যাদা, অধিকার এবং দায়িত্ব প্রদানের লক্ষ্যে যে আমরা পৌঁছতে পেরেছি— এমন কথা জোর দিয়ে বলতে পারি না। আর, জাতীয় ঐক্য? মাঝে-মাঝে মনে হয়, সে এক অসাধ্যের সাধনা।

সেই প্রথম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে আমন্ত্রিতেরা যে চিঠি পেয়েছিলেন তাতে ছিল—সম্মেলনে সেই নেতৃস্থানীয় রাজনীতিকেরা যোগ দেবেন যাঁদের ইংরেজি ভালোমতো জানা আছে। ইংরেজি ভাষা আমাদের জাতীয় ঐকাসাধনায় তখন অপরিহার্য ছিল। এখনও, শত চেষ্টাতেও, সেই 'বিদেশী' ভাষা বর্জন করে কোনো সর্ব-ভারতীয় ভাবসম্মিলনের কথা আমরা ভাবতে পারি না। কংগ্রেস (ই)-র গত ডিসেমবরে বোমবাই অধিবেশনেও সভাপতিকে তাঁর ভাষণে হিন্দির সঙ্গে ইংরেজিকেও ঠাঁই দিতে হয়েছিল। এখনও অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই, সমাজের যে প্রাগ্রসর স্তরে জাতীয় ঐক্যের ভাবনা সবচেয়ে পরিস্ফুট, ইংরেজি তার চিন্তাভাবনার নিতাকার বাহন।

বলা বাহুল্য, যে শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উমেশচন্দ্র বনার্জি তাঁর সভাপতির ভাষণে ব্যক্ত করেছিলেন, এবং ইংরেজি শিক্ষা যার অপরিহার্য অঙ্গ বলে তিনি অবশ্যই মনে করে থাকবেন, সমাজের সকল স্তরে তা সমানভাবে পরিব্যাপ্ত হবে, এ আশা অলীক ছিল। ইংরেজির কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, যৎসামান্য অক্ষর-পরিচয়ও তখন, এবং তার পরেও অনেক দিন পর্যন্ত, সীমাবদ্ধ ছিল দেশের জনসংখ্যার তুলনায় অতি অল্প-সংখ্যকের মধ্যে। অথচ, গান্ধী যখন দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতৃত্ব হাতে নিলেন, তখন দেখা গেল, সারা দেশ জুড়ে 'রাজনৈতিক অগ্রগতি'-র প্রায় অপ্রতিরোধ্য একটা জোয়ার ভাসিয়ে নিয়ে যাবার উপক্রম করল দারিদ্র্যের, নিরক্ষরতার যাবতীয় বাধাকে। শুধু তাই নয়, তার চেয়েও যেটা বেশি আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়, সেই আন্দোলনের নৈতিক চরিত্র, শত বিচ্যুতি সত্ত্বেও, গান্ধী এমন উঁচুতে স্থাপিত করতে সমর্থ হলেন, যার মূল্য এবং তাৎপর্য বিশ্বের শিক্ষিত-জনেরা এখনও হৃদয়ংগম করবার চেষ্টা করে চলেছেন।

কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি এ পর্যন্ত ঠিকই বুঝেছিলেন। একদিকে যেমন সরকারের কাছে দেশের লোকের জন্যে রাজনৈতিক অধিকারের দাবি জানানো প্রয়োজন ছিল, আরেক দিকে তেমনি আবার দেশের লোককেও শিক্ষায়-দীক্ষায়, আর্থিক সামর্থ্যে সক্ষম করে তুলবার কাজটাও ছিল জরুরি। আজ, আরেক শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে মনে হয়, বরং দ্বিতীয় প্রয়োজনের সাধনটাই দিল অধিকতর দুরূহ। দেশ-বাসীর রাজনৈতিক অধিকার ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, কর্তব্যবোধের তাগিদে হোক, শুভবুদ্ধির বশে হোক, আন্দোলনের চাপে পড়ে হোক, ব্রিটিশ সরকার ক্রমে-ক্রমে একটু-একটু করে বাড়িয়ে দিতে থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত সব অধিকারই ত্যাগ করে দেশ ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু তার সঙ্গে তাল রেখে, দেশের লোক যাতে সজ্ঞানে, দায়িত্ববোধসহকারে, দেশ-শাসনে যথার্থ অংশীদার হতে পারে, তার জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং আর্থিক সামর্থ্য তাদের মধ্যে প্রসারিত করে দেবার দায় পালন করা হয় নি। পরাধীন দেশে অবশ্য সে দায় পুরোপুরি পালন করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু যতটা করা যেত, তার দিকেও যথেষ্ট মনোযোগ তখন আমরা দিই নি।

অথচ, শুধু সেই প্রথম বোমবাই অধিবেশনেই নয়, পরে গান্ধীর নেতৃত্বেও, কংগ্রেসের কর্মসূচির মধ্যে বরাবরই শিক্ষার এবং আর্থিক উন্নতির প্রয়াসের একটা বড়ো রকমের স্থান ছিল। বিশেষ করে গান্ধী কখনোই দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতাটাকেই চরম এবং পরম লক্ষ্য বলে মনে করেন নি। তিনি যে 'স্বরাজ্য' চেয়েছিলেন তার রূপ ছিল সর্বাঙ্গীণ, রাজনীতি ছিল তার একটা অংশমাত্র। এমন কি, যে 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলন আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে বিশ্ববাসী জেনে এসেছে, তারও লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে, যদিও পরাধীনতা-মোচন সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার একটা ধাপ তো অবশ্যই ছিল। কিন্তু সেটাই সব নয়। তাঁর দৃষ্টিতে সমগ্র জাতির, এমন কি সমগ্র মানবজাতির আর্থিক, সামাজিক, আত্মিক উন্নয়নের অমোঘ অস্ত্র ছিল সত্যাগ্রহ। সমাজের দরিদ্রতম অংশের সর্ববিধ দুর্গতি মোচন করে, আত্মমর্যাদায়, আত্মবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত করবার সংকল্প এবং কার্যকর কর্ম-পন্থা তাতে বিধৃত ছিল। তাঁর চোখে চরকা ছিল তারই প্রতীক শুধু নয়, অমূল্য সহায়ক। স্বরাজ বলতে আমরা সাধারণত বুঝেছি বৈদেশিক শাসনের অবসান, গান্ধী বুঝেছিলেন তার চেয়েও কিছু বেশি। তিনি বুঝেছিলেন আত্ম-শক্তিতে সেই আস্থা যা মানুষকে দাসত্ব থেকে, পরনির্ভরতা থেকে মুক্তি দেয়। বালগঙ্গাধর টিলক যখন ঘোষণা করলেন, "স্বাধীনতায় আমাদের জন্মগত অধিকার", তখন তাঁর সেই বজ্র-নির্ঘোষ সারা দেশে প্রতিধ্বনিত হল। নেহরু যখন, "আমাদের কাছে স্বাধীন-তার অর্থ, ব্রিটিশ আধিপত্য এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি," তখন দেশবাসীর চিত্ত উদ্বেলিত হল। আবার গান্ধীই যখন তিতবিরক্ত হয়ে বললেন, "ঈশ্বরের হাতেই হোক, কিংবা শয়তানের হাতেই হোক, আমাদের ছেড়ে দিয়ে চলে যাও", তখন স্বাধীনতার জন্যে দেশবাসীর অধীরতা ধ্বনিত হল তাঁর কণ্ঠে। কিন্তু তখনও বোধহয় কারও ধারণায় ছিল না, সত্যিই, স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ শাসন, ভগবানের হাতে, কিংবা শয়তানের হাতে আমাদের ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। যখন গেল, দেখলাম কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ১৮৮৫ সালে এবং গান্ধী তার পরে বহুবার যার কথা বলেছেন, দেশবাসীকে নানা দিক থেকে দেশ-শাসনে সার্থক অংশগ্রহণের উপযুক্ত করে তোলা, তার অনেকটাই বাকি থেকে গেছে।

অথচ, সেটাও ছিল কংগ্রেসের একটা প্রাথমিক কর্তব্য। সে কর্তব্য কোনো-কালেই যে পালনের কোনো চেষ্টা কংগ্রেস করে নি, তা নয়। দেশের আর্থিক উন্নয়নের ছক কংগ্রেস তৈরি করেছে, অস্পৃশ্যতা দূর করার কাজ-কে, প্রধানত গান্ধীর অনুপ্রেরণা যেখানে-যেখানে প্রবল ছিল, সেখানে-সেখানে সমধিক গুরুত্ব দিয়েছে; আর্থিক স্বনির্ভরতা প্রতিষ্ঠার তাগিদে বিদেশী বর্জনের আন্দোলন করেছে; চরকার, গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়নে সচেষ্ট হয়েছে, জাতীয় ঐক্যের একটা লক্ষ্য চোখের সামনে রেখেছে। এ সবই কংগ্রেস করেছে, কখনও বেশি কখনও কম জোর দিয়ে। কোথাও বেশি, কোথাও কম জোর দিয়ে। বস্তুত, এসব কাজ যতটুকু এদেশে হয়েছে, প্রধানত কংগ্রেসই করেছে। সাফল্য যতটা, কংগ্রেসের; ব্যর্থতা যতটা তাও কংগ্রেসেরই। তবু বলা যায়, স্বাধীনতা-লাভের পর দেশ বুঝল, ঐক্যসাধনায়, আর্থিক উন্নয়নপ্রচেষ্টার সংগঠনে, শিক্ষার প্রসারে, বহুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে—এখনও যেখানে হাত পড়ে নি।

জাতীয় ঐক্য এবং সংহতির কথাই প্রথমে ধরা যাক। স্বাধীনতা-আন্দো-লনের উন্মাদনার সময়ে সেই একসূত্রে গ্রথিত হয়েছিল সারা দেশের মন, আবার স্বাধীনতার প্রভাতেও অখণ্ড-জাতীয়তাবোধের একটা জোয়ার আমরা দেখেছি, সাম্প্রদায়িক হানাহানির ওপরেও যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু, স্বাধীনতা যখন সুপ্রতিষ্ঠিত, কোনো বহিঃশত্রুর আক্রমণ যখন আসন্ন বলে মনে হয় না, তখন দেশের ঐক্য বিপন্ন হতে পারে নানা অভ্যন্তরীণ সংঘাতের দ্বারা, যদি তার পেছনে থাকে প্রকৃত বিচ্ছিন্নতাবোধ। এখনও যে থেকে-থেকে জাতীয় ঐক্য সম্পর্কে আশঙ্কা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, তার কারণ স্বাধীনতা-আন্দোলন সফল হবার পরেও জাতীয় ঐক্যবোধ অক্ষুণ্ণ থাকে, স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবন-যাপনের মধ্যে যাকে এমনভাবে প্রোথিত করতে হয়, যাতে বিনাবাক্য-ব্যয়ে, একরকম নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তাকে আমরা অবিসংবাদিত সত্য বলে মেনে নিই, তেমন ঐক্যবোধ আমাদের মধ্যে জন্মায় নি। যাতে সেই সহজ স্বাভাবিক ঐক্যবোধ জন্মায়, যার মধ্যে কোনো ক্ষণিক উন্মাদনা নেই, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সে বিষয়ে কি যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত ছিল? যখন সময় ছিল, যখন কংগ্রেস সারা দেশে ছড়িয়ে ছিল, ছড়িয়ে ছিল দেশের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, তখন যদি এ বিষয়ে তার যথেষ্ট মনোযোগ থাকত, যদি নিজের পেছনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পেয়েই সন্তুষ্ট না হয়ে সে অনুসন্ধান করত, যখন গান্ধী থাকবেন না, নেহরু থাকবেন না, এমনকি ইন্দিরা গান্ধীও থাকবেন না, তখনও ভারত এক থাকবে কিসের জোরে, তা হলে এই অনৈক্যের ভয় আমাদের তাড়া করে ফিরত না। ব্রিটিশ শাসন যে ঐক্য এদেশে স্থাপন করেছিল, আজ স্বাধীন ভারতে তা সংকটাপন্ন বলে থেকে-থেকে মনে হত না।

তেমনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির যে চেষ্টা স্বাধীনতার পর থেকে দেখছি, তা লক্ষ-লক্ষ গ্রামে কোটি-কোটি গ্রামবাসীর পক্ষেও অধিকতর অর্থবহ হয়ে উঠত, যদি গ্রামীণ অর্থ-নীতির যে কাঠামোটার কথা কংগ্রেস বিচ্ছিন্নভাবে কখনও-কখনও চিন্তা করেছে, এবং গান্ধী যার ওপরে সর্বা-ধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন, সত্যি করে তার দিকে কংগ্রেস সমানে মনোযোগ দিয়ে আসত, যদি সমানে সেটাকে দৃঢ় করা, কর্মক্ষম করার দায়িত্ব তার অগণিত কর্মীর একটা বৃহৎ অংশের ওপর দিত। কংগ্রেস তা তো করেই নি, বরং শহর-কেন্দ্রিক রাজনীতির দিকেই, নির্বাচনের রাজনীতির দিকেই ক্রমে বেশি করে ঝুঁকেছে। পশ্চিমবঙ্গে অন্তত দেখেছি, কংগ্রেস তার ফল এখন টের পাচ্ছে। অন্য কথা ছেড়েই দিন, তার নির্বাচনী সাফল্যেরও পথে এখন এক দুস্তর বাধা এ রাজ্যের গ্রামাঞ্চল।

এমনিভাবে জাতিগঠনের, সমাজ-গঠনের যে বিরাট এবং গুরুভার দায়িত্ব একদিন গান্ধীজীর অনু-প্রেরণায় কংগ্রেস নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল, তাকে অবহেলা করে নির্বাচনসর্বস্ব রাজনীতি কংগ্রেস যে-দিন থেকে আঁকড়ে ধরেছে, বস্তুত তার অবক্ষয় সেদিন থেকেই শুরু। এ অবক্ষয় আরম্ভ হয় স্বাধীনতার আগেই, এখন তার একটা চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখছি।

মনে রাখা দরকার, স্বাধীনতা-সংগ্রামের রাজনীতি এক, আর দেশ-শাসনের রাজনীতি সম্পূর্ণ আলাদা। যে আত্মত্যাগ, যে দুঃখবরণ স্বাধী-নতা-সংগ্রামের জন্য প্রয়োজন, স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে তার অবকাশ নেই বললেই চলে। কাজেই স্বাধীনতা-পূর্বের কংগ্রেসের সঙ্গে এখনকার কংগ্রেসকে মিলিয়ে দেখে কোথায় তার ঘাটতি সে হিসেব করতে যাওয়া ভুল, রাজীব গান্ধী যে কংগ্রে-সের সভাপতি, তার কর্তব্য দেশের লোককে সার্থকতর, পূর্ণতর জীবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে নেতৃত্ব দেওয়া। সে কর্তব্য সে সমাধা করতে পারবে কিনা সেই-টাই এখন জাতীয় জীবনের পক্ষে অতি গুরুতর প্রশ্ন। আগেকার কংগ্রেস কী রকম ছিল, তা নিয়ে হা-হুতাশ এখন নিরর্থক। এখনকার কংগ্রেসকে এখনকার কাজের উপযুক্ত হতে হবে।

বললাম বটে এখনকার কংগ্রেস আর পরাধীন ভারতের কংগ্রেসের চরিত্র এবং কর্তব্যের মধ্যে আমূল পার্থক্য থাকবে, এইটাই স্বাভাবিক এবং এইটাই উচিত —কিন্তু এক জায়গায় মিল থাকা দর-কার। জনসাধারণকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব তারও ছিল, এরও থাকবে। এবং সে নেতৃত্ব একমাত্র তেমন কংগ্রেস-কর্মীই দিতে পারবেন যাঁর প্রতি লোকের শ্রদ্ধা আর আস্থা থাকবে। এখনকার কংগ্রেসের মধ্যে যেসব অনু-পযুক্ত, যেসব স্বার্থান্বেষী লোক ঢুকে পড়েছে, রাজীব গান্ধী অতি তীব্র ভাষায় তাঁদের নিন্দে করেছেন। আসলে, এইরকম একটা ধারণা এখনও দেশে ব্যাপক যে যেহেতু রাজনীতি করে জেলে কিংবা ফাঁসিতে কিংবা দ্বীপা-ন্তরে যাবার এখন আর প্রয়োজন নেই, অতএব রাজনীতি আগে যা ছিল এখন ঠিক তার বিপরীত মেরুতে পৌঁছে গেছে অর্থাৎ এখন সময় এসেছে রাজ-নীতির সাহায্যে যাবতীয় অপকর্ম সাধনের। এই ধারণা যদি কংগ্রেসের সভাপতি দূর করতে পারেন, তা হলে এখনও কংগ্রেস দেশে একটা মূল্যবান ভূমিকা পালন করতে পারবে।

কিন্তু রাজীব গান্ধী সম্পর্কে এখনও লোকের সন্দেহ যায় নি। তাঁর দ্বারা কি সম্ভব হবে, দেশের মানুষের ধুলোমাটির জীবনের মাঝখানে নেমে এসে, তার জগতের বাস্তবতাকে নিজের জীবনের, চিন্তাধারার বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া? তা যদি তিনি পারেন, বলা যায় না, ১৯৮৫-র কংগ্রেস হয়তো উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা নতুন করে শুরু করতেও পারে। কেন-না, যদিও তিনি একজনমাত্র মানুষ, কখনও-কখনও একজন মানুষই, কী এক অনৈসর্গিক রসায়নে, লক্ষ মানুষের চিত্তে রূপান্তর আনতে পারেন। পরিত্রাতা হিসেবে নয়, প্রেরণার উৎস হিসেবে।

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সিনেমা

এ কোন ভারতবর্ষ ?

ডেভিড লীনের 'এ প্যাসেজ টু ইনডিয়া

কয়েক দশক আগে হলিউডের 'হেলেন অব ট্রয়'-এর পেছনে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল তার এক ফিরিস্তি দিয়ে শ্বেতদ্বীপের 'পাঞ্চ' পত্রিকা মন্তব্য করেছিল, কিন্তু পুড়িয়ে লাভ কী হল! সদ্যঃপ্রদর্শিত 'এ প্যাসেজ টু ইনডিয়া' নিয়ে ঈদৃশ মন্তব্য হয়তো কেউ করবে না, কিন্তু করবার কারণ কি আদৌ নেই? ওই অবাধ চিত্রোৎ-ক্ষেপ ও চিত্রারোপ, বিপুল বর্ণবৈভব, অমন দুর্দম অভিনয়, ওই অভিজ্ঞ কর্তনকর্ম--কিন্তু সব মিলিয়ে? মাঝে-মাঝে হাস্যোদ্রেকী এক অতিনাটক যার বিভাবে-অনুভাবে-ব্যভিচারীতে কোনো

সাম্য নেই। যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ-গোছের এক উচ্চাবচ সারল্যমাত্রই যদি তার অভিপ্রেত হত, তাহলেও কথা ছিল, অন্তত দু-হাত ভরে তালি বাজানো যেত। অথচ ইনিই সেই ডেভিড লীন যিনি 'লরেনস অব এরেবিয়া'-র বিস্তার রচনা করেছিলেন (নাকি তাতেও কীট ছিল, তখন চোখে পড়ে নি), যাঁর 'ডকটর শিভাগো' একদা অনেককেই মুগ্ধ করেছিল (বুদ্ধদেব বসুর মতো চলচ্চিত্রবিমুখ ব্যক্তিও শুনেছি এক ফ্লাস্ক চা সম্বল করেই সানন্দে এর দৈর্ঘ্য অতিক্রম করেছিলেন)। তাহলে কি ফর্স্টারের চলচ্চিত্রায়ণে গোলমাল, অর্থাৎ ডেভিড লীন অকৃতকার্য তাঁর ফর্স্টারচ্যুতির জন্যেই? উপন্যাস থেকে যে চলচ্চিত্র সম্ভব এবং উত্তম চলচ্চিত্র সম্ভব, তার ঢের প্রমাণ আছে এবং তার জন্যে আর নতুন করে অনুপুঙ্খের দোহাই পেড়ে আইজেনস্টাইনের দ্বারস্থ হতে হবে না। কোনো-কোনো স্থলে ডেভিড লীন ফর্স্টার থেকে ঈষৎ সরে এসেছেন, তবে তাতে তেমন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নি। কিন্তু যেখানে কেবল সরে আসেন নি, রীতিমতো অবলেপন ঘটিয়েছেন তা হল অ্যাডেলার যৌন অভীপ্সার ক্ষেত্র। বইতে যা ছিল রনির সঙ্গে নবাব বাহাদুরের মোটরগাড়ি চড়তে-চড়তে অন্ধকারে জন্তুদর্শন এবং তজ্জনিত ধাক্কা, তাই সম্ভবত চলচ্চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে একা-একা সাইকেল্ চড়ে শহর সন্নিহিত জঙ্গলে তার ভগ্নমন্দির আবিষ্কার ও মন্দিরগাত্রে মিথুনমূর্তি দেখে আত্মগত উচ্ছ্বাস এবং মন্দিরবাসী বাঁদরদের আক্রমণে রুদ্ধশ্বাস পলায়ন। গুহার দৃশ্যে তাই আজিজকে যখন তার বিবাহিত জীবন নিয়ে প্রশ্ন করে অ্যাডেলা তখন তা স্পষ্ট যৌন মাত্রা নেয়, যদিও তাতে আজিজের হঠাৎ সরে-যাওয়াটা কিঞ্চিৎ রহস্যাবৃত থেকে যায়। বইতে আজিজ সরে যায় অ্যাডেলার প্রশ্নের (ক-টা বিয়ে আজিজের) অবিচারে বিক্ষুব্ধ হয়ে। সেই বিক্ষোভ চলচ্চিত্রে প্রকাশ পায় নি, সাধারণভাবেই ইংরেজদের সঙ্গে তার সম্পর্কে যে আজিজের মনে কোনো বিক্ষোভ থাকতে পারে তা প্রকাশ পায় নি। বইতে আজিজ চলচ্চিত্রের মতো অতিসরল নয়: একমাত্র মিসেস মোর বিষয়েই তার শ্রদ্ধা-ভালোবাসা অবিমিশ্র, এমনকি ফীলডিংকে নিয়েও তার দ্বিধা আছে। ফলে, বইতে যখন আজিজ অ্যাডলার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের কথা বলে, তা চলচ্চিত্রের মতো অত তীব্র হয়ে বাজে না। চলচ্চিত্রে আজিজকে মনে হয় নিতান্তই এক শিশু যে হঠাৎ খেপে উঠেছে। এবং গোড়কেলে তার পাশে এক নিতান্ত প্রৌঢ় যার স্থৈর্য হয়ে ওঠে স্থবিরতার হাস্যকর নামান্তর। যেন ভারতীয়মাত্রেরই এক দ্বিমাত্রিকতা, এ এক কাগুজে চরিত্র, তার নেই কোনো জটিলতা, কোনো মানসবিপ্লব; যেন ভারতীয়মাত্রেই এক স্থির চিত্র, তার আছে কেবল ভূগোল, কেবল অতীত। এমনকি আজিজের বিচারের সময় আদালতের বাইরে যে-বিক্ষোভ, বইতে তার সঙ্গে সদ্যসমাপ্ত মহরমের মিছিলের যে-যোগ ব্যঞ্জিত হয়েছে, চলচ্চিত্রে তা অনুপস্থিত। ফলে বিক্ষোভ রূপ নিয়েছে এক স্বতঃস্ফূর্তির যা সম্ভব কেবল রূপকথায়। ডেভিড লীনের ভারতবর্ষ এক রূপকথা, অবাস্তব, আজগুবি (একেই কি খুঁজে বেড়ায় 'ভ্রমণ'-নামক এক আধুনিক বাসনার্ত পরিব্রাজকেরা?) একমাত্র বিশেষণীয় বিশেষণ যা ডেভিড লীনের ভারতবর্ষ বিষয়ে প্রযোজ্য, তা 'অতি'।

তুলনায় ডেভিড লীনের ইংরেজরা কেমন বাস্তব। ফর্স্টার যাকে ইঙ্গ-ভারত বলেছেন সেই ভারতপ্রবাসী ইংরেজ শাসককুলকে ইংরেজ গৌরব-রবি অস্তমিত হবার আটত্রিশ বছর পরেও ডেভিড লীন ঠিকই ধরতে পেরেছেন, ফর্স্টার যেমন তেমনি অহংকারী, উদ্ধত যদিও আইনভক্ত, ভারত বিষয়ে শুচিবায়ুগ্রস্ত তবু ভারতে নিজেদের উপস্থিতি সম্পর্কে ষোলো আনা সচেতন, বর্ণবিদ্বেষী, গোষ্ঠীপ্রিয়। ব্যতিক্রম যে-দুএকজন তাদের বেলাও ডেভিড লীন ফর্স্টারের অনুবর্তী, বাস্তবতায় ঘাটতি নেই তাদের ক্ষেত্রেও। ডেভিড লীনের রনি যেমন বিশ্বাসযোগ্য তেমনি বিশ্বাসযোগ্য তাঁর ফীলডিংও, সেই উদারনীতিতে রোমানটিকতার আঁচড় বিন্দুমাত্র লাগে নি। কেবল তাঁর পরদা একটু পুরু বলে ফর্স্টারকথিত উদারনীতির কোনো সূক্ষ্মতা ঠিক পুরোপুরি তাতে ফুটে ওঠে নি। মিসেস মোরের বিদায়ও, তার অলংকারবাহুল্য সত্ত্বেও, সলিলসমাধিতে আমরা যতটা আন্দোলিত হই, ততটা হই না চলচ্চিত্রের মুখ্য ঘটনা, আজিজের গ্রেপ্তার ও বিচারের দৃশ্যাবলীতে। আজিজের প্রথম ফীলডিং-এর গৃহে আগমনের তুলনায় ফীলডিং-এর প্রথম আজিজের গৃহে আগমন বেশি বিশ্বাসযোগ্য। মারাবারগামী রেলগাড়ির পাদানিতে আজিজের আবেগরুদ্ধ ছুটোছুটিটির পাশে মিসেস মোর ও অ্যাডেলার মৃদুভাষ উৎকণ্ঠা অধিক মনোরম। ক্লাবের দৃশ্য খুবই পরিচ্ছন্ন, এমনকি ফীলডিং-এর পদত্যাগেও কোনো অতিনাটকীয়তা নেই। নেই তাদের সমবেত বিষাদেও যখন অ্যাডেলার জবানবন্দিতে আজিজের বিরুদ্ধে তার নিজেরই আনীত অভিযোগ প্রত্যাহৃত হল।

উদাহরণ আরো বাড়ানো যায়, কিন্তু 'এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া' নাম্নী চলচ্চিত্রে যে ভারতের তুলনায় ইঙ্গ-ভারতই অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্যভাবে চিত্রিত হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অথচ ভারতের সংস্থাপনা বিপুল, আর যত গোলমাল সেখানেই। চলচ্চিত্রটি যদি ভারতবর্ষে না দেখানো হত, তাহলে হয়তো আমাদের বলবার কিছু থাকত না—ডেভিড লীনেরা আমাদের নিয়ে কী দেখালেন না দেখালেন হাতে কী এসে যায় আমাদের! চলচ্চিত্রটি প্রতীচ্য ভূখণ্ডে প্রশংসা পেলেও আমাদের করণীয় কিছু নেই, কেবল যাবতীয় ভারত-উৎসবের সার্থকতা বিষয়ে ঈষৎ সন্দেহ পোষণ করতে পারি। ফর্স্টার বই লিখেছিলেন ১৯২৪-এ, তাতে কিছু-কিছু সরলীকরণ ঘটে থাকলেও ১৯৮৫-তে কেন তার পুনরাবৃত্তি হবে—আর খালি পুনরাবৃত্তিই তো নয়, পরিবর্ধনও? ১৯২৪-এর দর্শকদের জন্যে তো তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন নি ডেভিড লীন, করেছেন ১৯৮৫-র দর্শকদের জন্যে—তাহলে? প্রাচী প্রাচী, প্রতীচী প্রতীচী, আর এ-দুয়ের মিলন কদাচ সম্ভব নয়—এই সিদ্ধান্তই কি নতুন করে করব আমরা?

ফর্স্টারের উপন্যাস বহুলপ্রচারিত, কিন্তু সেই প্রচার তার সিদ্ধির জন্যে ততটা নয় যতটা তার ভাবনাহেতু। আর তার ভাবনা কেবল ইঙ্গ-ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-ভাবনা নয়, সেই সূত্র ধরে যুক্তি ও আবেগের দ্বৈতাদ্বৈত নির্ণয়। কেবল ইঙ্গ-ভারতীয় মানস নয়, ভারতীয় ও ইঙ্গ মানসও উপলব্ধির চেষ্টা করেছেন ফর্স্টার। সন্দেহ নেই যে ইঙ্গ মানস, অন্তত প্রথম মহাযুদ্ধপরবর্তী ইঙ্গ মানস, তির্যগভাবে হলেও খানিকটা ধরা পড়েছে ফর্স্টারের দৃষ্টিতে—অ্যাডেলার সহৃদয়, অব্যবস্থিততা ও সত্যমাননা এবং ফীলডিং-এর নিরপেক্ষ যদিও অসীম ঔদার্য তার সাক্ষ্য। এবং সন্দেহ নেই যে ভারতীয় মানস ফর্স্টার পুরোপুরি বুঝতে পারেন নি। অন্তত তাঁর ঝোঁক ছিল প্রতীকিতার দিকে, ফলে ভারতীয় হিন্দুকে তিনি দেখেছেন তার ধ্রুপদী সত্তায় গোড়পেলের ভেতর এবং ভারতীয় মুসলমান তার সর্বৈব রোমানটিকতায় আজিজের মধ্যে। উপন্যাসের খণ্ডবিভাজনেও এই প্রতীকিতা প্রতিফলিত হয়েছে, 'গুহা'র এক প্রান্তে 'মসজিদ', অন্য প্রান্তে 'মন্দির'। অবশ্য দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখেন নি ফর্স্টার; ভাগ্যিস রাখেন নি, নইলে অন্তত আজিজের মধ্যে যেটুকু রক্তমাংস পাওয়া গেছে তাও পাওয়া যেত না। তাঁর গোড়কেলে প্রায় ডেভিড লীনের গোড়কেলের মতোই দ্বিমাত্রিক, যদিও 'মন্দির'গর্ভে তার ঈষৎ বিস্তার আছে ডেভিড লীনে নেই। জন্মাষ্টমী উপন্যাসে নিতান্তই প্রতীক, কিন্তু বৃদ্ধ রাজার গোপন মৃত্যুসংবাদে তাতেও এক মাত্রা এসেছে যা ডেভিড লীনে ভাবা দুষ্কর। তা ছাড়া ওই মিছিল, দেবতার জন্মসূচক ওই ঘণ্টাধ্বনি এবং ওই তিথিসিক্ত বারিধারা—সবটাই এক পশ্চাৎপটও বটে যাতে আজিজ আর ফীলডিং-এর পুনর্মিলন হচ্ছে সংঘটিত, গোড়কেলের প্রাথমিক দৌত্যে। ডেভিড লীনে এই পুনর্মিলনের কোনো সাহিত্যিক পশ্চাৎপট নেই, আছে কেবল মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, যেন ভূস্বর্গ। এবং যে-বিদায় ফর্স্টারে অন্তরঙ্গ তা এখানে অতিনাটকীয়। আসলে যে-মৃদু শ্লেষের ছোঁয়ায় ফর্স্টারের ভারতদর্শন সহনীয় হয়ে উঠেছে, ডেভিড লীনে তার আভাসও নেই। ফলে চলচ্চিত্রটি কোনো অনুরণন রেখে যায় না আমাদের মনে। দুই বন্ধুর যে কোনো স্থায়ী সম্পর্ক হতে গিয়েও হতে পারল না তার জন্যে কোনো বেদনাও জাগে না। বরং অ্যাডেলাকে নিয়ে কিঞ্চিৎ রোমাঞ্চ থেকে যায়। অথচ সে-রোমাঞ্চ নেই, রোমাঞ্চ একটু যা আছে তা মিসেস মোরের ছেলে রাল্‌ফ্‌কে নিয়ে।

ধরে নেওয়া যায় ডেভিড লীন ভারতবর্ষে আগ্রহী (নিশ্চয়ই আগ্রহী, নইলে 'এ প্যাসেজ টু ইনডিয়া' করবেন কেন?)। ধরে নেওয়া যাক ইঙ্গ-ভারত নিয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনও করেছেন ডেভিড লীন (ঘষা কাচের অন্তরালে ফীলডিং-এর স্নান অবশ্য কষ্টকল্পনা)। ধরে নেওয়া যাক অভিনিবেশেরও ঘাটতি ছিল না তাঁর এবং মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই নির্মাণ করেছেন চলচ্চিত্রটি। ধরে নেওয়া যাক অভিনেতৃবৃন্দ সর্বতোভাবে তাঁরই মানসরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন (আজিজের অতিসারল্য কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ভাঁড়ামির পর্যায়ে পৌঁছে গেলেও)। কিন্তু ডেভিড লীন যা করেন নি, এবং একমাত্র যা করলে তাঁর চলচ্চিত্রটি উদ্ধার পেত, তা হল ভারতবর্ষকে একটু ভেতর থেকে দেখা। প্রতীচী বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা যেমন প্রতীচীর অঙ্গননির্ভর, তেমনি প্রাচী বিষয়ে প্রতীচীর অভিজ্ঞতাও প্রাচীর অঙ্গননির্ভর। বাইরে থেকে লক্ষ মোমের আলো জ্বেলেও প্রাচীকে দেখা যায় না। প্রাচী প্রাচী, প্রতীচী প্রতীচী এবং প্রাচী-প্রতীচী অসেতুসম্ভব—এ-কথা যে পুরো সত্য নয়, তার প্রমাণ আমাদের দু শো বছরের ঘৃণার-ভালোবাসার ইতিহাস, তার প্রমাণ কোনো-কোনো ডেভিড হেয়ার, কোনো-কোনো দীনবন্ধু এন্ড্রুজ, সেইসব ভারতপথিক যাঁরা এখনো নির্বংশ হন নি। সেই ইতিহাসে অস্পৃষ্ট থেকে, মনে-মনেও দশ হাজার মাইল বসে কী করে ডেভিড লীন 'ভারতপথে'র ছবি তুললেন? চলচ্চিত্র 'এ প্যাসেজ টু ইনডিয়া' এক উজ্জ্বল পণ্ডশ্রম।

অমিয় দেব

চিত্রকলা

আমাদের সমকালীন চিত্রীরা

১৯৬০ সালের মে মাসে বোমবাইয়ের জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারি'তে যে 'সোসাইটি অব কনটেমপোরারি আর্টিস্ট' দলের জন্ম হয়েছিল, দেখতে-দেখতে তার পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়ে গেল। পঁচিশ বছরের পুরোনো এই-সমস্ত শিল্পীদের অধিকাংশই এখন সুপ্রতিষ্ঠিত এবং স্বীকৃত। কলকাতা আর বোমবাই—এই দুই প্রধান মেট্রোপলিটন শহরকে কেন্দ্র করে আধুনিক চিত্রশিল্পের একটা বেশ বড়ো রকমের অভিক্ষেপ ঘটিয়েছিলেন এ'রা। তবে প্রত্যক্ষ-প্রভাবিত কোনো প্রতীচী ভাবধারা, বা প্রাগাধুনিক পর্বের ভারতীয় শিল্পের পরম্পরাগত ঐতিহ্যকেই অনুসরণ বা অনুকরণের মাত্রেক পন্থা হিসেবে তাঁরা গণ্য করেন নি। বরঞ্চ প্রতি শিল্পীই তৎকালীনতা এবং সমকালীনতার বাস্তব চেহারাটাকে ধরবার একটা প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করেছিলেন। ফলত, কাউকে দৃষ্টির কুয়াশা ভেদ করে স্বচ্ছ অনাবৃত চোখে তাকাতে হয়েছিল, কাউকে-বা ভাবে-ভঙ্গিতে তির্যকতা আর বক্রতা আরোপ করে বোঝাতে হয়েছিল জীবনের দুরূহ সমস্যার জটিল অমীমাংসিত রূপ, কারোর কাছে যন্ত্রণার চেহারা এত নগ্ন যে তার রূপায়ণে রূঢ় লক্ষণ হয়ে উঠেছিল অপরিত্যাজ্য, কারোর কাছে আবার ফর্ম-এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যবহার অপরিহার্য শর্ত মনে হয়েছিল। যাই হোক, মোটের ওপর 'সোসাইটি অব কনটেমপোরারি'র শিল্পীদল শিল্পে এক অভিনব এবং স্বতন্ত্র মাত্রাযোজনায় সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদেরই পঁচিশ বছরের আয়ুষ্কালকে অভিনন্দন জানিয়ে বিড়লা অ্যাকাদেমি চিত্রোন্মুখ দর্শকদের কাছে উন্মোচিত করে দিয়েছিলেন ছাব্বিশ জন শিল্পীর পূর্বাপর অন্তত দেড়শোটি ছবি আর ভাস্কর্যের অ্যালবাম। বিশ-বাইশ-পঁচিশ বছর আগে তাঁদের বুদ্ধিচর্চা যেমন ছিল রুগ্ণ সময়ের পরিপ্রেক্ষণায়, যুগের ক্রমবিভঙ্গে বর্তমানে তা আরও বেশি অন্তর্ঘাতে ক্লিষ্ট, অসহায়।'

পুরোনো তিনটি গ্রাফিক-এর পাশাপাশি লালুপ্রসাদ শাহুর সাম্প্রতিক কালের তিনটি টেমপেরা 'প্রন', 'ইকোলজি', 'ইন দ্য নেসট' জীববিদ্যায় শিল্পীর অধিকারের অঙ্গীকার। বায়োলজি বইয়ের রঙিন ছবির মতো অথবা ল্যাবরেটরির চার্টের মতো স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন।

মানু পারেখ তাঁর ছবির নির্ধারিত শিরোনাম পূর্বেও রাখতেন না, বর্তমানেও রাখেন নি। লাল কালো প্রভৃতি গাঢ় রঙের ব্যবহার এবং অল্পবিস্তর কিউবিক প্রক্ষেপ জৈবনিক ব্যঞ্জনাকে ধরেছেন বিমূর্ত ভঙ্গিতে।

শ্যামল দত্ত রায়ের জলরঙ-এ আঁকা 'থিংকার', 'লাভ', 'কারনেজ' মাধ্যমের দিক দিয়ে স্বাতন্ত্র্য পেয়েছে; দৃষ্টিভঙ্গি বা শৈলীর বিশেষ কোনো তারতম্য তিনি ঘটান নি।

জীব এবং মানুষকে একসারিতে বসিয়ে আপেক্ষিকতার ভঙ্গিতে কাজ করেছেন আদিত্য বসাক মিশ্রমাধ্যমে। বহুদিন থেকেই রাজহাঁস তাঁর প্রিয়তর অনুষঙ্গ। 'কনসিলিং', 'লেইং এবং 'কালেকটিং'—তিনটি নির্মাণে এবারেও তাঁর বক্তব্য পূর্বানুরূপ।

এচিঙ-এ অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রিদম অব লাইফ', 'বডি অ্যানড সোল' বেশ পরিণত কাজ। জলরঙ দিয়ে গণেশ হালুই এঁকেছেন 'দ্য ডারক পনড', 'লোয়ার ক্লাউড', 'প্লানট উইথ এডিবল রুটস'। আঙ্গিকের দিক থেকে এগুলি পূর্ববৎ। শিল্পীর বক্তব্যও জটিলতার আবেষ্টনে দূরসম্পর্কিত নয়। তাৎক্ষণিক দৃশ্যের মরমি অভিঘাতই এর নিহিত দর্শনের জন্মের উৎস।

ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্তের টেমপেরাত্রয়ের নরনারীদের ব্যবহার স্বাভাবিকের চেয়ে তীব্র। গড়নের গোলাকার পেলবতা যামিনী-রায়-সুলভ। কলকাতার কোনো এক কালের বাবুসমাজের প্রতিনিধিত্ব করে এই ছবিগুলির মধ্যকার আবহাওয়া।

গণেশ পাইনের ছবির নিজস্ব নাগরিক বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে আমদের পরিচয় নতুন নয়। টেমপেরায় 'দ্য পিচার', 'নাইট অব দ্য মারচেনট', 'ম্যান অ্যানড দ্য হার্ট' দেখামাত্র স্রষ্টাকে চিনে নিতে ভুল হয় না।

সুনীল দাসের ছবির যে বৈশিষ্ট্য তাঁকে পৃথক করে, তা হল, প্রথমত ব্যাপ্ত ক্যানভাস, প্রধানত সাদা বা অন্য কোনো ফিকে রঙ, ক্যানভাসের শূন্যস্থানে সুতীক্ষ্ম জ্যামিতিক রেখার বিন্যাস এবং আকস্মিক বর্ণসংযোজনা। সবগুলিই তিনি বজায় রেখেছেন এবারেও। সুযোগসন্ধানী তৎপর বিচারক নিরীহ বালককে আসামির কাঠগড়ায় অভিযুক্ত করছে, সবজানতা অথচ মূঢ় নির্বোধ বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে গণিতের খাতায় রমণীর সিঁদুর মুছে যাওয়ার ভাগ্য নির্ধারিত হয়।

এবং সবশেষে যে শিল্পী দর্শকদের অনর্গল উচ্ছ্বসিত প্রশংসাকে নিঃশেষে অপহরণ করে নেন তিনি বিকাশ ভট্টাচার্য। সবেমাত্র স্তনোদ্গম শুরু হয়েছে, এমন এক নাবালিকা দর্পণে তার অনাবৃত দেহের নতুন উৎসব দর্শনমাত্র বিমুগ্ধ বিস্মিত। নারীত্বের প্রথম সচেতনতার ভীতিমিশ্রিত লজ্জার অভিব্যক্তি তাকে আলিঙ্গন করে। 'অ্যাট নাইট' ছবিতে এক নারীর লণ্ঠনের আলোয় দেদীপ্যমান মুখে খরতাপ ইন্দ্রিয়ের চঞ্চল বাসনা উত্তেজনার ঘামে প্রশমিত। 'অ্যাট মরনিঙ' ছবিতে নারীদলভুক্ত হবার পর তার সুখস্বপ্নে মাতৃত্বের দোলায়মান ছায়া, পাশে শায়িত পুরুষ নির্বিকার, সৃষ্টিবিমুখ প্রগাঢ় ঘুমে মৃতমমি। তার স্মৃতিতে অতীত স্বপ্নের কণিকাসৌরভও যেন অবশিষ্ট নেই। বিকাশ নারীকে পৃথক মর্যাদা দেন বলেই ছবির বিষয়বস্তু করেন—এ প্রমাণ আমরা ইতঃপূর্বেও পেয়েছি। কৃত্রিম সভ্যতার অভিসম্পাতে সমাজে নারী যত স্বস্থানচ্যুত, বিকাশের ছবির জগৎ যেন ততই তাকে সম্ভ্রমদানে উদ্‌গ্রীব, তার পুনরভিষেকে আগ্রহী। আরও গভীরতর হোক তাঁর অনুভব। আরও স্ফীত হোক তাঁর সামর্থ্য। আরও উজ্জ্বল হোক কনটেমপোরারি আর্টিস্ট দলের আগামী পঁচিশ বছর।

আত্মজৈবনিক চিত্রশালায় উইলিয়ম হগারথ

শিল্পভাষ্যকারেরা ইতালীয় রেনেসাঁ আর তারই অব্যবহিত প্রাক্-যুগের চিত্রকলার 'বারোক শিল্প' নামকরণ করেছিলেন। অবশ্য বারোক যুগে জাত সমস্ত শিল্পকীর্তিই যে বারোক শৈলীর অন্তর্গত ছিল—এমন নয়। বিভিন্ন আঞ্চলিক রীতিতে বিভিন্ন শিল্পীর হাতে সৃষ্টিখণ্ডগুলি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। আসলে, সমকালীন যুগটা এই কারণেই শিল্পের ইতিহাসে তাৎপর্যময় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যানড মহাজাগতিক চারচের ধারাবাহিক ঐতিহ্যের অন্ধ-উত্তরসূরিতা করছে—নির্বিবাদে, বিনাপ্রশ্নে সংশয়বিহীনভাবে অন্যান্য অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ য়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলিরই অনুরূপ। ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণের কাছেই নির্দ্বিধায় বিক্রীত হতে চলেছে, শিল্পীদের গুহ্যতম ব্যক্তিক কল্পনা। ফলে, নিছক ঐতিহাসিক বা কখনো পৌরাণিক বাতাবরণে শিল্পের প্রাক্-রাণিক বহুমুখিনতার বিচিত্র পরীক্ষাও বিঘ্নিত হচ্ছে। এইরকমই এক বিশূন্য দুর্লগ্নে—উইলিয়াম হগারথের য়োরোপীয় শিল্পকলার প্রাঙ্গণে আগমন শিল্পের এক নবোন্মোচিত দিগন্তের ঘোষণা। তিনি জানিয়েছিলেন—"মাই পিকচারস আর মাই স্টেজ, আনড মেন অ্যানড উইমেন আর মাই অ্যাকটরস"। তাঁর প্রতিশ্রুতি যে তিনি রক্ষা করেছিলেন, তা আমরা বুঝেছি শিল্পী হগারথের আত্মজৈবনিক চিত্রধারার একটি সংশ্লেষিত উপস্থাপনায়; যার আয়োজন করে ব্রিটিশ হাইকমিশন শিল্পরসিক ব্যক্তিদের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হয়েছেন।

১৬৯৭ সালে লনডনের স্মিথফিলডে যাঁর জন্ম হয়েছিল, সেই স্কুলশিক্ষকের পুত্র হগারথ নিতান্তই বৈশ্যিক প্রয়োজনে আঁকা কার্ডের ডিজাইনের মধ্যেই প্রথম নিজের শিল্পী-অন্তঃকরণের আত্মপ্রকাশ শুরু করেন। তাঁর এই নিতান্ত ছোটো-ছোটো কার্ডের ডিজাইনই পেল পারলামেনটের মুগ্ধ সদস্য-দর্শকদের প্রশংসা, অনুমোদন আর স্বীকৃতি। জেমস থরনহিলের অপত্যস্নেহ, থরনহিলতনয়ার প্রেম হগারথকে শিল্পের প্রবল জোয়ারের মুখে ভাসিয়ে নিয়ে চলল, চূড়ান্ত সিদ্ধি, আধুনিকতা, বিবিধ প্রকরণগত পরীক্ষা এবং নবতর আবিষ্কারের পথে।

বস্তুত হগারথের সৃষ্টিগুলির চারটি প্রধান দিক হল—প্রথমত, প্রকৃতি আর সংশ্লিষ্ট মানুষের প্রতি অনুপুঙ্ক্ষ এবং বিচক্ষণ পর্যবেক্ষণা; দ্বিতীয়ত, সৌন্দর্যের উৎসানুসন্ধান, ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ; তৃতীয়ত, ইমপ্রেশনিজম বা অভিক্ষেপণার এক আধুনিকতম প্রক্ষেপ; চতুর্থত, তাঁর অঙ্কিত নরনারীর দেহাবয়ব বা মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তির মধ্যে স্বতন্ত্রচারী চিন্তনপ্রক্রিয়ার বহুধাবিভক্ত সাফল্য-বৈফল্য, চরিতার্থতা-অচরিতার্থতা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও আস্তিত্বিক শিকড় অনুসন্ধানের তৎপরতা। বলা বাহুল্য এই সামুহিক বীক্ষাকে চিত্ররচনায় উত্তীর্ণ করার জন্য তাঁকে আশ্রয় নিতে হয়েছে ব্যঙ্গবিদ্রূপের নির্ধারিত ফরমুলার।

মোটের উপর হগারথের চিত্রসম্ভারের বিষয় বিতর্কমূলক। অভিনয়ের পাত্র-পাত্রীর মতোই তাদের সামাজিক তথা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের কৃত্রিমতা, প্রহসনকে হগারথ বুঝিয়ে দেন তাঁর ইঙ্গিতমুখর এনগ্রেভিঙ-এর নানারকম কৃৎকৌশলে। সমকালীন ইংল্যানডে সমাজঘনিষ্ঠ মানুষদের কপটতা, ভ্রান্তি, নিঃসার বাগাড়ম্বর, আত্মপ্রতারণা, ক্যানভাসে তির্যক স্যাটায়ারধর্মী তুলির টানে নিরপেক্ষ অথচ রূঢ় প্রতিক্রিয়ায় সমালোচিত হতে থাকে।

বলা বাহুল্য, এই চিত্রবিষয় বিশেষ লোকপ্রিয় হয়েছিল এবং বহু চিত্রামোদী বিষয়বস্তুর তাৎক্ষণিক মূল্য নির্ণয়ে এগুলি প্রগাঢ় উৎসাহে ক্রয় করেন। কিন্তু ১৭৫৭ সালে হগারথ স্বয়ং ঘোষণা করলেন যে, তিনি আর সমকালীন সমাজেতিহাসে অন্তর্লীন মানুষকে তাঁর চিত্রকলার প্রধান অন্বয় করবেন না, আঁকবেন মূলত প্রতিকৃতি। বস্তুত, এই প্রতিকৃতিগুলিই অনেক বড়ো, অনেক মহৎ শিল্পী করেছিল হগারথকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর য়োরোপীয় চিত্রকলার অর্গলমুক্তি ঘটিয়েছিলেন ব্যঙ্গচিত্ররূপকারশিল্পী হগারথ নন, প্রতিকৃতিকার শিল্পী হগারথ। স্যাটায়ারধর্মী ছবিগুলি নিয়ে শিল্পীর জীবনের দীর্ঘ ফলবান প্রহর অতিক্রান্ত না হলে আমরা হয়তো আরও অধিক সংখ্যায় উৎকৃষ্ট পোরট্রেট পেতে পারতাম।

বর্ণালী দাস

প্রসঙ্গ : নভেম্বর ১৯৮৫ সংখ্যায় প্রকাশিত চন্দনা মিত্রের প্রবন্ধ : পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্যব্যবস্থা

১

স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা—শব্দগুলি প্রায়শই ব্যবহার করা হয় সমার্থক হিসেবে, যদিও এগুলি সমার্থক নয়। ব্যক্তিস্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্য বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং তাদের পরিমাপের সূত্র আর সূচকগুলিও ভিন্ন। ব্যাপ্য পরিহার করে এটুকু বলা প্রয়োজন যে, জনস্বাস্থ্যব্যবস্থার পরিধি খুবই বিশাল যার মধ্যে চিকিৎসাব্যবস্থা একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র।

জনস্বাস্থ্যের নিয়ামক অথবা জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে যা প্রয়োজন সে বিষয়ে বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থার তালিকা হল—

১। খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয় ;

২। বিশুদ্ধ জল, এবং মল-মূত্র-আবর্জনা নিষ্কাশন (বেসিক স্যানিটেশন) ;

৩। কর্মসংস্থান ;

৪। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যশিক্ষা—বিশেষত নারীদের জন্য ;

৫। মাতৃস্বাস্থ্য এবং শিশুস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা এবং পরিবারপরিকল্পনা ;

৬। প্রধান সংক্রামক রোগগুলির বিরুদ্ধে প্রাথমিক ব্যবস্থা;

৭। স্থানীয় (এনডেমিক) রোগগুলির নিরোধ আর নিরাময়;

৮। প্রাথমিক চিকিৎসাব্যবস্থা;

৯। জীবনদায়ী এবং প্রয়োজনীয় ওষুধের সরবরাহ।

চিকিৎসাব্যবস্থা বলতে শুদ্ধু রোগনিরাময়ের প্রক্রিয়াটুকু বোঝায়। পরবর্তী কালে টিকাদানের মাধ্যমে রোগনিরোধ এবং পরিবারপরিকল্পনা বা জন্মনিয়ন্ত্রণ চিকিৎসাব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়েছে।

ডা. চন্দনা মিত্র ব্রিটেন আর চীনের উন্নত জনস্বাস্থ্যের কথা বলেছেন। কিন্তু ওই দু-দেশে তার মূল নিয়ামকটি তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নি। এই শতকেই ব্রিটেনে যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব শতকরা ৭০ ভাগ কমে যায় যক্ষ্মার প্রথম ওষুধ স্ট্রেপটোমাইসিন আবিষ্কৃত হবার আগেই। সংক্রামক অসংক্রামক—উভয় প্রকার রোগের মূল কারণ যে অপুষ্টি, সেটারই প্রথমে উচ্ছেদ হয়েছে চীন থেকে। শুদ্ধমাত্র পর্যাপ্ত খাদ্য জনস্বাস্থ্যের ওপর কী বিরাট প্রভাব বিস্তার করে, তা দেখা গেছে। শ্রীলংকায়। আর যদি তার সঙ্গে যুক্ত হয় শিক্ষা (বিশেষত নারীশিক্ষা), কর্মসংস্থান আর রোগপ্রতিষেধক-ব্যবস্থা, তাহলে যে সুফল পাওয়া যায় তার নিদর্শন পাই কেরালায়। জনগণের মাথাপিছু আয় আর স্বাস্থ্যব্যবস্থার খরচ—দুইই কেরালার চেয়ে পশ্চিমবঙ্গে বেশি। কিন্তু গড় আয়ু, শিশুমৃত্যুর হার, জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই কেরালা পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে উন্নত।

ভারতের সংবিধানের নির্দেশক নীতিতে জনসাধারণের পুষ্টি তথা জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবং স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে শ্রমজীবী মানুষকে, বিশেষত শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও বিকাশের সুযোগ-সুবিধা দেবার কথা বলা হয়েছে (৪৭ এবং ৩৯ ধারা) এই নির্দেশ পালিত হয় নি। ১৯৮২ সালে স্বাস্থ্যনীতি বিষয়ে এক বিবৃতিতে ভারত সরকার এই অক্ষমতার কথা স্বীকার করে ঘোষণা করেছেন, "হাসপাতাল-ভিত্তিক রোগমুক্তির নীতিতে যে চিকিৎসাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাতে লাভবান হয়েছেন সমাজের উপরতলার, মূলত নগরবাসী কিছু মানুষ" (জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি বিষয়ে বিবৃতি, নয়া দিল্লি, ১৯৮২)। এটা সবার জানা উচিত যে সাংবিধানিক অনুজ্ঞা অনুসারে, জনস্বাস্থ্য-স্যানিটেশন-চিকিৎসা বিষয়টি অঙ্গরাজ্যের কর্তব্য আর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে—কেন্দ্রের নয় (সপ্তম তপশিল, সারণি ২)। খাদ্য ছাড়া মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। রাজ্যে এমন কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে কি—যেখানে অভুক্ত মুমূর্ষু মানুষ বিনামূল্যে খাদ্য পেয়ে জীবন বাঁচাতে পারে? না, নেই। কিন্তু অবাক কাণ্ড—এমন অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে যে-কেউ গেলেই বিনামূল্যে ব্যয়বহুল চিকিৎসা পাবার অধিকারী। আরো মজা আছে। চিকিৎসাপ্রার্থী লক্ষপতি হলেও কোনো বাধা নেই—তিনিও বিনামূল্যে চিকিৎসা নিয়ে হাসিমুখে গাড়ি চড়ে বাড়ি ফেরেন। মজার কিন্তু এখানেই শেষ নয়। প্রতিবেশী রাজ্য বিহার-উড়িষ্যা-আসাম-সিকিম- ত্রিপুরার অধিবাসীরা, ভিনদেশ নেপাল-ভুটান-বাংলাদেশের নাগরিকরা এবং কখনো-সখনো আরো দূরদেশের লোকেরা পশ্চিমবঙ্গের সরকারি হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা নিয়ে যান। আরো আছে। যাঁরা অন্যত্র বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবার গ্যারানটি ভোগ করেন —যেমন কর্মচারী রাজ্যবীমা প্রকল্পের বীমাকারী, কেন্দ্রীয় সরকার-রেলওয়ে-বিভিন্ন বেসরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান-পার্বলিক সেকটর প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারিবৃন্দ ইত্যাদি—তাঁদের জন্যও এখানে অবারিত দ্বার। এসবই চলছে পশ্চিমবঙ্গের করদাতাদের টাকায়। এই অসাম্যের দেশে, হাসপাতালে লক্ষপতি এবং ভিখিরির মধ্যে খাতাকলমে সমান অধিকার বজায় আছে। এটা অবশ্য শিশুতেও বোঝে যে প্রতিযোগিতায় দরিদ্রতা পেরে ওঠে না, সচ্ছল প্রতিপত্তিশালীরাই জিতে যায়।

এই বাস্তব চিত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যদি জনসাধারণের স্বাস্থ্যসচেতনতার অভাব নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় তাহলে দেশের চতুর শাসকবর্গকেই পরোক্ষে সমর্থন জানানো হয়। ব্রিটেন আর চীনের প্রসঙ্গ এখানে কিছুটা সম্পর্কহীন। সেখানে সমগ্র জনসাধারণের চিকিৎসার দায়িত্ব রাষ্ট্র নিয়েছে, এবং চিকিৎসার একটি ন্যূনতম মানের স্তরে কোনো বৈষম্য নেই। বৈষম্যহীনতার মূল কারণ সেদেশের রাজনীতি আর অর্থনীতি। আমাদের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিষয় হল—এদেশের বা এরাজ্যের প্রচলিত রাজনৈতিক তথা আর্থসামাজিক কাঠামোর প্রেক্ষাপটে চিকিৎসাব্যবস্থার কোন উন্নতি সম্ভব কিনা। এবং যদি সম্ভব হয়, তাহলে পথ এবং কর্তব্য কী?

সমস্যার মতো সমাধানও স্পষ্ট। দেশে দুরকম চিকিৎসাব্যবস্থা আছে। সংগঠিত আর প্রাইভেট। প্রথমটিতে আছে সরকারি, আধাসরকারি আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জনসাধারণ এবং কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসাব্যবস্থা। অনাচির মধ্যে আছে প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার, নারসিং হোম ইত্যাদি। যাদের ক্রয়ক্ষমতা আছে তাদের জন্য থাক প্রাইভেট ব্যবস্থা। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা যেমন নির্দিষ্টসংখ্যক কর্মচারীদের চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছে, তেমনই থাক। কিন্তু সকলের জন্য উন্মুক্ত সরকারি এবং পৌর চিকিৎসালয়কে একমাত্র ক্রয়ক্ষমতাহীন দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত করা হোক, এবং স্বেচ্ছাসেবী তথা বেসরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়কে এই ব্যবস্থার আওতায় আনা হোক। এর অর্থ হল—সচ্ছল জনগোষ্ঠী, ভিনরাজ্য আর ভিনদেশের অধিবাসী (রেসিডেনট) এবং অন্যত্র সুবিধাভোগী চাকুরিজীবীদের জন্য ফ্রী চিকিৎসালয়ের দ্বার রুদ্ধ থাকবে। এই নীতিতে কী ফল হবে? প্রথমত—দরিদ্রদের জন্য ন্যূনতম জীবনদায়ী চিকিৎসা সুনিশ্চিত করা যাবে। দ্বিতীয়ত—বৈষম্য কমানো যাবে। তৃতীয়ত—প্রাইভেট তথা অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় বিনিয়োগ বেড়ে চিকিৎসাব্যবস্থার প্রসার ঘটবে। চতুর্থত—সংরক্ষণের ফলে দরিদ্র মানুষ তার প্রাপ্য আদায় করার জন্য সংগঠিত হবে। পঞ্চমত—চিকিৎসাব্যবস্থায় পরিকল্পিত কর্মসূচী (প্ল্যানিঙ আ্যানড প্রোগ্রামিঙ) নেওয়া এবং দায়দায়িত্ব নির্ধারণ (ফিকসেশন অব রেসপনসিবিলিটি) করা সম্ভব হবে।

এই নীতি উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে হৈ হৈ করে আপত্তি উঠবে। প্রথম—এরকম সংরক্ষণ বেআইনী, সংবিধান-বিরোধী! দু-একজন আইনজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে জেনেছি মোটেই তা নয়; সংবিধানে বরং এই নীতির সমর্থন আছে। কোথাও কোনো ছোটখাট আইনের বাধা থাকলে, সহজেই তার পরিবর্তন করা যায়। দ্বিতীয়—এই নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়! আপত্তি টেকে না। বাস্তবে প্রয়োগ সম্ভব। সত্যি বলতে কি, খাদ্যরেশনিঙ-ব্যবস্থায় এই নীতির কাঠামোই চালু আছে। কিন্তু আসল কথা হল—বিরুদ্ধবাদীরা নীতিগতভাবে সংরক্ষণ-প্রথা মেনে নিলে তবেই প্রয়োগের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা শুরু করা যায়। তৃতীয়ত—এতে অনেক জরুরি রোগী (সচ্ছল ও ধনী) উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে মারা যাবে, কারণ বিরুদ্ধবাদীদের মতে বহুরকমের ব্যয়বহুল জীবনদায়ী চিকিৎসা একমাত্র সরকারি হাসপাতাল ছাড়া আর কোথাও ভালোভাবে হয় না! এখানে আপোস করে বলা যায়—ঠিক আছে, সব শ্রেণীর জরুরি রোগীর চিকিৎসা সরকারি হাসপাতালে আপাতত হবে, কিন্তু সচ্ছলদের মূল্য দিতে হবে—তাঁদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবার পথ অতঃপর বন্ধ। চতুর্থ—ভিনরাজ্য আর ভিনদেশের লোকদের চিকিৎসা বন্ধ করাটা অমানবিক। না, চিকিৎসা বন্ধ করা হচ্ছে না। মূল্য দিলেই চিকিৎসা মিলবে। এমনকি সরকারি প্রতিষ্ঠানেও মিলতে পারে, কিন্তু মূল্য দিতে হবে। যদি অন্যান্য রাজ্যসরকার আর কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে উপযুক্ত অনুদান দেন, তাহলে এঁদের জন্য ফ্রী চিকিৎসা দেওয়া হবে। যুক্তি খুঁজে না পেয়ে বিরুদ্ধবাদীরা তা সত্ত্বেও কিন্তু নানা উদ্ভট বা তথাকথিত মানবতার প্রশ্ন তুলে আপত্তি জানাবেন। যখন দরিদ্ররা বঞ্চিত হয় তখন কিন্তু মানবতার প্রশ্না কখনো ওঠে না। আসলে প্রশ্নটি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক। দেশের প্রচলিত রাজনীতি তথা অর্থনীতির ভিত্তি আর লক্ষ্য হল—সচ্ছল সুবিধাভোগীদের সচ্ছলতা আর সুবিধাভোগ অব্যাহত রাখা। তাই আপত্তি উঠবে, বাধা আসবে। এই নীতি প্রয়োগ করতে সাহস করবে একমাত্র বঞ্চিতদের প্রতিনিধি কোনো রাজনৈতিক দল, কিংবা বঞ্চিতরা নিজেরাই সংগঠিত হয়ে সরকারকে বাধ্য করতে পারে। বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধতে গেলে আর-এক বিপরীত ধরনের বৈষম্যকে অল্প হিসেবে চাই—যে বৈষম্যে বঞ্চিতদের জন্য চিকিৎসা সংরক্ষিত থাকবে।

এতেই কিন্তু সব ঠিক হয়ে যাবে না, পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসাব্যবস্থা ব্রিটেন বা চীনের মতো হয়ে যাবে না। আরো প্রশ্ন আছে। চিকিৎসার মান, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নানা প্রশ্ন, প্রয়োজনীয় ওষুধের সরবরাহ, প্রাথমিক চিকিৎসার মানোন্নতি তথা প্রসার, সংগঠিত রেফারাল সিসটেম, ডাকতারি শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি প্রশ্ন। উদারণস্বরূপ—ব্রিটেনে জেনারাল প্রাকটিশনার আর দুর্গত অঞ্চলের চিকিৎ-

সকদের অধিকতর বেতন সুবিধা দেওয়া হয়; চীনেও অনুরূপ প্রথা আছে। ফলে ওইসব দেশে কোনো স্থানেই ডাকতারের অভাব ঘটে না। এখানে এইসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার স্থানাভাব। কিন্তু মূল প্রশ্নটি, সংরক্ষণের প্রশ্নটি, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর জরুরি। শতকরা ২০ জনের জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন করে, তার আবার শতকরা ৮০ ভাগ শহরাঞ্চলে বরাদ্দ করে এবং 'সবার জন্য উন্মুক্ত' নীতিতে বঞ্চিতরা বঞ্চিতই থেকে যাবে।

সুজিতকুমার দাশ
সল্ট লেক, কলকাতা ৬৪

২

রচনাটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তথ্যপূর্ণ। জনস্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রচলিত যে ধারণা আছে, অর্থাৎ রোগের চিকিৎসাসর্বস্ব সব-কিছুর আয়োজন—সেই ধারণা যে গাছের গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ার শামিল, তা সুন্দরভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। 'প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিয়োর'—এটি বিদেশী ভাষার নীতিবাক্য বলেই বোধ হয় আমাদের দেশের সরকার এবং জনসাধারণ এটিকে আপ্তবাক্যের মতন উচ্চারণ করেন, কিন্তু দেশীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগে নিয়ে যান না।

রচনাটিতে পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্যব্যবস্থার কথা আলোচনা করতে গিয়ে ব্রিটেন এবং চীনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। লেখিকার প্রতিপাদ্য বিষয় উপলব্ধি করা গেলেও তুলনাটি আরও সঙ্গতিপূর্ণ হত যদি ভারতের অন্যান্য রাজ্যের জনস্বাস্থ্যব্যবস্থারও উল্লেখ থাকত। কারণ, একটি রাষ্ট্রের ব্যবস্থার সাথে অন্য একটি রাষ্ট্রের এক অঙ্গরাজ্যের তুলনা সব সময় যথাযথভাবে সঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে। ডা. মিত্র প্রবন্ধটির শেষে আশা প্রকাশ করেছেন যে সাধারণ মানুষের সচেতনতা অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। কিন্তু দারিদ্র্য যেখানে সবচেয়ে বড়ো অসুখ, সেই দারিদ্র্য দূর না হলে শুধু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনতা দিয়ে কি ব্যাপক পরিবর্তন সম্ভব? তবে আংশিক পরিবর্তন বা সংস্কার নিঃসন্দেহে সম্ভব; কিন্তু লেখিকা এ বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে কিছু আলোকপাত করেন নি। তাই লেখার মধ্যে একটা দুরবস্থার বর্ণনা মেলে, কিন্তু উত্তরণের কোনো সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশ নেই। এ বিষয়ে কিছু মতামত জানাই।

১. সামগ্রিকভাবে সরকারের ঔদাসীন্য, সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গির অভাব যেখানে স্পষ্টত প্রতীয়মান, তখন সামাজিক সংগঠনগুলো আপাতত এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে ভূমিকা নিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের কিছু চেষ্টা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে, যেমন কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটি, পিপলস হেলথ সারভিস অ্যাসোসিয়েন, সি. এন' ডাবলু' ও. ইত্যাদি সংগঠনের নাম উল্লেখ করা যায়। অসুস্থতা এবং তার সামাজিক ভিত্তি নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা, এর পাশাপাশি স্বনির্ভর কিছু উদ্যোগ নিয়ে সমস্যা থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য জনগণকে প্রয়াসী করা—এই হল এইসব সামাজিক সংগঠনগুলোর কাজের মূল ধারা। এই চেষ্টা ব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী হলে নিশ্চয়ই ফলদায়ী হবে। শুধু কথায় বা লেখায় প্রচার নয়, বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষকে এ ব্যাপারে সচেতন করার চেষ্টা থাকতে হবে।

২. ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যও যে একটি সামাজিক অবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এই ধারণা সবার মধ্যে গড়ে তুলতে হবে: এমনকি মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষদের মধ্যেও। অনেক মধ্যবিত্ত মানুষ ভাবেন যে, তিনি তো ভালো বাড়িতে থাকেন, ভালো খেতে-পরতে পান, তাঁর স্বাস্থ্যাভ্যাস ভালো—ব্যস, তাহলে জনস্বাস্থ্যসমস্যা নিয়ে তাঁর অত ভাবার কী আছে? কিন্তু তিনি যে বাসে চড়েন সেই বাসের হাতল একটু আগে যিনি ধরেছেন তিনি হয়তো গ্রাম বা বস্তির গরিব মানুষ, যাঁর অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসের দরুন কৃমির জীবাণু তিনি ওই হাতলে রেখে গেছেন। ওই কৃমি মধ্যবিত্ত লোকটিকে আক্রমণ করবে তাঁর অজানতে। যক্ষ্মার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ সামাজিকভাবে রোগ উৎখাত করার চেষ্টা না থাকলে শুধু ব্যক্তিগত সাবধানতা নিষ্ফল হয়ে যায়।

৩. ওষুধ দিয়ে রোগের চিকিৎসা করা স্বাস্থ্যব্যবস্থার মাত্র একটা দিক। ওষুধ সম্বন্ধে ওষুধপ্রস্তুতকারক ব্যবসায়ী মহল সাধারণ মানুষের মনোজগতে এমন একটা সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে যে অনেকে ভাবেন, শুধু ওষুধ খেলেই বহু রোগ সারিয়ে ফেলা যায়। অপুষ্টি, ব্যায়ামচর্চার অভাব, স্বাস্থ্যাভ্যাসের অভাব— সবকিছুরই সমাধান করে দিতে পারে 'টনিক' নামক আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ। চিকিৎসকরাও অজ্ঞাতে এই ধরনের প্রচারে শামিল হন, অনেকে আবার শুধু রোজগারের জন্যই অহেতুক বেশি ওষুধ দেন। অবস্থা এমনই হয়েছে যে, যেসব রোগে ফিজিওথেরাপি, ব্যায়াম, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন ইত্যাদি পদ্ধতিগুলোই একমাত্র ভালো ফল দিতে পারে, যেসব ক্ষেত্রে ওষুধ না লিখলে বা কম লিখলে রোগীর ধারণা হয় যে চিকিৎসা ঠিকমতো হচ্ছে না। সমগ্র বিষয়টি নিয়ে ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম নামক একটি সংগঠন ইতিমধ্যেই প্রচার শুরু করেছেন। ভবিষ্যতে এই ধরনের সংগঠনের ব্যাপ্তি আরও বেশি প্রয়োজন। আমেরিকাতে ক্রেতাপ্রতিরোধ বহু মুনাফাকারীদের অত্যধিক অন্যায় লালসাকে দমন করতে পেরেছে।

৪. চিকিৎসক-সমাজের একটা বড়ো ভূমিকা আছে। সাধারণভাবে চিকিৎসকরা রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু প্রতিরোধ সম্বন্ধে রোগীদের শিক্ষিত করে তোলেন না। প্রথমত, অত সময় থাকে না; দ্বিতীয়ত, রোগী হল 'লক্ষ্মী', যত বেশি রোগী তত বেশি পসার। সরকারি চিকিৎসা ছাড়াও সমাজে বেশি সংখ্যায় রয়েছেন প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার। এই প্র্যাকটিশনারদের মধ্যে সমাজচেতনা আনার জন্য সংগঠিত চেষ্টা নেওয়া দরকার। কারণ এই প্র্যাকটিশনাররা জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারে ভালো শিক্ষকের ভূমিকা নিতে পারেন। আগেকার দিনে গৃহচিকিৎসকরা অনেক বেশি শুভানুধ্যায়ীর ভূমিকা পালন করতেন। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে সাধারণ মানুষের আর নির্ভরযোগ্য গৃহচিকিৎসক কেউ থাকছে না; তথাকথিত স্পেশালিস্ট চিকিৎসকদের কাছে বেশি অর্থ দিয়ে দেখিয়ে কৃতার্থ হওয়ার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে, এমনকি গ্রামাঞ্চলেও।

ডাকতারদের যেসব সংগঠন আছে তাদের ভূমিকাও উজ্জ্বল নয়। অনেক সময়ই তাঁরা দাবিদাওয়ার আন্দোলন করেন, জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে সরকারের কাছে দাবি তোলেন, কিন্তু দৈনন্দিন কাজে ওই ডাকতাররা মানবদরদী, কর্তব্যপরায়ণ ভূমিকা কম পালন করেন। জুনিয়র ডাকতার অবস্থায় যেটুকু বা করতে হয়, ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রে গিয়ে গতানুগতিক পথে চলেন। তাই ডাকতার-রোগীর মধ্যে মানসিক দূরত্ব বাড়ছে বই কমছে না। এর ফলে চেইন রিঅ্যাকশনে ঘটছে নানা অপ্রীতিকর ঘটনা, বাড়ছে অবিশ্বাস আর অনাস্থা। বহু ডাকতারই কম সময় কাজ করেন, বেশি সময় প্র্যাকটিস করেন। নিজেদের কর্তব্যপরায়ণতা সম্বন্ধে যে আভ্যন্তরীণ আন্দোলন হওয়া উচিত এই সংগঠনে তা তাঁরা করেন না। অধিকারসচেতন যতটা, ততটা কর্তব্যসচেতন নন। তাই সমাজের অন্যান্য সব ক্ষেত্রে যেভাবে শূন্যতা বিরাজ করছে, এ-ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই। ফলে এঁদের আন্দোলন শেষ বিচারে শূন্যগর্ভ হয়ে পড়ে। যেসব সমাজসচেতন ডাকতার আছেন তাঁদের উচিত নিজেদের কর্তব্যপরায়ণ হওয়ার জন্য আন্তরিক, সৎ, শুদ্ধি-আন্দোলন গড়ে তোলা।

৫. সরকারি হাসপাতাল আর চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসকদের পুরোপুরি নন-প্র্যাকটিসিঙ করে দেওয়া উচিত। এ ব্যাপারে মাঝে-মাঝে প্রস্তাব উঠলেও এ পর্যন্ত তা পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর হয় নি। বেশি-উপার্জনকারী কিছু অধ্যাপক-চিকিৎসকদের এ ব্যাপারে প্রবল-আপত্তি রয়েছে। সরকারও অজ্ঞাত কারণে কঠোর মনোভাব নিচ্ছেন না। বর্তমান বেতন-কাঠামো কিছুটা পরিবর্তন করলে অনেক চিকিৎসকই পুরোপুরি নন-প্র্যাকটিসিঙ থেকে কাজ করতে চাইবেন। এখন তো ডাকতারের অভাব নেই। তথাকথিত নামকরা বড়ো ডাকতাররা হয়তো চাকুরি ছেড়ে দেবেন, তার ফলে কয়েক বছর একটু অসুবিধা হয়তো হতে পারে, কিন্ত সুদূরপ্রসারী জনস্বার্থের কাছে তা কিছুই নয়। তা ছাড়া ওইসব বড়ো ডাকতাররা ছেড়ে দিলে মেডিক্যাল শিক্ষা, গবেষণা বা চিকিৎসায় বিশেষ অসুবিধা হবার সম্ভাবনা নেই। কারণ এঁদের শতকরা পঁচানব্বই ভাগই দক্ষ ক্লিনিসিয়ান, মেডিক্যাল সায়েনটিস্ট নন। এঁরা অপরের আবিষ্কৃত জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারেন দক্ষ মিস্ত্রীর মতন, কিন্তু নতুন কিছু গড়ার মতন স্থপতি এঁরা নন। কারণ মৌলিক গবেষণা করার সময় এবং মানসিকতা এঁদের নেই: তাহলে পসারওয়ালা, বেশি-রোগীর-ভিড়ওয়ালা চিকিৎসক হবার সময় কোথায় পাওয়া যাবে? বরঞ্চ বর্তমানের তরুণ ডাকতারদের, যাঁদের এখনও অ্যাকাডেমিক স্পৃহা আছে অথচ পসার এখনও তেমন হয় নি, তাঁরা শিক্ষক হলে মেডিক্যাল শিক্ষা এবং হাসপাতালের চিকিৎসা অনেক ভালো হবে। (বড়ো ডাকতাররা কার্যত কিছু ক্যাচ-রোগী ছাড়া তো হাসপাতালে চিকিৎসা খুবই কম করেন)। দিল্লীতে সমস্ত চিকিৎসকদের (এমনকি প্রফেসর পর্যায়েরও) সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত অবশ্যই হাসপাতালে থাকতে হয়; রোগী দেখা, ছাত্র পড়ানো, গবেষণায় পরামর্শ দেওয়া—সব কিছু করতে হয়। আর পশ্চিমবঙ্গে 'ভিজিটিং প্রফেসররা' পুরো মাইনে নিয়ে দেড় থেকে দুঘণ্টা কোনোরকমে হাসপাতালে কাটিয়ে প্রাইভেট চেমবারের দিকে ছোটেন। এই হাসপাতালে আসাটাও আসলে প্রাইভেট রোগী আকর্ষণ করার মাধ্যম।

৬. মেডিক্যাল শিক্ষায়ও বিস্তর গলদ। আমাদের দেশের উপযোগী শিক্ষার উপর জোর তো কম থাকেই, তার উপর ছাত্রদের মধ্যে একপেশে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা হয়। যেমন, এম. বি. বি. এস. কোর্সে একটিও ক্লাস থাকে না যেখানে হোমিওপ্যাথ, ইউনানি, আয়ুর্বেদ, আকুপাংচার ইত্যাদির ভালো এবং অসম্পূর্ণ দিকগুলো জানা যেতে পারে। অথচ বাস্তব কর্মক্ষেত্রে বহু রোগীই উপরোক্ত পদ্ধতিগুলোতে চিকিৎসিত হয়ে আসেন অথবা চিকিৎসা করাবেন কিনা মতামত চান। কিন্তু শিক্ষিত এম. বি. বি. এস. চিকিৎসক ওইসব বিষয়ে অজ্ঞতাহেতু কোনো সঠিক মত প্রকাশ করতে পারেন না, অনেক সময় বিরূপ মতও প্রকাশ করেন। একথা সব শাখার চিকিৎসকদের ক্ষেত্রেই খাটে। চিকিৎসকদের মধ্যে গড়ে ওঠা এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। অথচ চীনের মতন সমাজতান্ত্রিক দেশে অ্যালোপ্যাথিক

কোরসে প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতি সম্বন্ধে দেড় থেকে দু বছর পড়ানো হয়। বিপরীত ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। এর ফলে উন্নতিশীল দেশ তার সামর্থ্যের মধ্যে প্রাপ্তব্য সবটুকু জ্ঞানসম্পদকে সার্থকভাবে কাজে লাগাতে পারছে। আমাদের দেশেও চিকিৎসাশিক্ষায় আমাদের দেশে চালু-আছে এমন সব চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা যুক্ত করা উচিত। এভাবেই সমন্বিত চিকিৎসা গড়ে উঠতে পারবে।

মৃগেন গাঙাইত
শ্রীপুর পূর্ব, বোড়াল, ২৪ পরগনা

চতুরঙ্গ
সডাক চাঁদা—
বার্ষিক ৩৬·০০
যান্মাসিক ১৮·০০
অ্যাকাউনট পেয়ী চেক
এই নামে দেয় :

ANTARANGA
PRAKASHANI
PVT. LTD.

কর্মসচিব
চতুরঙ্গ
৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলকাতা ৭০০ ০১৩

সবিনয় নিবেদন,

আমি আগামী.....মাস থেকে যান্মাসিক/বার্ষিক গ্রাহক হতে চাই। এই সঙ্গে আমি নগদে/মানি অর্ডারে/চেকে ৩৬/১৮ টাকা চাঁদা পাঠাচ্ছি। আমার কপি নীচের ঠিকানায় আনডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিঙ-এ পাঠাবেন।

নাম.....

পেশা.....

পিনকোডসহ ঠিকানা.....

.....

.....